শামুকখোল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ—১৩৬৩

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
এ. ও. পি. (ইণ্ডিয়া) প্রা. লি.
১২৭/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

সন্ধি মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

অতএব, মৃত্যুকেই সে মনস্থ করল একসময়। জীবনের পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে যা কিছু সম্ভাব্য উপায়ের কথা তার স্মরণে এসেছিল, তার মধ্যে, মৃত্যুই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান। যদিও মৃত্যুকে একমাত্র কল্পনা দ্বারাই অনুভব করা যায়। কেন-না মৃত্যুর আগমন সঙ্কেত কখনও পৌঁছলেও সেই মুহূর্তে মানুষকে আদ্যন্ত যা আলোড়িত করে তার নাম জীবন। এমনকী মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণিসমূহ, একেবারে কীটাণুকীট পর্যন্ত এই বোধের অন্তর্গত। সকলকেই ত্রস্ত করে জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা।

তবু, মৃত্যুকেই মনে হয়েছিল তার, এক নিরপেক্ষ আশ্রয়। কিংবা, হতে পারে, মৃত্যু এক নারী, যার ক্রোড়ে কোনও পক্ষাবলম্বন থাকে না, থাকে না কোনও প্রতারণা। এমনটা ভেবেছিল সে। কিংবা অনুভব করেছিল অন্য অনেকের মতো, যারা জীবন সম্পর্কে ক্রমশ হয়ে ওঠে নির্মোহ এবং মৃত্যুর ওপর আস্থাশীল।

জীবন পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই, অন্তত বয়ঃক্রমের প্রাকৃতিক সম্পূর্ণতার আগেই, মৃত্যুকে আরাধ্য করাই মনস্থ করে যারা, তাদের জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে গুরুত্বে ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। যা কিছুই ঘটল, কোনও কিছুই, হৃদয়ে ঘটিয়ে দিল অসহায় উন্মাদ ধাক্কা—একজন তার সম্পর্কে ভাবতে পারে—হয়, এমন হয়, জীবন মানেই সুখ-দুঃখের গলাগলি, আনন্দ ও যন্ত্রণার সহাবস্থান। অতএব, থামা যাবে না, চলতে হবে। আর একজন ভাবতে পারে বিপরীত। ভাবতে পারে, এ-দুঃখ সহনীয় নয়। ভাবতে পারে, এমনটা ঘটলে জীবন থেমে থাকে নিরবধিকাল। প্রাণ গড়িয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। এবং তারা মৃত্যুর আরাধনা করে। অতএব, দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে ঘটনার লঘুত্ব বা গুরুত্ব। দর্শনের ওপর নির্ভর করে— ঘটনার

অভিঘাতে, পরবর্তী পর্যায় হিসেবে জীবন আরাধ্য হবে, না মৃত্যু।

মৃত্যুকে মনস্থ করার নেপথ্য কারণ হিসেবে স্পষ্ট ভাবে সে এক নারীকেই নির্বাচিত করেছে। সেই নারীর প্রতি ঘৃণা, যা তাকে প্ররোচিত করেছে এমনই ভাবতে যে পৃথিবীর সমস্ত নারীই ঘৃণ্য। কিন্তু ভাবনার প্রসার ঘটালে সে দেখতে পেত তার চারপাশের আরও অনেক দৈন্যকেও। হয়তো সে জানে, কিন্তু স্বীকার করতে চায় না। কেন-না নিজস্ব দৈন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে থাকে অক্ষমতাও। অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে নিরন্তর অসুবিধা, কারণ নিজের মধ্যে প্রতিপালন করা অহং ও সান্ত্বনা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। সে-ও জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিতৃষ্ণার প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে গেছে নারী। যে-নারী তার অন্তঃস্থ হয়ে অংশ নিচ্ছে ভাবনায়। যে-নারী তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিরবধিকাল। যে-নারীকে সে ঘৃণা করেছে আদ্যন্ত। অথচ ভেবে ভেবে এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হল একরকম। মৃত্যু নারী। এবং মৃত্যুর কোনও প্রতারণা নেই।

এই বিশ্বাসে দীক্ষা নেওয়া ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না, কারণ, আজন্মকাল বহু সম্পর্কের বহু নারীকে সে কখনও সুবর্ণমণ্ডিত দেখেনি। দেখেনি নির্ভেজাল। দেখেনি সরল, নিপাট—যেমন তাদের দেখলেই মনে হয়। নারীকে সে দেখেছে প্রতারক। জেনেছে, অনুভব করেছে, প্রতারক। নারী প্রতারক। নারী লোভী। মিথ্যাচারী। কিন্তু তার যুক্তিবোধ কোনও ব্যতিক্রমকে সামনে রাখতে চায়। কেন-না সাধারণের ব্যতিক্রম সাধারণকে প্রতিষ্ঠিত করে। অসত্যে পরিপূর্ণ, মিথ্যার ব্যাধিগ্রস্ত, ঘৃণ্য নারীকুলকে সে, অতএব, প্রতিষ্ঠা করে এই বলেই যে মৃত্যু নারী এবং মৃত্যুর মধ্যে কোনও অসত্য নেই, মিথ্যা নেই, কোনও প্রতারণা নেই। মৃত্যু অমোঘ, সুন্দর, মহান। কিন্তু সহজ নয়।

হ্যাঁ, মৃত্যু সহজ নয়। মৃত্যুকে গভীর আগ্রহে ও নির্ভরতায় গ্রহণ করার পরও তার মনে হয়েছে, মৃত্যু সহজ নয়। দোষ যদি থেকে থাকে কিছু আদৌ, এই মৃত্যুর, তা হল তার সহজ না থাকাই। অথচ, মনের গভীরে, পরম মমতায়, এইটুকুর জন্য সে দায়ী করে জীবনকেই। যেন

কারওকে মৃত্যুর কাছে হস্তান্তরিত করা হবে কিনা এ বিষয়ে মৃত্যুই নেয় না শেষ সিদ্ধান্ত। নেয় জীবন। শেষ সিদ্ধান্ত নেয় জীবন, কেন-না, জীবন পক্ষপাতী বলে, পক্ষপাতদুষ্ট বলে, নিরপেক্ষ নয় বলেই, যখন-তখন মৃত্যুর হাতে তুলে দেয় সেই সব মানুষকে, যে মৃত্যুকে কামনা করেনি। যে সর্বাঙ্গীণ কামনা করেছে জীবনকে। মৃত্যুবাসনা যে আদৌ সম্ভব তা সে কল্পনাও করে না। এমন মানুষ, হয়তো তার সংসারের প্রতি দায়িত্ব অসীম। হয়তো, যে মারা গেল, তার না থাকায়, অন্যান্য প্রাণীর অন্নজল এক সমস্যার কারণ হল। কিংবা কোনও শিশু, যে সবেমাত্র পৃথিবীতে জীবনের অধিকার বুঝে নিতে শুরু করেছে, জীবনকে যে জানে মাত্র ললিপপ, মাত্র ক্যাডবেরি, রঙিন কাগজের ফুল ও সাদা পাতায় হাতের লেখা ভরিয়ে তোলা, জানে বাবা ও মায়ের মাঝখানে শুয়ে স্বপ্নের ও নির্ভরতার ঘুম। জীবন তাকেও অনায়াসে তুলে দেয় মৃত্যুর হাতে। স্তব্ধ করে দেয় মুখর বাণী যত। ঘুম পাড়িয়ে দেয় চিরঘুমে। এবং, এই জীবনই কোনও মেয়ের গায়ে ঢেলে দেয় কেরোসিন। গ্যাসের সিলিন্ডার খুলে আগুনে জড়িয়ে ফেলে দেহ, যে-দেহের সুস্নাত ও সালংকারা হয়ে প্রেমস্নিগ্ধ আঙুলের স্পর্শ পাবার কথা।

কিংবা, সেই স্বাস্থ্যবান যুবক, যাকে দেখলে তার দেহের অন্তঃস্থ যন্ত্রসমূহের সামান্য বৈকল্যের অনুমান করা অসম্ভব, সে এক সন্ধ্যায় ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিল রেলস্টেশনের দিকে। শহরের বৃহত্তম রেলস্টেশনটি তার গন্তব্য ছিল না। রেলমাধ্যমে সে যেত দূরান্তরে, কোনও নিকট বন্ধুর বাড়ি। তার সঙ্গে ছিল কাগজপত্র। অফিসের কাগজপত্র। আর অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন-চিঠি। তার প্রথম ও একমাত্র সন্তানের অন্নপ্রাশনে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে চলেছিল সে। তার প্রাণে আনন্দ ছিল। তৃপ্তি ও উচ্চাশা। স্বপ্নে পরিপূর্ণ ছিল তার মস্তিষ্ক। কেন-না জীবনের স্বাভাবিক ধর্মই সে পালন করেছে এতকাল। পরিপূর্ণ ভাবে। সন্তান হিসেবে পিতা ও মাকে সে দিয়েছিল তৃপ্তি ও গর্ব। স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে দেয় সে অপূর্ব প্রেম ও নির্ভরতা। এবং সে একটি সুস্থ সন্তানের জনক। এই সন্তানের মুখে প্রথম অন্ন

দেবার উচ্ছল আয়োজন সে করতে চলেছে। এমতাবস্থায় ভূগর্ভস্থ পথে চলতে চলতে হঠাৎ তার শরীর কিছু দুর্বলতা বোধ করে, অসম্ভব স্বেদ নেমে আসে প্রতিটি স্বেদগ্রন্থি থেকে। সে ভাবে, ভূগর্ভস্থ পথে এ কোনও বাড়তি উষ্ণতা। কিন্তু সেই উষ্ণতা তাকে ছাড়া অন্য কারওকে বিচলিত করেনি। অন্যরা হেঁটে যাচ্ছে স্বাভাবিক। হাসছে, কথা বলছে বা গম্ভীর থাকছে স্বাভাবিক। তার নিজেকে অশক্ত লাগল তখন। সুবেশ, স্বাস্থ্যবান যুবক, স্বপ্নিল যুবক তখন দেওয়াল ধরে দাঁড়ায়। ততক্ষণে তার বুক থেকে পিঠ বেয়ে, বাঁ হাত বেয়ে নেমে আসছে তীব্র যন্ত্রণা, তার দম ফুরিয়ে আসছে, তখনও, সেই মুহূর্তেও তার বিশ্বাস— ভূগর্ভস্থ পথে অক্সিজেনের অভাব ঘটে থাকবে, যা তাকে কিছু অস্বস্তি দিচ্ছে। সে তার হাতের ছোট ব্যাগটি নামিয়ে রাখল ভুঁয়ে। নামানোর জন্য নিচু হল, তার ওই নিচু অবস্থাতেই দুমড়ে গড়িয়ে পড়ল স্বয়ং। ভূমি থেকে সহস্র মানুষের পদধূলি লেগে গেল তার অসহায় সুবেশে। আর জীবনের হাত থেকে সে অন্তরিত হয়ে গেল মৃত্যুর হাতে। চাইল না—তবু। জানল না—তবু। কোনও প্রয়োজন ছিল না কোথাও—তবু।

কিংবা আরও আরও সব, অসংখ্য সব বেহিসাবি অর্থহীন হস্তান্তর।

যেভাবে কতিপয় মানুষ এক ভূখণ্ড অনায়াসে তুলে দেয় অন্য ভূখণ্ডের অধীশ্বরের হাতে, আপন ভূমিকে মাতৃসম জ্ঞান করে না, বরং হয়ে ওঠে নির্মম, অতি নির্মম ও লোভী—ঠিক সেভাবেই জীবনও নির্মম। জীবনও লোভী।

কিন্তু জীবনের লোভ কী ভাবেই বা প্রতিভাত হয়! জানে না সে। হতে পারে, মৃত্যুর ওপর জীবনের দখল প্রমাণ করার লোভ। জীবন নয় অমোঘ, নয় নিরবচ্ছিন্ন। নয় চূড়ান্ত শক্তিমান। জীবন, স্রষ্টার শক্তির সীমায়িত অভিজ্ঞান মাত্র। কিন্তু মৃত্যু অখিলে প্রলম্বিত। নিরবচ্ছিন্ন সে আলোয় অথবা অন্ধকারে। মৃত্যু সর্বশক্তিমান। সর্বব্যাপক। তারই কাছে জীবন অবহেলায় ছুড়ে দেয় স্তব্ধ প্রাণ। যখন যাকে ইচ্ছে ছুড়ে দেয়। যেমন অনায়াসে অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী প্রবেশ করিয়ে দেয় প্রজ্বলিত তন্দুরে।

জীবনের লোভ এখানেই। শক্তি প্রদর্শনের লোভ। অবলীলায়, অনায়াসে যা কিছু করতে পারে, এমন প্রমাণ দাখিলের লোভ। যেন জীবন, মানুষেরই মতো এক পেশিসম্পন্ন প্রাণী। সে, অতএব, জীবনকে ভাবতে থাকে লুব্ধ, নির্দয়, নির্মম—যে-কোনও নারীর মতোই। প্রতারক। মিথ্যাচারী। তার প্রতি কেশের আদ্যোপান্ত জড়িয়ে আছে অসত্য।

হ্যাঁ, জীবন। তার কাছে জীবন অসত্যে পরিপূর্ণ। দয়াহীন। করাল। এবং জীবন অবশ্যই নারীদেহধারী। নারীরূপী। যদিও এই রূপ সে কল্পনা করতে পারে না। সে জানে মৃত্যুকে। কল্পনা করে মৃত্যুকে। মৃত্যু—এক স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যবতী নারী, যার পানপাতা ডৌলে তিরতিরে আলোর মতো ফরসা মুখ। হরিণের চোখের গড়নেই চোখ, তবে সেই জোড়া ত্রস্ততা হারায়। প্রকৃতপক্ষে সে পিঙ্গলনয়না। তিলফুল নাক। ঘন কালো চুল সুদীর্ঘ—দীর্ঘতর, মিশে গেছে অন্ধকারে। সে পরিধান করে আছে সাদা সূক্ষ্ম বস্ত্র। তাঁত নয়। রেশম নয়। বরং আধুনিক পদ্ধতিতে, রাসায়নিক সংশ্লেষে তৈরি স্বচ্ছ শাড়ি। আবরণের অন্তরালে স্পষ্ট থাকে গাঢ় শরীরী খাঁজ। আর ওই সমূহ খাঁজ তাকে আহ্বান করে। সে জাগ্রত অবস্থায়, ঘুমন্ত মানুষের অভিব্যক্তিতে খাঁজগুলি লক্ষ করে হাঁটে। হেঁটে যায়। পৌঁছতে পারে না। পৌঁছনো সহজ নয়।

তবে, সেই শরীর অভিমুখে সে হেঁটে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়। কিন্তু, যারা স্বেচ্ছায় আসেনি, জীবন যাদের হঠাৎ ছুড়ে দিয়েছে, তারাও বুকের গাঢ় খাঁজে ডুবে যায় রীতিমতো। সেখানে স্থান অকুলান হয় না কখনও। জীবন থেকে মৃত্যুর কাছে পৌঁছনোর কঠিনতর পথ জীবন অতিক্রম করিয়ে দেয় এক লহমায়। মৃত্যুর অনুমোদন ছাড়াই। একনায়কতন্ত্রী মনোভাবে মৃত্যুকে সে করে তোলে দুর্বিনীত জীবনের আদেশ পালনকারী।

সে স্থির করে, জীবনের আদেশ সে পালন করবে না আর। প্রতারক জীবনের আদেশ, লোভী জীবনের আদেশ আর মান্য করবে না সে। বরং এই ধরিত্রীর অববাহিকায়, যেখান দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আর সঙ্গে কোনও জলের বোতল নেই, খাদ্যসম্ভার নেই, সে হেঁটে যাচ্ছে নিজের আত্মাকে বহন করে, তরুণ ও নির্মেদ দেহবন্ধে, সেই অববাহিকায় সে হেঁটে যাচ্ছে আর রেখে চলেছে পদচ্ছাপ, আর সেই পদচ্ছাপে মৃত্যুর আলো ফুটে উঠছে, তার অন্তরে লালন করা আলো। মৃত্যুর আলো। অন্ধকার নয়, আলো। কোনও গ্লানি নেই, আশা নেই, উদ্বেগ নেই, যন্ত্রণা নেই, ক্ষয় নেই, ক্ষতি নেই— শুধু আলো। শুধু এক অনির্বাণ অস্তিত্বের বিস্তার। আদি-অন্তহীন বিস্তার। জীবন অন্ধকার আর মৃত্যু আলো। এতকাল মৃত্যুই ছিল অন্ধকার। মৃত্যুই ছিল রজনী। অন্ধের দৃষ্টিহীনতা। কিন্তু আজ, সে, শুভদীপ, জেনেছে— পৃথিবীর অন্তত একজন মানুষ জেনেছে, মৃত্যু আলো। এবং মৃত্যু স্থির। মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যু বিশ্বস্ত। মৃত্যুর থেকে মুখ ফিরিয়ে জীবনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে উপলব্ধি করা যায়— জীবন আসলে কী অস্থির, কী অনিশ্চিত, কত গভীর ষড়যন্ত্রময়, প্রতারণাময়। জীবন কী গভীর অন্ধকার!

অতএব সে চলে যাচ্ছে প্রতি পদচ্ছাপে আলোর ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে। আকাশ উপুড় হয়ে আপন সাজিতে ভরে নিচ্ছে সেই সব ফুল আর তারা মিটমিট করছে। যেন সব সুনয়নী, সব সুনেত্রা ঘুম থেকে জেগে উঠল এইমাত্র আর অপেক্ষা করছে, ব্রাশ-পেস্ট-বিস্কিট-বর্ণপরিচয় মেশানো এক সকালের জন্য।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই আলোর ফুল, ফুটে থাকা এইসব মৃত্যুর কোনও প্রত্যাশা নেই। এক বিশাল, অসীম, সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্রগামী মৃত্যুর থেকে খান-খান হয়ে বেরিয়ে আসা অসংখ্য-অসংখ্য মৃত্যুর কোনও প্রত্যাশা নেই। অপেক্ষা নেই। টান নেই। বড় নির্মোহ, নির্বাক তারা।

সে জানে না। সে বোঝে না। সে এক নির্মোহের প্রতি মোহগ্রস্ত

ইদানীং। অকারণ সে হেঁটে চলে। তার যেখানে যাবার কথা, যেদিকে যাবার কথা, না গিয়ে সে হেঁটে চলে অন্য রাস্তায়। আর এভাবে, জীবনকেও কিছুটা মান্য করা হয়ে যাচ্ছে তার, সে জানে না। যে-পথে যাবার কথা, না গিয়ে, অন্য পথে চলে যাবার এই চিরকালীন ধাঁধাকে সে প্রতিপন্ন করছে মৃত্যুর উদ্দেশে, কিন্তু জীবনের পরিণামেই। সে জানে না, সে হেঁটে যায়। এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মসৃণ রাস্তায় হোঁচট খায় একবার। হোঁচট খায় বলে থামে। কাঁধের ব্যাগ অকারণে ঠিকঠাক করে নিতে চায়। একটি পা তুলে, যেন-বা পদক্ষেপ নিতে চলেছে এমন, কিন্তু নিচ্ছে না, সে একখানি কাল্পনিক টেবিল গড়ে নেয়। নড়বড়ে টেবিল। তার ওপর রাখে ব্যাগ। চেন খোলে। ব্যাগে প্রচুর কাগজ। দুটি ফাইল। কলম। প্যাড। আর কিছু চিঠির বান্ডিল।

সে দেখে, নির্মোহে দেখে এবং নড়বড় করতে করতে, ভারসাম্য রাখতে রাখতে ব্যাগের ভেতরটা ঠিক করে নেয় একবার। চেন বন্ধ করে এবং লক্ষ করে তার জুতোর ডগায় হাঁ-মুখ। সে, নাক গড়িয়ে নেমে আসা চশমাটা ঠেলে দেয় একবার ওপরের দিকে আর ভাবে। ভাববার সময় তার ঠোঁটজোড়া অল্প ফাঁক হয়ে থাকে। সেই সময় তার মুখে কোনও খুশিভাব থাকে না। মাথাজোড়া মণ্ডলে লেগে যায় বিষণ্ণতার দাগ। আর সেই দাগ রুমালে মুছলেও যায় না। কেন-না সমস্ত বিষণ্ণতা অপসৃত হওয়ার জন্য হাস্য অপেক্ষা করে। এখন হাসি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে দেখা যাচ্ছে অসমান দাঁতের সারি। সে হাসলে এই এবড়ো-খেবড়ো পঙ্‌ক্তিতেই আলোক প্রতিফলিত হয় এবং তাকে করে ঝলমলে, আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত।

এখন সে চলতে চলতে এমনই শ্লথ যেন তিমিত দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে হাসিখুশি এক তখতনামার জৌলুস। সে নজর করছে না। ভাবছে। এই যে বড় শহর, যার পথ-ঘাট দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে এখন, তার কতই-না বাজার, আর সেইসব বাজারে কতই-না জুতোর দোকান। সার-সার জুতো। বিচিত্র রং ও আকৃতি। সে এই জুতোজোড়া কিনেছিল এই শহরেরই একটি সুসজ্জিত দোকান

থেকে। তার সঙ্গে তখন চন্দ্রাবলী ছিল। জুতোর দামও সে-ই দিয়েছিল। বারবার উপরোধ করেছিল একজোড়া ভাল জুতো কেনার জন্য। সে ব্যয়ের কথা ভেবে সবচেয়ে সস্তা জুতোজোড়াই খুঁজছিল। চন্দ্রাবলী মনে করিয়ে দিয়েছিল চলাফেরাই তার কাজ। সুতরাং জুতোজোড়া মজবুত হওয়া দরকার। মজবুত এবং আরামদায়ক। কেন-না পা দুটিকে যত্ন ও সম্মান করা উচিত— শরীরের একজোড়া অপরিহার্য ও কর্মঠ অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু ভাল জুতোর চূড়ান্ত পর্যায় চন্দ্রাবলীরও ব্যয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল না। সে তখন একটু মাঝামাঝি জায়গায় রফা করে। দাম দেয়।

আজ ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফেটে যাচ্ছে। চন্দ্রাবলীর কেনা জুতো। চন্দ্রাবলীর উপহার দেওয়া জুতো। শুভদীপ নিজের শার্টের দিকে তাকায়। চন্দ্রাবলীর উপহার। প্যান্টের প্রতি দৃকপাত করে। বিখ্যাত তকমা, রেমন্ডস। গত পুজোয় চন্দ্রাবলীর দেওয়া। নিজের অজান্তে তার হাত চলে যায় চশমায়। এই দৃষ্টিযন্ত্র চন্দ্রাবলীর দেওয়া প্রথম বস্তু। একটি ডাঁটিভাঙা চশমা সে পরে চালিয়ে দিচ্ছিল দিনের পর দিন। চন্দ্রাবলী, দেখে ফেলার পরই তাকে জোর করে দোকানে নিয়ে যায়। এবং সে বছরই তার জন্মদিনে তাকে উপহার দেয় এই ব্যাগ। ডাকব্যাক। কলহংসের পিঠের মতো মসৃণ ও জলরোধক।

উপহার। উপহার দিয়ে তাকে ভরে দিতে চাইত চন্দ্রাবলী। গান শেখানোর আয় থেকে নিজের খরচ সামলে এইসব উপহার সহজ নয় সে জানে। কিন্তু চন্দ্রাবলী আশ্চর্য ইচ্ছার কথা বলত। ইচ্ছার অপরিমেয় শক্তির কথা বলত। বলত, শুভদীপ তার জীবনে আসার পর সে পেয়ে গিয়েছে এক অতি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন। রুপোর ছাতের তলায়, সোনার থালায়, হিরেকুচির ভাত খাবার কোনও লেশই ছিল না সেই স্বপ্নে। দু'কামরার ছোট বাড়ি, শুভদীপের বাজারের থলে থেকে একটা একটা মাছ, সবজি নামিয়ে দোপাট্টায় ঘাম মুছে রান্না চাপানো... আটপৌরে জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি। সে বলত আর শুভদীপ অসহিষ্ণু ক্রোধে তলায় তলায় ছটফট করত। এইসব আটপৌরে জীবনকে সে ঘৃণা করত, যেমন করত চন্দ্রাবলীকে...।

ইচ্ছা। ইচ্ছা। চন্দ্রাবলী ইচ্ছার কথা বলত। ইচ্ছার শক্তির কথা। সে মনে করত, স্বপ্ন আসলে ইচ্ছা। ইচ্ছাই নিজেকে লক্ষ্য বা স্বপ্ন হিসেবে স্থাপন করে, ইচ্ছাই নিজের মাধ্যমে জীবনকে লক্ষ্য বা স্বপ্নের নিকটতমে পৌঁছে দেয়।

সে, শুভদীপ, এইসব কথাকে গুরুত্ব দেয়নি কখনও। বরং শুনতে শুনতে সে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে কালাতিপাত করত। কিংবা, ঘন গাছের তলায়, জলাশয়ের ধারে, জোড়া জোড়া মানব-মানবীর মাঝে তারাও। সন্ধে নেমে এলে হাত ধরাধরি করত। তখন, জলের তলা থেকে উঠে আসত চাঁদ। বড়সড় চাঁদ। গোল চাঁদের উত্থান। সেই উত্থানের মুখোমুখি বসে গোল চন্দ্রাবলী বলে যেত তার ইচ্ছের কথা, অথবা রবি তরফদারের গৃহে থাকাকালীন তার প্রাপ্ত অবহেলা ও নির্যাতনের কথা। বলে যেত না থেমে। একটানা। ওই নির্যাতনের কবল থেকে সে যে বেরিয়ে আসার সাহস শেষ পর্যন্ত অর্জন করতে পেরেছে— আর পেরেছে শুভদীপের সান্নিধ্যের প্রভাবেই— এ কথাও বলত বার বার। শুভদীপ তখন তার নরম বর্তুলে হাত রাখত। চাপ দিত। নিষ্পেষণ করত। তার সারা শরীরের ক্ষুধা, ওই মুহূর্তে, ওই নিষ্পেষণের মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে চাইত সে।

এক বয়স্কা মহিলার বাড়িতে আরও তিনটি মেয়ের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে আতিথ্য নিয়ে থাকত চন্দ্রাবলী। সেই মহিলা, শ্যামাঙ্গিনী নাম এবং সহবাসিনী তিনজন সম্পর্কেও তার অভিযোগ কম ছিল না। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই অপছন্দের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন সে দেখত আর বলত সে-সব শুভদীপকে। সে শুধু অপেক্ষা করছিল, কবে রবি তরফদারের কাছ থেকে সে আইনত বিচ্ছেদ লাভ করে।

শুধুমাত্র এইসব উপহার ও স্বপ্নের মধ্যেই চন্দ্রাবলী থেমে থাকেনি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে একটি পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট খোলে এবং তার উত্তরাধিকারী করে দেয় শুভদীপ ভট্টাচার্যকে। জুতো কিনে দেবার দিনই তাকে পাসবই খুলে দেখায় চন্দ্রাবলী এবং দেখানোর সময় তার মুখে তৃপ্তির অভিব্যক্তি টসটস করে। শুভদীপ সেদিকে মন দেয়নি কেন-না, চন্দ্রাবলীর মৃত্যু পর্যন্ত

জড়িয়ে থাকবে এমন সম্ভাবনা সে স্বপ্নেও কবুল করেনি কখনও। সে, অতএব, জুতোর দোকান খোঁজার দিকে মন দিয়েছিল তখন। এবং চন্দ্রাবলীর উপহার দেওয়া জুতো নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

সেই জুতো আজ ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফেটে যাচ্ছে। চন্দ্রাবলীর উপহার দেওয়া জুতো। জুতো কি কেউ কারওকে উপহার দেয়? শুভদীপ আকাশের দিকে তাকায়। জুতো কেউ কারওকে উপহার দেয় না। জুতো চন্দ্রাবলী উপহার দেয়নি। জুতো কেউ কারওকে কিনে দেয়। তারা যখন ছোট ছিল— সে, দীপান্বিতা, বিশ্বদীপ— তাদের বাবা পুজোর আগে আগে তাদের সামনে বিছিয়ে দিত একটি বিশাল খবরের কাগজ। বিশাল কাগজ। খুব বড়। যেন আকাশের মতো। সেই আকাশ নানা ঢঙের জুতোয় ভর্তি। তারা তিনজন প্রায় চড়ে বসত সেই কাগজে। আর কাগজটা মন্ত্রপূত কার্পেট হয়ে যেত তখন। শোঁ-শোঁ করে উড়তে উড়তে, হাওয়ায় উড়তে উড়তে, তারা তিন ভাইবোন জুতো পছন্দ করত। এইটা না এইটা না এইটা। কোনটা? কোনটা? ওইটা। সে যেটা দেখাত, বিশ্বদীপও দেখাত সেটাই। আর দীপান্বিতা শুচু হয়ে বেছে নিত মেয়েদের জুতো। বাবা, ওই জাদু কার্পেট গুটিয়ে তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। তারা তখন কলরব করতে করতে জুতোর দোকানে চলল। একদিন জুতোর জন্য বেরোনো, একদিন পোশাকের জন্য। আর সেই দু'দিন রেস্তোরাঁয় খাওয়া। মায়ের জন্য বাক্সয় পুরে নিয়ে আসা। সব কিছুই।

বাড়ি থেকে তারা বাবার সঙ্গে বেরোয় অপরূপ শৃঙ্খলায়। বাবার হাত ধরে শুচু, বাবার হাত ধরে বিশ্বদীপ। আর সে বিশ্বদীপের হাত ধরে। মা দাঁড়িয়ে দরজায়। পুরনো বাড়িটার ইটগুলি অতখানি বিবর্ণ ছিল না তখন। অতখানি বিষণ্নতা ছিল না খাঁজে খাঁজে। মায়ের কানের লতি কেটে দুলজোড়া পতনোন্মুখ হয়নি তখনও। মা দরজায় দাঁড়িয়ে। সাধারণ করে শাড়ি পরা। মাথায় ঘোমটা। ফরসা, ছোটখাটো মা। বড় বড় চোখ। হাসি-হাসি মুখ। প্রসাধন নেই, তবু কী সুন্দর!

মা যাবে না। মা থাকবে। তাদের জন্য সুজি করে রাখবে। জলখাবার। তারা বাড়ি ফিরে সমস্বরে বলবে কী কী তারা খেল, আর

দেখল কী কী। মা হাসিমুখে সব শুনতে থাকবে। শুচু কেনা বস্তুসম্ভারের মোড়ক খুলে খুলে সাজিয়ে রাখবে বিছানায়। মা দেখার জন্য এগিয়ে আসবে আর বলতে থাকবে কত কী সে করে রেখেছিল ছেলেমেয়েদের জন্য। বাবা তখন খাবারের বাক্স মায়ের হাতে ধরিয়ে দেবে। মা সলজ্জ হেসে, ঘোমটা একটু টেনে, জানিয়ে দেবে, ছেলেমেয়েদের খাওয়ালেই হত। তার জন্য আনার আর এমন কিছু দরকার ছিল না। বাবা কোনও জবাব দিল না তখন। বরং বসল খবরের কাগজ নিয়ে।

এমনই ঘটে, ঘটে তাকে প্রত্যেকবার। এমনই বলে মা, আর বাবা এমনই কাগজ পড়ে বছরের পর বছর। আর মায়ের পায়ের মানচিত্র নিয়ে গিয়ে পছন্দমতো জুতো কেনে। একটা সাদা কাগজ বাবা পেতে দেয় আর মা লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তার ওপর বাঁ পা রাখে। আর বাবা বাঁ পা তুলে কাগজে ডান পা রাখতে বলে মাকে। মা পা বদলায়। বাবা তখন যত্ন করে এঁকে নেয় মায়ের পায়ের মানচিত্র। মা তখন শাড়িটা অল্প তুলে নেয়। পায়ের ফরসা গোছ বেরিয়ে আসে। তখন মা-র নাকের ডগা লালচে হয়ে যায়। তারা তিনজন, তিন ভাইবোন, মা-বাবাকে ঘিরে ধরে দৃশ্যটা দেখে। গম্ভীর থাকে তখন তারা। কিছুটা উদ্বিগ্নও। যেন কী এক মহাকাণ্ড হয়ে চলেছে।

বাবার আঁকা হয়ে যাবার পর মা বাবার পায়ের ধুলো নেয়। আর এই পর্যন্তই তারা শান্ত দাঁড়িয়ে থেকে পুরো কাণ্ডটি ঘটাতে সাহায্য করেছে বরাবর। এমনকী মায়ের জুতো কেনার সময়ও বাবাকে তারা দেখেছে গভীর মনোযোগী। প্রকৃতপক্ষে জুতো নয়। চটি। মায়েরা জুতো পরে না কখনও-ই। পরে চটি। বাবা সেই চটি কিনে দেয়। তাদের জুতো কিনে দেয়। উপহার দেয় না। আর কবে যেন, এরকমই চলতে চলতে সব থেমে গেল একদিন। কবে থেমে গেল! কোন বছর! ক্যালেন্ডারে কেউ লিখে রাখেনি দিনক্ষণ।

চন্দ্রাবলীও কিনে দিয়েছিল। জুতো কিনে দিয়েছিল। তার দেবার কোনও শেষ ছিল না। বস্তুগত আর বস্তুর অতীত সবই সে পরম উপাদেয় করে তুলে ধরতে চাইত তার জন্য। সে চন্দ্রাবলীকে মুখে

পুরত আর কুলকুচি করার মতো ছুড়ে দিত পরক্ষণে। এ রকমই চলতে চলতে সব থেমে গেল একদিন। কবে থেমে গেল! কোন বছর! এই তো, এক বছরও পেরোয়নি। কোন দিন! কোন মাস! সে ক্যালেন্ডারে লিখে রাখেনি দিনক্ষণ।

কী দিত তাকে চন্দ্রাবলী? কী কী দিত? তার গা গুলিয়ে ওঠে। কেন, সে জানে না। তবে চন্দ্রাবলী সম্পর্কে তার এই অনুভূতি নতুন নয়। এই বিবমিষা নতুন নয়। ঘৃণায় পেট মোচড় দেয় তার। সে দাঁড়ায়। দু'হাতে পেট চেপে ধরে এবং ওয়াক তোলে। নিজের সম্পর্কে কিছুটা সম্বিৎ ফেরাবার চেষ্টা করে সে। কখন খেয়েছিল শেষ? পেট খালি? অম্বল হয়ে গেল? চৈনিক খাবারের স্বাদ-গন্ধ তার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে চন্দ্রাবলীর কোমর। চওড়া ভারী কোমর। এক অসংবৃত পশ্চাৎ। বহু অপ্রয়োজনীয় মাংসে বিসদৃশ। কালো রং। কোমরের ওপর থাক থাক মাংসল ভাঁজ। সালোয়ার-কামিজের ওপর দিয়ে সেইসব চূড়ান্তভাবে পরিস্ফুট থাকে। আর শাড়ি পরলে কিংবা পোশাক উন্মোচিত যখন—ওই পরতের পর পরত মাংসল খাঁজে জমে থাকে গাঢ়তর অন্ধকার। কিংবা প্রকৃতপক্ষে কালো তার ত্বকের বাহার আসলে জমে থাকে রজনী সদৃশ। আর সেই তমস পেরিয়ে চওড়া পুরু পিঠ। প্রস্থই অধিক হয়েছে ক্রমশ। দৈর্ঘ্য ছাপিয়ে। কায়িক স্ফীতিকেই যেন সে বরেণ্য ধরেছে। এই প্রস্থেরই, স্ফীত প্রস্থেরই উল্টো পিঠে কণ্ঠ হতে নেমে আসা উত্তাল স্তনদ্বয়। ভারী ও তুমুল। বুকে কোনও উপত্যকা রাখেনি তার পেশির অপরিমিত, অযোগ্য বিস্তার। ভারী-ভারী-ভারী স্তন। শ্বাসরুদ্ধকারী স্তন—যা সে প্রথমবার স্পর্শ করেছিল, তার সরু, কোমল, সাদাটে আঙুল দ্বারা স্পর্শ করেছিল না-দেখেই। কাম ছাড়া, তীব্র খিদে ছাড়া, এতটুকু মায়া ছিল না তার আঙুলের শীর্ষদেশে।

বুকের ওপর যে গলা, তার সঙ্গে বুকের টানাটানি, আর গলার ওপর যে বড় গোলাটে মুখ—সেই মুখের সঙ্গে টানাটানি এই মহাবিশ্বের ত্রিমাত্রিক শূন্যতার—যার অনেকটাই সে দখল করে নেয়। আর মহাবিশ্বের আরও বহু বস্তুর প্রতিযোগী হয়ে ওঠা মুখমণ্ডলে

তারও আছে একজোড়া পুরু ঠোঁট ও চাপা নাক। নাকের ওপর একজোড়া বড় বড় চোখ, চোখের ওপর কৃশ, দীর্ঘাঙ্গি ভুরু। ভ্রূ ছাড়িয়ে ছোট কপালের ওপর এসে পড়া অলকচূর্ণ, তার রাশিকৃত, ঘন, দীর্ঘ চুল থেকে এসে পড়া।

শুভদীপ যেদিন প্রথম তার সঙ্গে রাত্রিবাস করে, হঠাৎ ঘটে-যাওয়া ঘটনাবশত রাত্রিবাস করে, সেদিন স্নান-শেষে অতিথি-নিবাসের জোড়া বিছানার একটিতে সে শুয়ে ছিল চুল এলায়িত করে। দেহ তার দেহবল্লরী নয়। বরং দেহগাছা। বা দেহবৃক্ষ। সেই দেহবৃক্ষ মেলে, চুল এলিয়ে, চোখ বন্ধ করে সে শুয়েছিল সেদিন। তারা চলেছিল রায়মাটাং বনে। সেখানে রবিদা আগেই একটি দল নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তারা সেই দলে যোগ দিতে যাচ্ছিল। পথে রেলগাড়ির লাইনচ্যুতি হয়, তারা একটি বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়। কিষাণগঞ্জ ইস্টিশান থেকে তারা শিলিগুড়িগামী একটি ছোট রেলে চাপে। এবং শিলিগুড়ি পৌঁছয় সন্ধে নাগাদ। দূরপাল্লার সমস্ত বাস তখন চলে গিয়েছে। তাদের লক্ষ্যগামী ইন্টার সিটি নামের শেষ রেলগাড়িটিও ত্যাগ করেছে ইস্টিশান। অতএব তারা তখন একটি অতিথি নিবাসে যায় এবং একটিমাত্রই ঘর নিয়ে ফেলে। সেই ঘরে চন্দ্রাবলী স্নান সেরে, চুল এলায়িত করে, দেহবৃক্ষ টান-টান, চোখ বন্ধ— চোখ, চক্ষু, নয়ন, লোচন, আঁখি, দৃকপাত যন্ত্র—চন্দ্রাবলীর শরীরের একমাত্র সুন্দর অঙ্গ। যদিও সে লক্ষ করেনি। জানেনি কখনও। দেখেনি কোনও দিন। দেখেনি আলাদা ভাবে, দেখার মতো করে। তারও যে শরীরের কোথাও, কোনও এক অঙ্গে সৌন্দর্য মাখা ছিল। সেই অঙ্গ চোখ। সেই চোখ বড় কিন্তু হরিণচঞ্চল নয়। অতলস্পর্শী গভীর। গাভীর চোখের মতো বেদনার করুণ ভাষাসংবলিত স্থির ও শান্ত। মূক ও ভীত। দেখেনি সে প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন। এমনকী শেষ দিনও। চন্দ্রাবলীর কোনও কিছুই সে দেখেনি, খোঁজেনি, বুঝতে চায়নি। চন্দ্রাবলীর জন্য সে এতটুকু ক্লেশ সইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। বস্তুতপক্ষে চন্দ্রাবলী ছিল তার কাছে যেচে-আসা, ডানা-মুচড়ানো পাখি। সে ছিল স্বয়মাগতা। সে ছিল

বাধ্য। আত্মনিবেদিত। শুভদীপ তাকে চায়নি। কখনও চায়নি। বরং ঘৃণা করেছে ওই পুরু ঠোঁট, চাপা নাক, কালো রং এবং থাক থাক চর্বি। তার নিজের ছিপছিপে ঋজু নির্মেদ শরীরের পাশে ওই পৃথুল শরীরকে সে ঘৃণাই করেছে বারবার।

একটি গোরস্থানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। শহরের বড় বড় গোরস্থানের একটি। ইসলামে দীক্ষিত মানুষদের এখানে গোর দেওয়া হয়। গোর দেওয়া হয় কখন? মৃত্যুর পর। মরে গেলে। প্রাণহীন দেহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় মাটির কাছে। মাটির বস্তু মাটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর এই প্রত্যর্পণের মধ্যে জেগে থাকে মৃত্যু।

সেই জাগ্রত মৃত্যুকে স্পর্শ করার বাসনায়, সে, শুভদীপ, গোরস্থানের প্রাচীর স্পর্শ করল একবার। তাকাল ওপরের দিকে। উঁচু প্রাচীরের সীমানা ছাড়িয়ে বড় বড় গাছের উদাত্ত ডালপালা। সবুজ পাতায় ভরা। এখন যে যথেষ্ট বিকেল তার আলো এসে ভরে আছে বৃক্ষশীর্ষে। তবু, তার মনে হয়, ওই সবুজে লেগে আছে কিছু অন্ধকার, কিছু কিছু গাম্ভীর্য। বিষণ্ণতা নয়, বরং অনিবার্য পরিণতির বিষয়ে জ্ঞানগম্ভীর ঔদাস্য।

সে নিজের অশান্ত বুকে হাত রাখে। অস্থির মস্তিষ্কের ওপরকার খুলিতে হাত বোলায়। তারপর, শান্তির সন্ধানে, কিংবা মৃত্যুর সন্ধানে, কিংবা মৃত্যুর উদাস নিরপেক্ষ গাম্ভীর্যকে আত্মস্থ করার অভিপ্রায়ে সে এগোয়। খুঁজতে থাকে প্রবেশদ্বার।

তার যাবার কথা ছিল একটি ভ্রমণ সংস্থায়। সেখানে গেলে কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত। বিজ্ঞাপনের মূল্য থেকে দুই শতাংশ তার মাসিক আয়ে যোগ হতে পারত। যোগ হলে, সংসারের হাঁ-মুখ চুল্লিতে কিছু জ্বালানি যোগানো যেত। যোগালে মায়ের অভিযোগ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকত।

মায়ের অভিযোগ। মা। সে একবার থমকে দাঁড়ায়। তার কিছু মনে পড়ার কথা, অথচ মনে পড়ে না। পরিবর্তে মায়ের মুখ। ক্লান্ত, হতাশ, স্থিতিশীল বিরক্তি-ভরা মুখ। এ-মুখে সেই প্রসন্নতা আর নেই যা সে

দেখেছে ছোটবেলায় আর নিরন্তর অধিকার করেছে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বড় হয়েছে সে। আর বড় হতে-হতে, বড় হতে-হতে প্রাক ত্রিশে পৌঁছবার পর চোখ খুললেই দেখতে পাচ্ছে মায়ের প্রসন্নতার ওপর কাল ও পরিস্থিতির সমুচ্চ প্রলেপ। মা এখন সংসারের হাঁ-মুখ অন্ধকার ছাড়া জানে না কিছুই। ইনিয়ে-বিনিয়ে দুঃখ-কষ্ট সমুদ্ধার ছাড়া, অভাবের দৈনন্দিন অভিযোগ এবং জীবনে কিছুই না পাবার উচ্চকিত ঘোষণা ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না। আর কিছু আছে কি? শুভদীপ ভাবে একবার। দুঃখের নিবিড় বসতি ছাড়া আর কিছু আছে কি সংসারে?

সহসা তার মনে পড়ে যায় যা-কিছু মনে পড়ার কথা। দরজা। গোরস্থানের দরজা। যা সে খুঁজছিল এতক্ষণ। এবং তৎক্ষণাৎ মা অন্তর্হিত হয়ে যায় মন থেকে। বরং বেশি করে মনে পড়ে চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী আর মৃত্যুর ঔদাস্য। মৃত্যুর ঔদাস্য আর এই বিকেল। বিকেলের আলো বৃক্ষশীর্ষ থেকে গড়িয়ে পড়েছে প্রবেশদ্বারে আর বিছিয়ে গিয়েছে ভূমিতেও। যেন এই আলো এক ভূমিসূতা। যখন সে জলে নামে আর হয়ে যায় জলকন্যা, তার থেকে এখন রকম আলাদা। সে এখন অপেক্ষা করে আছে কোন ক্ষণে এসে যায় এক মৃতদেহ আর তাকে মাড়িয়ে শববাহকেরা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বন্ধ দ্বার। খুলে যাবে তখন। আর সে তৃপ্ত হবে। ভূমিসূতা, ভূমিশায়িতা আলোর টুকরো।

বন্ধ দ্বার। সবুজ রং করা। আর এই সবুজে কোনও ঔজ্জ্বল্য নেই। মরে যাওয়া ফ্যাকাশে সবুজ। মৃতদের জন্য মরে যাওয়া রং।

সে রং সম্পর্কে কোথাও কোনও অভিযোগের কথা ভাবে না। বরং একবার প্রাচীরের ওপর মাথা তুলে থাকা বৃক্ষশীর্ষদের দেখে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে থাকা অন্ধকার দেখে। এবং প্রবেশদ্বারের দিকে পিঠ করে অবশিষ্ট পৃথিবীর দিকে মুখ করে তাকায়। বহুতল বাড়িগুলির উচ্চতা চোখে পড়ে তার। চাকচিক্য চোখে পড়ে। জানালায় রকমারি পর্দা আর লৌহজালিকার বারান্দা। একটি বাড়ির সঙ্গে আরেকটি বাড়ির আয়তনের পার্থক্য ছাড়া আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য কিছু নেই।

প্রত্যেক বাড়িই যেন একজন স্থপতিরই পরিকল্পিত। অথবা স্থপতি বহু, কিন্তু তাদের শিল্পভাবনায় বৈচিত্র্য নেই, নতুনত্ব নেই। কোনও অদৃশ্য কারিগর তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে একই ছাঁচে ছাঁদে রকমে ঢালাঢালি করে থিতু হয়েছে। একেক বাড়িতে বসবাসকারী দশাধিক পরিবারের বসনকলা পৃথক করা যায় না। একেবারে ন্যাড়া ডালে কাকের বাসার মতো। তফাত শুধু বাড়িঘেরা চাকচিক্যে। বিজ্ঞাপনের রকমে ও বাহুল্যের তারতম্যে।

বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়ে। সে নিজে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারি। ছোটখাটো বিজ্ঞাপন। পাঁচশো, হাজার, দু'হাজার, পাঁচ হাজার—সর্বোচ্চ দশ। দশের শিকে ছিঁড়লে তার নিখুঁত প্রাপ্তি দুশো। অতএব তাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞাপনের ফিরিওলা। ব্যাপারি হল তারা যারা এইসব মেয়েদের বিজ্ঞাপনে নিয়ে আসে।

সে দেখে। বিজ্ঞাপনের মেয়েদের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব ও অর্ধনগ্নতা দেখে। কিছুক্ষণ দ্রব চোখে তাকায়। মুহূর্তে তিনটি শরীর তার চোখে ভেসে ওঠে। তিনটি নারীদেহ। এই দেহসমূহের সঙ্গে এই আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত সে যৌনভাবে সম্পর্কিত।

বিজ্ঞাপনের নারীটি আর সাত কিলো মেদসমৃদ্ধ হলে তার প্রথম নারী হতে পারে। প্রথম নারী—যে তাকে ভালবাসেনি এবং যে তাকে প্রথম যৌনতার স্বাদ দিয়েছিল। যে তাকে বেঁধেছিল মোহে এবং মোহভঙ্গে। এবং শেষ পর্যন্ত সেই নারী হয়ে দাঁড়ায় প্রতারক।

এরপর দ্বিতীয় নারী। তার প্রতি ছিল তীব্র টান। কী টান সে জানে না। কায়িক না বৌদ্ধিক সে জানে না। শুধু টান জানে। অলৌকিক অপ্রতিরোধ্য টান জানে। তার সঙ্গে খোলাখুলি পরিপূর্ণ যৌনতা সম্ভব হয়নি কখনও। হয়েছিল আংশিক। কর্মদপ্তরের একাকী নির্জনতায় কিংবা ফ্ল্যাটের নিষিদ্ধ অভিনিবেশে। সে বড় কৃপণ ছিল এইবেলা। কিংবা গভীর ছলনাময়ী। শুভদীপকে একদিন না দেখলে তার চলত না। একদিন স্পর্শ করতে না পারলে সে মধ্য রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদত। অথচ এই স্পর্শমাধ্যমে সে কেবল উসকে দিত তাকে যেমন দখিনা বাতাস উসকে দেয় ধিকিধিকি দাবানল। উসকে দেয় আর

আগুন প্রজ্বলিত হয়। প্রজ্বলিত হয় আর লেলিহান উন্মাদ আগুন ধ্বংস করে, গ্রাস করে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় স্নিগ্ধ, শ্যামল, নির্বিরোধী, পরহিতব্রতী, জ্ঞানী বনাঞ্চল। এবং এই জ্বালামুখী টান, এই উসকে দেওয়া টান একদিনে, মাত্র একদিনে, মাত্র এক মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে—যেমন গিয়েছিল তার ও মহুলির।

এমন আংশিক প্রাপ্তি ঘটত বলেই প্রজ্বলিত অগ্নি তাকে উন্মত্ত করে দিত। তাকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না, ত্বকের গভীরে কতখানি দাহ নিয়ে সে চলে, ফেরে। এই দাহ এই উন্মাদনা সমেত সে পাগল-পাগল শেষ পর্যন্ত উপগত হয়, ঘৃণা নিয়ে নিরাবেগ উপগত হয় চন্দ্রাবলীতে। আর চন্দ্রাবলী খুলে খুলে দেয় নিজেকে। বার বার। নির্দ্বিধায়। আপন স্বপ্নে আপনি মশগুল হয়ে। ভাবে না। হিসেব কষে না। শুধু স্বপ্নের তীর ধরে গান গেয়ে-গেয়ে ফেরে। চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী। মোটা। গোল। কালো। বেঁটে। সাধারণের চেয়েও সাধারণ অনাকর্ষণীয় চন্দ্রাবলী।

সেই অগ্নি সঞ্চার করা নারী, তাকে কি প্রতারক বলা যায়? যায় না? যায় না? তা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

আবার বমি পায় তার। আর বিবমিষা থেকে বাঁচতে সে বিজ্ঞাপনের নারীশরীর থেকে চোখ সরায়। অনুভব করে, রাস্তার এই পারে গোরস্থানের কাছটায় যে মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য, অন্য পারে ভেঙে খানখান হয়ে আছে। জনগণের স্বৈর শব্দে, বিপণনের ছড়িয়ে পড়া রঙে, উদাত্ত গৃহগুলির অহংকারী গৃহস্থালিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জীবন। যেন এই পথ পেরুলেই সে পৌঁছে যাবে মৃত্যু থেকে জীবনে।

কিন্তু জীবনবিমুখ সে। পথটুকু পেরিয়ে গেল না। শুধু অনুভব করল, ও-পারের আটতলা বাড়িটিও তার জীবনে ঢুকে বসে আছে। ওই বাড়ির মধ্যেকার সমস্ত অজানা সমেত তার এই বেঁচে থাকা। যেমন একজন মানুষের মনের ভিতরকার গাঢ় অজানা জড়িয়ে তৈরি হয় সম্পর্ক, বছরের পর বছর, আর ওইসব অজানা অজ্ঞাত রাশি নিয়ে মানুষে মানুষে শোয় পাশাপাশি, গলা জড়াজড়ি ঘুম দেয়,

ভালবাসে, একজন হয়তো খুন করেছে সেদিন, একজন গোপনে গমন করেছিল অন্যজনে, দপ্তরে তহবিল তছরুপ করে ফিরে এল হয়তো কেউ, আর ভালবাসল ফিরে এসে, জানাল না এ ওকে কিছু আর ভালবাসল, ভালবাসে কিংবা ভালবাসা মাখিয়ে নিয়ে ঘৃণা করে প্রকৃতই, ঘৃণা করে আর বালিশের তলায়, তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখে মিথ্যা। মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে পরস্পরের ঠোঁটে তুলে দেয় পবিত্র চুম্বন, ভানের ভিতর নারীর স্তনবৃন্তে মুখ রাখে পুরুষ আর উরুর ভাঁজে কৃতকর্ম সংগোপনে রেখে নারী দুই উরু উন্মোচিত করে দেয়।

যেমন সে নিজে, যেমন সে ঘৃণা করে চন্দ্রাবলী আর প্রত্যেকবার তার বিবাহপ্রস্তাব নাকচ করে দেয় অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে। প্রকৃতপক্ষকে সে আবডালে রাখে। সন্তর্পণে গোপন করে সত্যকে এবং জানতে দেয় না ঘৃণা। জানতে দেয় না অপছন্দ। বলে না যে একমাত্র চন্দ্রাবলীকেই সে বিবাহ করতে পারে না।

একটি গাড়ি ধোঁয়া ছড়িয়ে চলে যায়। ধোঁয়া লাগে শুভদীপের গায়ে। সে অপস্রিয়মাণ গাড়িটিকে দেখে ও ভাবে এই গাড়িও তার জীবন কি না। এবং সে ঘুরে দাঁড়ায়। নিশ্চিত হয়। যা কিছুই ঘটছিল চারপাশে, সবই ছিল তার জীবন। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া অজ্ঞাত মানুষের ঠিকানাও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জন্মাবধি। পৃথিবীর সব মানুষই আসলে নিজের জীবনের সঙ্গে যাপন করছে কোটি কোটি জীবন। সে একজন মানুষ, সে যদি স্থির হয়, তাকে ঘিরে আবর্তিত জগতের প্রতি বিন্দু তারই জীবন। শুধু মৃত্যু আলাদা। মৃত্যু তার একার। মৃত্যু যার-যার তার-তার। একজনের মৃত্যুতে থেমে যায় না অন্য কোনও জীবন। কিছুদিনের জন্য শ্লথ হয়। কিছুদিনের জন্য আঘাতে বিবর্ণ থাকে, কিংবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যু হয়তো পাল্টে দেয় কারও জীবনের অভিমুখ, কিন্তু থেমে যায় না। জীবন থামিয়ে দেবার সাধ্য নেই জীবিতের বা মৃতের।

সহসা সে হাত মুঠো করে। মনে মনে পদাঘাত করে নিজেকে।

জীবনকে ভাবছে সে! কেন! তার আর জীবনকে প্রয়োজন নেই! সে মৃত্যুকে জানতে চায়। মৃত হয়ে উঠবার আগে মৃত্যুর অসামান্য নিরপেক্ষতার স্বাদ ও সন্ধান সে পেতে চায়।

গোরস্থানের প্রবেশদ্বারে ধাক্কা দেয় সে। একটি পাল্লার মাঝবরাবর একটি ছোট দরজা, দরজার মধ্যে দরজা, নিঃশব্দে খুলে যায়। সে নিচু হয়ে প্রবেশ করে ভিতরে আর তার সামনে থরে থরে সাজানো দেখতে পায় হিমেল জীবন।

ডিসেম্বরের বিকেলে এই শহরেরই মধ্যবর্তী এক উঁচু প্রাচীর পেরোলেই শীত এসে জাপটে ধরে জানত না সে। তার হাত দুটি শীতল হয়ে যায়। বাম থেকে ডানে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টি ফেরাতে থাকে সে। তখন মানুষটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন। পীরের দরগার জন্য যে ঘেরা জায়গা, তার বাইরে একটি বেঞ্চে তিনি বসে আছেন। শুভদীপের জন্য দরজা খুলে দিয়ে ফিরে গেছেন সেখানে। ডাকছেন এখন। শুভদীপ এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। বয়স্ক ছোটখাটো মানুষ। সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা। সাদা চুল। সাদা দাড়ি। মাথায় গোল টুপি। মুখে দৃঢ়তা। চোখে সারল্য। কিন্তু কপালের মাঝ-বরাবর সমান্তরাল সরলরেখা হয়ে ফুটে আছে জিজ্ঞাসা। কেন এসেছে সে। সে উত্তর দিচ্ছে, তার শান্তির জিজ্ঞাসা। শান্তির সন্ধান। মৃত্যু বলছে না সে। এই বিদগ্ধ মানুষটির কাছে এসে আর মৃত্যু বলছে না। শান্তি বলছে। এই মৃত মানুষদের সান্নিধ্যে, এই গাছপালার ছায়ায়, পাশাপাশি শুয়ে থাকা নিবিড়তার মধ্যবর্তী এই শৈথিল্যে, মানুষের অন্তিম পরিণতির এই মহাস্থানে তার শান্তির খোঁজ।

মানুষটির মুখ সম্ভ্রান্ত হাসিতে ভরে যায়। তারপর তাতে প্রসন্নতার স্পর্শ লাগে। তাঁর প্রসন্ন হাসি মুখমণ্ডলে বিস্তারিত হতে হতে গাল বেয়ে, কাঁধ বেয়ে, মাটিতে বকুলফুলের মতো ঝরে পড়ে টুপটাপ। তিনি ইঙ্গিতে মাথা ঢেকে নিতে বলেন। শুভদীপ মাথায় রুমাল জড়িয়ে নেয়। সন্ধে নামলেই যেন সে বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধ মানুষ বকুল ঝরিয়েই বলেন। সে সম্মত হয় এবং পাখ-পাখালির ডাকে সন্ধ্যার সমাগত স্বরের ইশারা পায়। এখানে এই ঘেরা জায়গায়, ঘন গাছের গা

ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থানে সন্ধ্যা দ্রুত নামে। ছায়া জমে জমে হয়ে যায় টিপি-টিপি অন্ধকার।

সারি-সারি কবরের মধ্যবর্তী পথ বেয়ে হেঁটে যায় সে। বৃদ্ধ মানুষটি তার পাশাপাশি। এইখানে শায়িত মানুষেরা শান্তিতে আছেন—ঘোষণা করেন তিনি। তৃপ্তি ও শান্তি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যাখ্যা করে যান। সেই মতামত ধ্রুব। সমস্ত জীবন অসংখ্য উপলব্ধির মাধ্যমে এই ধ্রুবত্বে তিনি পৌঁছেছেন। তাঁর ছেলে মারা গিয়েছে যক্ষ্মায়। একমাত্র সন্তান। সেই মৃত্যুশোক হরণ করেছে তাঁর স্ত্রীকে। এ জগতে আপনার বলতে টিকে ছিল একটিমাত্র ন্যালাখ্যাপা ভাই। পাঁচ বছর আগে রেলের তলায় সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রেলব্রিজের ওপর দিয়ে সে সংক্ষিপ্ত সময়ে পার হয়ে যেতে চেয়েছিল। পারেনি। সে যখন ব্রিজের মাঝবরাবর, তখন রেলগাড়ি এসে পড়ে। প্রাণভয়ে সে দৌড়েছিল, চালকও গতি রোধক যন্ত্রে দিয়েছিল টান। কিন্তু যা হবার তা হল। তার দেহের টুকরো-টাকরা কিছু ব্রিজে রইল, কিছু পড়ল নীচের রাস্তায়।

অপরূপ হাসি তাঁর মুখে বিস্তার পায় এবার। আর বিস্তার পেতে পেতে অনন্তে মেশে। অপরূপ এই হাসি। অপূর্ব। কেন-না, তিনি স্মরণ করেন, ভাইয়ের শরীরের প্রতিটি টুকরোই, যা নীচে পড়েছিল ও যা ছিল ওপরে, তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সহজ ছিল না সেই কাজ, কিন্তু তিনি সম্ভব করেছিলেন। রেলের আরক্ষাকর্মীরা তাঁকে সাহায্য করেছিল। নিশ্চয়ই করেছিল।

ন্যালাখ্যাপা ভাই তাঁর। সংক্ষেপে পথ পেরোতে চেয়েছিল। পারেনি। তার সেই অপারঙ্গমতায় এই মানুষটি একা। নিশ্চিতই একা।

পাকা চুল ও দাড়ি সমেত নিশ্চয়তার মাথা নাড়েন তিনি আর তৃপ্তির কথা, শান্তির কথা বলেন। এই যে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন তিনি, গোটা গোরস্থানের দেখ-ভাল—এই নিয়ে তিনি তৃপ্ত। তাঁর কোনও অভিযোগ নেই, আক্ষেপ নেই। তাঁর এখন একটিমাত্র চাওয়া—একবার ঘুরে আসবেন ফুরফুরা শরিফ। তাহলেই শান্তিতে ভরে যাবে তাঁর মন। আর আল্লার ডাক পেলেই তিনিও শুয়ে পড়বেন স্ত্রী-পুত্র-ভাইয়ের কবরের কাছাকাছি।

কথা শেষ হয়। তিনি থমকে দাঁড়ান। শুভদীপও দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে বৃদ্ধের আত্মস্থ রূপ। কোন অসীমে মিলেছে তাঁর দৃষ্টি। যেন তাঁর স্ত্রী, ছেলে আর ভাইয়ের অস্তিত্বকে স্পর্শ করে ফিরে আসছে।

আত্মস্থ ভাব থেকে তন্ময় হলেন তিনি। মুখে ফিরে এল হাসি। নিচু স্বরগ্রামে তিনি কথা বলে চললেন। একই কথা। হতে পারে, আর কোনও কথা নেই, ফুরিয়ে গিয়েছে সব। রয়ে গেছে এইটুকু। বার বার বলার। শোনানোর অন্যকে। শোনানোর নিজেকে। একা নন। একা নন। একা তিনি নন। এইসব কবরে শায়িত অসংখ্য মানুষকে তাঁর সঙ্গী মনে হয়। এইখানে শুয়ে আছে স্ত্রী, ছেলে, ভাই। তিনিও শুয়ে পড়বেন পাশাপাশি একফালি জায়গায়। বাজে, বেজে চলে আত্মগত স্বর। শুয়ে পড়বেন তিনিও। আর ভাবনা কী! শান্তি শান্তি। সব শান্তি। হারানোর বুকফাটা হাহাকার বেজেছিল একদিন। এখন শান্তি। সব শান্তি।

শুভদীপ দেখল, মানুষটির মুখ থেকে তন্ময় হাসি ছড়িয়ে পড়ল টুপটাপ, বকুল ফুলেরই মতো। আর তিনি, শুভদীপকে একা হতে দিয়ে, দু'হাত পেছনে জড়ো করে ফিরে চললেন আগের জায়গায়।

এই মানুষ, গোরস্থান আগলে রাখা মানুষ, মৃত লোকেরাই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন। শুভদীপ মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যায়।

অগুনতি কবরের সারি। ছোট, বড়, মাঝারি। নতুন ও পুরনো। জীবিতের সামর্থ্য অনুযায়ী মৃতের সমাধি-ফলকের কারুকাজ। মৃতের গুরুত্ব অনুযায়ী জীবিতের শ্রদ্ধা-ফলক। সে একটি বর্ণও পড়তে পারে না সেইসব ফলক থেকে। বরং একটি সুদৃশ্য শ্বেতপাথরের সমাধির কাছে দাঁড়ায়। টের পায়, এই জায়গাটিতে গাঢ়তর শীত ও সন্ধ্যার ইশারা ত্বক ভেদ করে ঢুকে পড়ছে। কুয়াশার দল এসে জমে যাচ্ছে সামনে কেন-না ওখানে আছে পাড়-বাঁধানো জলাশয়। বাইরের রাস্তা থেকে ভেসে আসা গাড়ির শব্দ ডুবে যাচ্ছে জলে। সে গিয়ে বসছে জলাশয়ের কিনার ঘেঁষে। একটি অজানা গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সুগন্ধ নয়। দুর্গন্ধও নয়। নয় মাদকতাময়। নতুন ও গভীর

এই ঘ্রাণ। হতে পারে মৃত্যুর গন্ধ এই। হতে পারে সেই নিরপেক্ষ, নির্লোভ, শান্ত নারী যখন বেশবাস পরিবর্তন করে, তখন এমনই গন্ধ আসে গা থেকে তার।

সে শুয়ে পড়ল এবার। জলাশয়ের বাঁধানো পাড়ে শুয়ে পা ছড়িয়ে দিল। একটি-দুটি শুকনো পাতা খসে পড়ল গায়ে। তার হাতের সঙ্গে, পায়ের সঙ্গে, মাথার সঙ্গে, ব্যাগের সঙ্গে সংযুক্ত মহাবিশ্ব আবর্তিত হয়ে চলল আপন ইচ্ছায়। সে চোখ বন্ধ করল আর কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলল অতীত আর বর্তমানের মধ্যবর্তী সীমারেখা।

তখন মাতলা নদীতে নৌকা ভাসাল মাঝিরা। বড় যন্ত্রচালিত নৌকা। পাটাতনে ছাউনি দেওয়া। রীতিমতো শয্যা পেতে দু'দিনের জীবন-যাপন। নৌকাতেই রান্না খাওয়া প্রাতঃকৃত্য শয়ন। কিছু অংশ খোলা। নদীর হাওয়ার জলসম্ভব ঝাপটা লাগছে সেখানে। সেই ঝাপটা মেখে, মদ্যপান করতে করতে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের আয়োজন করছে অন্য যাত্রীরা। রবিদাও আছেন দলে। রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। রবিদা রান্নার ব্যবস্থাপনায়। তাঁকে একটু ব্যস্ত দেখাচ্ছে তাই। সে এসেছে রবিদার অতিথি হয়েই। আর রবিদার সঙ্গে আছে তাঁর স্ত্রী। কালো, মোটা, বেঁটে, গাভীর মতো ভাষাহীন অথবা শুধু বেদনার অভিব্যক্তিময় চোখ। সাধারণের চেয়েও সাধারণ, অনাকর্ষণীয় চন্দ্রাবলী। এক অপরূপা মহিলা রবিদার পাশে পাশে। রবিদা চন্দ্রাবলীর দিকে ফিরেও দেখছেন না। এ দৃশ্য নতুন নয় তার চোখে। এই রবিদা ও অপরূপা মহিলারা। সুন্দরী মহিলাদের প্রতি রবিদার প্রসক্তি প্রবল। সে জানে এবং এই প্রসক্তিকে লাম্পট্য ভাবে না। শুধু রূপ দ্বারা পুরুষ নারীকে জয় করতে পারে। শুধু গুণ দ্বারাও পারে আর রূপ বা গুণ না থাকলেও অর্থ ও সাহসের সঙ্গতি দ্বারা যুগ-যুগান্তর ধরেই সে পেয়ে যায় অগুনতি অপরূপা নারী।

রবিদা চন্দ্রাবলীর দিকে ফিরেও দেখছেন না। আর চন্দ্রাবলী তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। সেও মদ্যপান করে না বলেই চন্দ্রাবলীকে সঙ্গী করে সরে আছে এইদিকে। চন্দ্রাবলী নানা কথা বলছে। সে-ও বলছে। আর

দেখছে মাতলা নদী বেয়ে নৌকা ক্রমে ঢুকে পড়ছে খাঁড়িতে। নৌকার যন্ত্রের শব্দে নদী আর জঙ্গলের স্তব্ধতা ভেঙে খানখান।

দু'পাশে ম্যানগ্রোভ বন। উষ্ণ মণ্ডলের বৃক্ষরাজি ঝুঁকে আছে জলে। যেন এখুনি ডালপালা ডুবিয়ে গা ধোবে বসন্তের নীরে। কেন-না সেদিন পূর্ণ বসন্ত। সেদিন ছিল দোলের পূর্ণিমা।

সুন্দরবন ঘন ও গভীর হচ্ছে। সে আর চন্দ্রাবলী বসেছে পাশাপাশি আর একগুচ্ছ বক জল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে পারে। আর এভাবেই ত্রস্ত হরিণেরা সন্ধ্যা শেষের খবর দিল রাত্রিকে আর বনে রাত্রি নামল। জলে রাত্রি নামল। নৌকাতেও নেমে এল ত্রস্ত রাত্রি। কেন-না দিনে দিনে যেমন রয় তেমন সয়। এই বাদাবনে রাত্তিরে বড় ভয় লাগে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। সুন্দরী, গরান, গর্জন, গেঁওয়া, কেওড়া, হোগলা, গোলপাতার ফাঁক থেকে কখন কী হেঁটে আসে আর শিকারের জন্য দেয় ঝাঁপ। এইসব ভেবে কোণে কোণে বাতি জ্বলল আর পাড় ঘেঁষে ঘাটে নোঙর করল নৌকা। যন্ত্র থেমে গেল। প্রকৃতির বিরুদ্ধতা থেকে প্রত্যাবর্তন করল প্রাকৃতিক স্তব্ধতায়।

জোয়ারের সময় এল তখন। পরতে পরতে জল এসে ঢেকে দিল ঢালু পাড়। নৌকা ক্রমশ উঠছে। উঁচু পাড় বরাবর হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন মদ খেয়ে গড়িয়ে পড়েছেন রবিদা। সঙ্গে আরও কেউ কেউ। ঘাটের ধাপ একটি একটি করে ডুবে যাচ্ছে। আর চাঁদ উঠছে। অন্নপ্রাশনের থালার মতো চাঁদ। একটু পুরনো কাঁসার। হতে পারে ঠাকুরমার দান। কারণ মস্ত চাঁদের গায়ে—হলুদে সোনার আভায় লালের আবেশ। ঝকমকে নয়। বরং পোড়া পোড়া। বরং অনেক বড়। বরং অনেক কাছাকাছি। শুভদীপ স্তব্ধ হয়ে দেখছে। চাঁদ দেখছে। তার ঋজু হালকা শরীর। দীর্ঘ শরীর। বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এই শরীর দীর্ঘ-দীর্ঘ-দীর্ঘতর হয়ে আকাশের গায়ে প্রায় চাঁদ ছুঁই-ছুঁই। জ্যোৎস্নার আভায় কী অপরূপ সে। কী অসামান্য সুন্দর হয়ে ওঠা।

এই দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিল চন্দ্রাবলী একা। পরে বহুবার সে এই প্রায় অলৌকিক সৌন্দর্যের স্মৃতিচারণ করেছিল। তার বর্ণনা থেকে এমনকী শুভদীপ নিজেও প্রত্যক্ষ করেছিল নিজস্ব অলৌকিক সুন্দর

রূপারোপ। মোটা বেঁটে, গোল, কালো চন্দ্রাবলীর হলুদ সালোয়ার কামিজে জ্যোৎস্না লেগে তখন মায়াবী রং। দোপাট্টা উড়ছে হাওয়ায়। আর চাঁদের গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা আলো পড়ে শুভদীপের চশমার কাচ, সাধারণ পরকলাদ্বয়, কীরকম স্বপ্নিল হয়ে যাচ্ছে তার প্রতি মৌহূর্তিক বর্ণনা জানতে পারছে সে-ই। আর তার গলা থেকে বেরিয়ে আসছে সুর। শুধু সুর। সেই সুরের ভিতর কোনও ভাষা নেই। কোনও বাণী নেই। ধ্বনি নেই কোনও। এক শব্দতরঙ্গ সম্বল। সেই তরঙ্গ আশ্রয় করে সুর ভেসে যাচ্ছে জলে। মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। শুভদীপ দেখছে। শুনছে। ভাবছে। রবিদার বাড়িতে বার কয়েক গিয়েছে সে। চন্দ্রাবলীকে দেখেনি। চন্দ্রাবলী একটি গানের স্কুল চালায়। আর চন্দ্রাবলী চোখ বন্ধ করে সুর তুলছে এমন—তার দু'গালে সরু জলের ধারা। হাওয়া সেই সুর বয়ে নিয়ে চলেছে নৌকায় আর নৌকা পেরিয়ে অসীমে। ওই হাওয়া, ওই নদীর জোয়ার, জলে ছলাৎছল, ওই জ্যোৎস্নায় চাঁদ আর ছলাৎছলে মিশে যাওয়া চাঁদের প্রতিবিম্ব, ওই সুর আর কালো মাংসল গালে লেগে থাকা নোনাজল—সব মিলে শুভদীপের হাত প্রসারিত করে দেয় আর সে স্থাপন করে, আলতো স্থাপন করে চন্দ্রাবলীর মাথায়। স্পষ্ট টের পায়—চন্দ্রাবলী কাঁপল। কেঁপে উঠল। বন্ধ করল গান। জানাল, এ চন্দ্রকোশ। মালকোশের খুব কাছাকাছি চন্দ্রকোশ। কিন্তু নরম। বড় নরম। শুনতে থাকলে, গাইতে থাকলে কান্না পেয়ে যায়।

আজ, এই কবরস্থানে, দিঘির এই শীতার্ত পারে, শুভদীপ সেই চন্দ্রকোশের সুরকে স্পর্শ করল স্পষ্ট।

কেন-না, জ্যোৎস্না নেমে এসেছে জলে। আর লেগেছে হাওয়া। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় আলোর চিকচিক। সে ছটফট করছে। মুঠোয় ধরছে চন্দ্রাবলীর স্তন। বড় ভারী স্তন। মেদবহুল পেটের মধ্যে হাঁটু চেপে রাখছে। এখন, এই প্রক্রিয়ার আগে তার শীত চলে যাচ্ছে। এক কামভাবে কানের লতিতে আগুন। সে তার শিশ্ন সম্পর্কে অতি বিচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলেন। মনে করিয়ে দিলেন, সন্ধে পেরিয়ে গেছে, এবার যেতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল তখন। তিনি

কোনও প্রশ্ন করলেন না। অন্ধকারে কবরগুলি অসংখ্য ছোট ছোট স্তূপ। গাছপালা ভেদ করে জ্যোৎস্না নামেনি। পৌঁছয়নি আলো। সে হেঁটে চলল বৃদ্ধের পেছন পেছন। এবং টের পেল, সেই আশ্চর্য গন্ধ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবার। মনে পড়ল তার। মৃত্যুকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে এতক্ষণ অনর্থক ভেবে গিয়েছে সে। এর জন্য চন্দ্রাবলীকেই সে দায়ী করে বসে মনে মনে এবং ঘৃণা ওগরায়।

কবরস্থানের গেট পেরিয়ে বাইরে আসতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার। আধুনিক আলোক প্রক্ষেপণ কৌশলে বিজ্ঞাপনের মেয়েটি এখন অনেক বেশি আবেদনপূর্ণ। প্রায় ত্রিমাত্রিক হয়ে উঠেছে তার অবয়ব। সে মেয়েটির চোখ দেখে। বুকের খাঁজ। উরুর মসৃণতা দেখে আর ঠোঁটের আকর্ষণ। তার মেয়েটিকে ছুঁতে ইচ্ছা করে আর সেই মেয়ে বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে নেমে তার গা ঘেঁষে চলে যায়। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় ঘাড় ফেরানো চাউনির মধ্যে আকর্ষণ। সে আকর্ষণ অনুসরণ করে এবং বুঝে পায় না বিজ্ঞাপনের মেয়েটি ছোট পোশাক খুলে সালোয়ার-কামিজ পরে নিল কখন। ছোট চুলে কখন বসিয়ে নিল সুদীর্ঘ বিনুনি। সাদা ত্বক কোন জাদুবলে হয়ে গেল মাজা-মাজা। শুধু আবেদন এক। দৃষ্টি ও দেহের আবেদন সদৃশ। সে মৃত্যুর সংকল্প বিস্মৃত হয় তখন। কবর বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় সমাহিত বৃদ্ধকে আর অদ্ভুত ঘ্রাণ। সে ছেঁড়া জুতো বিস্মৃত হয়। এমনকী চন্দ্রাবলী সম্পর্কে ঘৃণাও টের পায় না। এক আগুনের বৃত্ত তাকে ঘিরে ফেলে ক্রমশ এবং পোশাক ও ত্বক অবিকৃত রেখে শরীরে ঢুকে যায়। আর মেয়েটি কবরখানা থেকে অল্প দূরে একটি বাতিস্তম্ভের নীচে দাঁড়িয়ে অনুচ্চে কথা বলে। জানায়, পাঁচশো। জানতে চায়, হতে পারে কিনা।

শুভদীপ থমকে দাঁড়ায়। শীত-পরাস্ত কপালে বড়-বড় স্বেদবিন্দু জমে। আঠাশ বছর বয়সে এই প্রথম সে কোনও শরীর বিকিকিনির মুখোমুখি। কানের লতি থেকে ফুলকি ঝরে তার। আর দাহ্য শরীরকে তৎক্ষণাৎ আগুন বেষ্টন করে। হাড় জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে যায়। ত্বক ভেদ করে ফুটে বেরোয় লালচে গনগনে আঁচ। গলা অবধি শুকনো। স্বর

ফোটে না যথাযথ। আড়ষ্ট জিভে বাক্য উচ্চারিত হয় না যথাযথ। তবু সে সেই আধফোটা খসখসে স্বর দ্বারা জানায়— তিনশো। তিনশোই সে দিতে পারে সর্বোচ্চ দাম। বিজ্ঞাপনের মেয়ে নিজেকে বার কয়েক নিলাম করে। অতঃপর তিনশোতেই রাজি হয়ে যায়। শুভদীপকে সঙ্গে আসতে বলে। শুভদীপ সঙ্গে-সঙ্গে যায়। সম্মোহিত। অথবা স্বপ্নোত্থিত। কিংবা আবেশদীর্ণ। মেয়েটি শরীরে শরীর ঘষটে চলে। বুক ছুঁইয়ে দেয় গায়ে। একসময় জানায়, শুভদীপ মদ খেতে চাইলে তিনশোয় হবে না। আরও পঞ্চাশ লাগবে। সে মদ খাবার অনিচ্ছে জানিয়ে হিসেব করে এবং আশ্চর্য হয়ে যায়। সে মেয়েটিকে দর বলতে প্রস্তুত ছিল না। অথচ প্রস্তুতি ছাড়াই সে বলে ফেলল সঠিক। তার কাছে সাড়ে তিনশো টাকাই আছে। দু'শো বিজ্ঞাপনের বকেয়া সংগ্রহ। একশো মা দিয়েছিল বাবার জন্য কিছু ওষুধ কিনতে। পঞ্চাশ তার পথ খরচ। ঘুরে-ঘুরে কাজ করে বলে তার সংস্থা তাকে দৈনিক ত্রিশ টাকা পথখরচ দেয়। সে হেঁটে মেরে দেয় দীর্ঘ পথ আর পয়সা বাঁচায়। বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তার কাছে এখন কুড়ি টাকা বাড়তি।

তার বাবার এই ওষুধ তাদের এলাকায় পাওয়া যায়নি। দু'দিন এমনিতেই কেটে গেছে তাই। সে ভেবেছিল একশো টাকার সঙ্গে বাড়তি কুড়ি টাকা যোগ করে মোট ছ'টি ওষুধ কিনে নিয়ে যাবে। কারণ এক-একটি ট্যাবলেটের দাম আঠারো টাকা উনিশ পয়সা।

হবে না। ওষুধ কেনা হবে না আজ। সে মনে-মনে কথা সাজায়। একশো টাকার হিসেব তৈরি করে নিতে চায়। মাকে বলতে হবে। যদিও, যত যুক্তিসঙ্গতই হোক, মা গ্রাহ্য করবে না। অভিযোগ করবে। অভিযোগ, অভিযোগ, অভিযোগ।

মেয়েটি আলো-আঁধারি পেরিয়ে যাচ্ছে। সেও যাচ্ছে। আর পেরিয়ে যেতে যেতে জেনে যাচ্ছে মেয়েটির নাম মালবিকা।

মালবিকা? সে চমকে উঠছে। তার জীবনের প্রথম নারীর নাম মালবিকা। মালবিকা সিনহা। সে ডাকত মালবিকাদি। কারণ সে ছিল অন্তত বারো বছরের বড়। অপার সৌন্দর্যের ওপর মেদের প্রলেপ

পড়ছিল তার তখন। অল্প পরিচিতি ছিল আগে। স্কাউটের সমাবেশে সেই পরিচয়ে গাঢ়ত্ব জমে। এবং একদিন মধ্যরাতে তাঁবু থেকে তাকে ডেকে নেয় মালবিকাদি। এবং তাঁবুগুলির পেছন দিকে, অল্প দূরে, একটি পাইনাসের তলায় তার ঠোঁট পুড়িয়ে দেয়।

সেদিন সে শরীরের স্বাদ জেনেছিল প্রথম। ভরাট স্তনের ওপর হাত রাখার অসম্ভব উত্তেজ সে অনুভব করেছিল প্রথম। মালবিকাদি ঘাসের ওপর শুয়ে, অভিজ্ঞ হাতে তাকে শরীরে নিয়েছিল। একুশ বছর বয়স তখন তার। সে তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, উন্মাদনায়, উত্তেজনা ও উদ্বেগে, প্রথম নারীভেদের পুলকে ও সীমাহীন অনভিজ্ঞতায় ঘটিয়ে যাচ্ছিল সংঘর্ষ। সে টের পাচ্ছিল, ঘাস ও মাটির ঘর্ষণে তার হাঁটু ছড়ে যাচ্ছে। দুই হাঁটু ছড়ে যাচ্ছে। আর মালবিকাদি তার ক্রিয়াদির মূল্যায়ন করে যাচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না শুভদীপ এই প্রথমবার। এই প্রথম তার নারীগমন। সে নিরন্তর সেই অবিশ্বাস প্রকাশ করছে আর ধ্বনি তুলছে আরও-আরও দীর্ঘসময় এই প্রক্রিয়া চলুক তার আবেদনে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু পরের রাত্রে আবার জেগে উঠেছিল আহ্বানের প্রত্যাশায়। প্রথম বিদীর্ণ করার কারণে তার ব্যথা শিশ্নশীর্ষে জমেছিল। এমনকী মূত্রত্যাগ করার সময় জ্বালা। সুখমিশ্রিত সেই ব্যথাবেদনাকে, জ্বালাপোড়াকে সে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখেছিল বারবার।

মোট দশদিনের সমাবেশে সে মালাবিকাদির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তিনরাত্রি। এবং তাকেই নির্বাচন করার জন্য অসহ পুলকে ও গর্বে সে আপ্লুত ছিল সারাক্ষণ।

সমাবেশ থেকে ফিরে আসার পর এমনই এক প্রাক শীতের বিকেলে শ্যামলিম তাকে একটি গল্প শোনায়। মধ্যরাতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে অভিসারের গল্প। আর সেই গল্প শোনাতে শোনাতে শ্যামলিমের মুখ গনগনে হয়ে যায়। কানে আগুন ধরে। চোখ থেকে হীরকদ্যুতি ছিটকোয়। জিভ হয়ে যায় আদ্যন্ত লালাসিক্ত। আর সেই সিক্ত জিভ অবিকৃত বর্ণনা দেয় যে শরীরের— তার নাম মালাবিকাদি।

কথা বলতে বলতে শ্যামলিম একসময় মোট চার রাত্রি অভিসারের স্মৃতিবন্ধে ডুবে যায়। সে এই ডুবে যাওয়া বোঝে। বুঝতে পারে। কারণ শ্যামলিমও তারই মতো একুশ। তারই মতো প্রথম। কৌমার্যের ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা পুরুষছানা। কিন্তু সে নিজের তরফ থেকে একটি বর্ণও শ্যামলিমকে বলে না। বলতে পারে না। শ্যামলিম আহত হবে বলে নয়। সে প্রকৃতপক্ষে গোপন করতে চায় আপন রক্তক্ষরণ। চোখে জল এসে গিয়েছিল তার। প্রথম প্রতিক্রিয়ায়। যেন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। যেন কথা রাখেনি মালবিকাদি তার।

এরপর প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরে তার গা রি-রি করে। রাগে। অপমানে। কিছু-বা ঈর্ষায়। কারণ শ্যামলিম গিয়েছিল চারদিন। সে তিনদিন। নির্বাচিত হওয়ার শ্লাঘা থেকে চ্যুত হয়েছিল সে। এবং ছটফট করতে করতে পরদিন ছুটে গিয়েছিল মালবিকাদির ইস্কুলে।

মালবিকাদি বিরক্ত। অপ্রস্তুত। তাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। শুভদীপের চোখে পড়েছিল, সমাবেশে থাকাকালীন ছিল না, কিন্তু এখন মালবিকাদির সরু সিঁথি বরাবর সিঁদুর আঁকা। তার হঠাৎ চোখে জল এসে যায়। সে তেমনই অকস্মাৎ মালবিকাদির হাত ধরে স্থান-কাল বিবেচনা না করেই এবং শ্যামলিম প্রসঙ্গ টেনে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকার কৈফিয়ত চায়।

মালবিকাদিকে তখন দেখাচ্ছিল ক্রুদ্ধ ও বিপন্ন। একটানে হাত হিঁচড়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিল সে। হিসহিস স্বরে তাকে বদমায়েশি করার চেষ্টা করতে বারণ করেছিল। তারপর স্থির তাকিয়েছিল তার দিকে। মুখের রেখায় বা দৃষ্টিতে একবিন্দু প্রশ্রয় ছিল না। বরং তার কাঠিন্যের অভিব্যক্তিতে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল শুভদীপ। আর মালবিকাদি কেটে কেটে তার বক্তব্য পেশ করছিল। বুঝিয়ে দিচ্ছিল, পারস্পরিক সম্মতিতে রচিত কিছু উপভোগ্যতা ছাড়া এই সংযোগের কোথাও কোনও প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, প্রতিশ্রুতি বা দায়বদ্ধতা ছিল না। তারা কেউ কারওকে কোনও কথা দেয়নি। ওই তেরাত্রির ঘনিষ্ঠতার মধ্যে, কামাদির মধ্যে কোনও বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ন্যায়-অন্যায় ছিল না। এমনকী শুভদীপ নিজেও কোনও মেয়ের সঙ্গে

ব্যাপৃত হলে মালবিকাদির কিছু যেত আসত না। এতটুকু বিচলিত হত না সে। এইসব সম্পর্ক যেখানে শুরু হয়, সেখানেই শেষ হয়ে আসে। সাময়িক জীবনের সাময়িকতার লীলাখেলা। খুচরো পয়সার মতো। ছোটখাটো ক্রয়ে মাত্র কাজে লাগে। কিংবা প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন ইত্যাদির বাইরে পাঁচ টাকার ফুচকা খাবার মতো। পুষ্টির পরোয়া নেই। শুধু স্বাদ।

সম্পর্ক মানেই এক বিশ্বাস ও দীর্ঘস্থায়ী ন্যায়পরায়ণতা— এমনই বোধ ছিল শুভদীপের। কেউ কারওকে শরীরীভাবে আহ্বান করেছে মানে সে মানসিক অভিষেক ঘটিয়ে দিয়েছে। যে আহ্বান করেছে তার মনের মধ্যে, যাকে আহ্বান করা হয়েছে তার আসন অবিচলিত। এমতো ধারণা ও বিশ্বাস সমূহে তাড়িত সে ন্যায়বান হয়ে উঠতে চেয়েছিল তর্ক দ্বারা। মালবিকাদি তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। সে তখন প্রভূত আবেগে, প্রভূত বেদনাবোধ ও অপমানে সরাসরি কেঁদে ফেলে রাস্তায়। চোখ থেকে নেমে আসা জল কান্নার দমকসহ মুছে নেয় হাতের উল্টোপিঠে। এবং ধাক্কা সামলাতে সামলাতে রাস্তা পার হয়।

প্রাথমিক ভাবে তার মনে হয়েছিল, এই আঘাত মৃত্যুর মতো। সাময়িকতার এই কষায় স্বাদ ক্ষণিক উপভোগ্যতার সঙ্গে মিশে বিশ্রী ও কটু হয়ে উঠেছিল। সব মিলে, সত্যি, মরে যাচ্ছে এমন যন্ত্রণা। তার সেই মুহূর্তে অভিলাষ ছিল, ইস্কুলের সামনেই, পথ পেরুতে সে গাড়িচাপা পড়ুক আর তার দলাপাকানো বা ছিন্নভিন্ন মাংসাদি দেখে সারাজীবন অনুশোচনায় দগ্ধে মরুক মালবিকাদি।

কিন্তু বাস্তবিক সে গাড়িঘোড়া দেখে, সামলে, অত্যন্ত সাবধানেই রাস্তা পার হয় এবং নিজেকে অক্ষত আবিষ্কার করে।

সে চলে আসবার আগে শুনতে পেয়েছিল, মালবিকাদি তাকে সব ভুলে মন দিয়ে পড়াশুনো করার উপদেশ দিচ্ছে। মনে মনে সে 'খানকি' কথাটি উচ্চারণ করেছিল তখন এবং সাময়িকতার এই দাহে বহুদিন তাড়িত হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষের শেষ পরীক্ষায় তার ফল খারাপ হয়। কিন্তু শ্যামলিম বিপদাপন্নতার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় ঠিক।

মালবিকাদিকে তার মনে হয়েছিল প্রতারক। এই প্রতারণা যখন সে নিজেই অভ্যাস করে তখনও এমনকী মালবিকাদিকে সে ক্ষমা করেনি। এবং আর কখনও যায়নি সে মালবিকাদির কাছে। কিন্তু কোনও কোনও রাত্রে মালবিকাদিকে সে রমণ করেছে দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় ধরে। শরীর জাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া নারীকে সে প্রায় ধর্ষণ করেছে এবং নিজেকে মুক্ত করেছে একাকী। ঠিক যেমন এখন সে চন্দ্রাবলীকে ভাবে আর বিধ্বস্ত হয়। বিধ্বস্ত হয় আর ছটফট করে। ছটফট করে আর...। না। এই মুহূর্তে চন্দ্রাবলীকে ভাবতে চায় না সে। বরং মালবিকাকে অনুগমন করে।

মালবিকা। মালবিকার পর মালবিকা। আজকের মালবিকার পর আরও কোনও মালবিকা আসবে কি তার জীবনে? সে জানে না। প্রথম মালবিকার সঙ্গে সে গহ্বরে নেমেছিল। আজ অতলে যাবে। সেই অতলকে সে এখন দারুণ ভাবে কামনা করছে। আলো-ছায়া পেরিয়ে, যানবাহন টপকে, সে মালবিকার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছচ্ছে এক সরু গলির ভেতরকার পুরনো বাড়ির একতলায়। এ-বাড়ির অবস্থা তাদের বাড়ির চেয়েও খারাপ। পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। ইটের গায়েও লেগে গিয়েছে ক্ষয়। জানালা কব্জা থেকে ছুটে কাত হয়ে আছে। ভারী কাঠের ভার আর বইতে পারছে না পুরনো লোহার জং-ধরা টুকরো।

প্রবেশপথে টিমটিমে বাতি। দরজায় জানালার মতোই ভারী কাঠের পুরনো পাল্লা। সেই দরজার আবেদন এত গম্ভীর যেন ভীমপ্রতিজ্ঞায় প্রবেশ ও প্রস্থান সম্পর্কে রক্ষণশীল।

মালবিকা দরজায় আলতো টোকা মারে আর দরজা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দ্রুত পায়ে চলে যায়। শুভদীপ দেখতে পায় কেবল এক অপস্রিয়মাণ প্রলম্বিত ছায়া। সে থমকে দাঁড়ায়। মালবিকা তার হাত ধরে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বন্ধ করে দেয় দরজা। বাতি জ্বালে এবং শুভদীপ কিছু বোঝার আগেই এক টানে কামিজ অপসারিত করে। শুভদীপের দু'হাতে নিজেকে জড়িয়ে পিঠের দিকে নিতে নিতে অন্তর্বাস খুলে দেবার তাগিদ

দেয়। শুভদীপের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কোনওক্রমে কেবল বলতে পারে, তার জল চাই। সবার আগে এক গেলাস বিশুদ্ধ পানীয় জল।

টেবিলে জলভর্তি প্লাস্টিকের বোতল রাখা ছিল। বাঁ হাতে এগিয়ে দেয় মালবিকা। ডান হাত পেতে দেয় প্রাপ্য অর্থের জন্য।

৩

এই বয়সের পুরুষ যত জন আসে, বেশির ভাগেরই তেমন অভিজ্ঞতা থাকে না দেখেছে সে। তারা আসে, দরজা বন্ধ হতেই খুলে ফেলে পোশাক। আর তাড়াহুড়ো করে সঙ্গমে পৌঁছে যায়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে জানে না আনন্দ, জানে না উপভোগ। শুধু ভোগ জানে। যেহেতু অর্থের বিনিময়ে আসে সেহেতু অজ্ঞতার সঙ্গে লিপ্সা মিশে এক ধরনের ক্ষুধা মেটাবার জান্তবতাই শুধু প্রকাশ পায়। যতখানি পারে, মাংস ঘাঁটা শুধু।

যখন তার সঙ্গে মধ্যবয়সি নয়, বৃদ্ধ নয়, শুধু কোনও যুবকের দেওয়া-নেওয়া হয়, তখন সে সুখ প্রার্থনা করে। কামনা করে উপভোগ্যতা। পেশাদারিত্বের বাধ্যতামূলক দেহদানের যন্ত্রণার বাইরে শৈল্পিক কামকলার আনন্দ পেতে ইচ্ছে করে তার।

কাম বহু ব্যবহারে ক্লিষ্ট হলে পাঁকের মতো উঠে আসে যন্ত্রণা কেবল। বাচ্চুদি বলে, দশ বছর এরকম চললে সে আর আনন্দ প্রার্থনা করবে না। সে তখন সঙ্গম করতে করতে হয়তো-বা এক গামলা বমি করবে মনে মনে। কিংবা চিতাকাঠ কল্পনা করে ভুলে যেতে চেষ্টা করবে পুরুষটির দুর্গন্ধ শ্বাসবায়ু। অথবা হিসেব করবে, দিনে আর কতজনকে টানতে পারলে বছরের শেষে একখানি বাতানুকূল যন্ত্র লাগিয়ে ফেলা যায়।

সম্ভব। এমনই হওয়া সম্ভব। বাচ্চুদির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। সুখের কাঙাল বাচ্চুদিও হয়তো ছিল তার মতো বয়সে।

মাঝে মাঝে কল্পনা করে সে। এক রাজপুত্র এসে যাবে একদিন

আর তার প্রেমে মুগ্ধ হবে। কোলে মাথা রেখে সারা জীবনের কাহিনী শুনতে চাইবে তার। সে চোখের জলে ঠোঁট নোনতা করে বলবে সমস্ত কথা। বলবে মায়ের পঙ্গুত্ব। বাবার মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়া। ভাইয়ের অসহায় শৈশব। বলবে, অর্থের প্রয়োজনের কথা বলতে কলেজের এক বান্ধবী কীভাবে তাকে স্তোক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মধুচক্রে।

হ্যাঁ, সে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করেছিল। মানাতে পারেনি সেখানে। টাকা পেয়েছিল অনেক। কিন্তু শরীরে লেগে থাকা ক্লেদ মুছে ফেলতে পারেনি। সারাক্ষণ গায়ে ঘৃণা গিশগিশ করত।

তাদের অভাবের সংসারে একের পর এক অমঙ্গল আছড়ে পড়ছে যখন, আত্মীয়রা গুটিয়ে যায় যে-যার নিজস্ব খোলে। তখনও ন্যায় ছিল অন্তরে। নীতি ছিল। মধুচক্রের অর্থে অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকা সংসার মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে ফের বাঁচার আকুলতায়। ন্যায়-নীতির ঊর্ধ্বে, নিজের ভালমন্দ লাগার ঊর্ধ্বে তখন তার মায়া হয়। নিজের চেয়ে অনেক বেশি বাবা-মা-ভাইয়ের জন্য। তাদের পুরনো পর্দাগুলো যখন দুপুরের নির্জনতায় দুলত, পুরনো পাখার বড় বড় ডানা মিষ্টি হাওয়ায় ঘুম এনে দিত সবার চোখে— কারণ আহারের দৈন্য অন্তত মিটে গিয়েছিল বলে ভরা পেট— তখন এই ঘুম, এই পর্দা-নড়া, এই পাখার সঙ্গে দুপুরের গাঢ় সম্পর্ক ইত্যাদির প্রতি মায়াবশে মধুচক্র ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নিয়েও সে কাটিয়ে দেয় দু'বছর।

ততদিনে চিনেছে অনেক। দেখেছে প্রচুর। পড়ায় মন লাগে না। অর্থের টান লোভী করে, আবার লোভের জন্য নিজেকে বড় ক্ষুদ্র, বড়ই বিপন্ন মনে হয় যখন সারা শরীরে বিবিধ দাগ ধরিয়ে সে ফিরে আসে ঘরে আর এক । হয়। তার খারাপ লাগে। বিস্ময় লাগে। সে প্রত্যহ ভাবে এইবার বন্ধ করে দেবে সব আর হয়ে উঠবে ঠিক আগেকার মতো। ভাবে আর ভাবেই শুধু। পারে না। নিজেকে দেখে ক্রমাগত আর অন্যদেরও দেখে। যারা আসে, তাদের সকলেরই অভাব নেই তার মতো। কিন্তু অভাব তাদের মনে। তাদের আরও-চাই মিটবে না কোনও দিন। মেটাবে না জগতের লোভের উৎসার।

বাড়ির বউ আসত। কলেজ পড়ুয়া মেয়ে আসত। পুরুষ আসত যারা—সব ধনবান, প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাশালী। তবু, ক্ষমতার পাশ দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো সরু হয়ে লেগে থাকে অক্ষমতা। একদিন তাকে চিহ্নিত করে ফেলে আরও আরও ক্ষমতার হাত। আর ধাবমান হয়। অক্ষমতার সরু ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে ন্যায়দণ্ড। আর, অন্য অনেকের সঙ্গে সে-ও ধরা পড়ে যায়।

এইসব কাহিনী তার। বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে যাবে। সেই মানুষটা সারা রাত জেগে জেগে শুনবে তার কথা। তারপর তাকে বুকে টেনে নেবে। তার কষ্টে কষ্ট পেয়ে শূন্যতা ঢেকে দেবে পলাশে-গোলাপে। ঘর-বর পাবে সে। সিঁদুরে সীমন্তিনী হবে। লালরঙের বেনারসি পরবে। একদিনও পিল খাবে না তখন। সন্তানের জন্ম দেবে।

তার একটি খাতা আছে। সমস্ত পুরুষ—যারা তার দেহ ক্রয় করে, সে লিখে রাখে নাম। শুধু নাম। কেন রাখে, জানে না সে। সংসারের যে স্বপ্ন তার—পেয়ে গেলে সেইসব, সে এই খাতা ছিঁড়ে ফেলে দেবে। ইতু, মঙ্গলচণ্ডী, সন্তোষী ব্রতর মতো নামব্রত তার। আর এইভাবে তার জমে গেছে একান্ন জন অমল, তিয়াত্তরজন দীপক। দশজন হরিবাবু। এই দশজনের মধ্যে আছে হরিপদ, হরিমাধব, হরিসাধন, হরিপ্রসাদ, হরিশঙ্কর, হরিবিষ্ণু, হরিবন্ধু... ইত্যাদি সব নাম। দু'জন কালীকিঙ্কর আছে, একজন মাত্র আছে সুবলসখা। এবং আরও আছে। আরও। সে মাঝে মাঝে সংগোপনে এই নামাবলির পাতা ওল্টায় আর ভাবে—আরও কত নাম হবে? কত নাম? থামবে না? কোনও দিন থামবে না?

অতি সংগোপনে সে রেখে দিয়েছিল আরও কয়েকটি জিনিস। একটি কলম। কলেজের বই আর খাতা। পাতার মধ্যে অধ্যাপকদের বক্তব্য তুলে রাখা। উই সেগুলি ধ্বংস করেছে।

যদিও এখন আর সে কাঁদে না তেমন। ইচ্ছে করলেও মনে হয় কান্না তাকে ছেড়ে গিয়েছে কবেই। যেমন আত্মীয়-পরিজন, ছোটবেলার প্রিয় মামা-মামি, মিষ্টিকাকু আর ইতিকাকি, যেমন একই

বাড়িতে থাকা এবং তারই অন্নে প্রতিপালিত হওয়া ভাই! ছেড়ে গেছে। সকলেই ছেড়ে গেছে তাকে। সংক্রামক ব্যাধি লাগা ছোট গ্রামটির মতো। ছেড়ে গেছে এমনকী বাবা-মাও। সে যদি চলে যেত অন্য কোথাও, ধরা যাক নামকরা বেশ্যাপাড়ায়, আর ঘরভাড়া নিত, মাসে-মাসে টাকা পাঠাত শুধু—তবে বেঁচে যেত বাবা-মা। বেঁচে যেত ভাই। অন্তত লোককে তো বলা যেত—অসভ্য মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেউ কারও নয়। এ-জগতে শেষ পর্যন্ত কেউ কারও নয়। স্বার্থে টান পড়লে নাড়ির বন্ধনও খুলতে খুলতে ন্যাড়া। কিন্তু যাবে না সে। বেশ্যাপাড়ায় যাবে না। বুক খুলে সারি সারি দাঁড়াবে না গোরু-ভেড়া-ছাগলের মতো। হ্যাঁ, সে নিজেকে বিকোয়। বিকোয় অপারগ হয়ে। নিরুপায় হয়ে। বিকোয় কেন-না সে যদি মনোহারী দোকানের কর্মচারী হত—এমন একটি কাজ সে পেয়েছিল সঙ্কটের কালে—তবে যা মাইনে পেত তাই দিয়ে সংসারের ভরণ, পোষণ, পুষ্টি, ওষুধের দাম তো দূরের ব্যাপার, সারা মাসে শুধু আলু আর চালও জুটত না।

জুটিয়েছে সে। নিজেকে মেরে, পুড়িয়ে, ভেঙে বাঁচিয়েছে বাবা-মা-ভাই। বাঁচিয়েছে। ওরা তার নিজেরই তো। সে তো চায় বাবা সুস্থ হোক, মা সুস্থ হোক, ভাই গড়ে তুলুক জীবনকে সুন্দর। তার তো অধিকার আছে চাইবার। অধিকার আছে এই ভাঙাচোরা বাড়িটাতে থাকবার। তার জন্মগত অধিকার। কিন্তু সে জানে, জন্মগত অধিকারের মূল ছিন্ন করে দিতে পারে পরিবেশ পরিস্থিতির দুর্মর শক্তি। সে জানে। তাই দাঁতে দাঁত চেপে থেকে যেতে চায়। অর্থ অশুচি হয় না। দেহব্যবসায়ের জন্য সে ঘৃণ্য কিন্তু অর্থ নয়। এ বাড়িতে ব্যবসা করলে তার দেহমন্দির পরিত্যাজ্য, গৃহমন্দির অপবিত্র কিন্তু টাকাপয়সা গঙ্গাবারি।

তিক্ত লালায় ভরে যায় তার মুখ। রাগ-রোষ-দুঃখ আর হতাশায় স্পৃষ্ট হয়ে সে নিজের হাতে হাত বোলায়। ভালবাসে সে। এই হাত, এই বুক, এই শরীরের প্রত্যেকটি কোণ সে ভালবাসে। প্রত্যেকটি

প্রান্ত। যেমন সে ভালবাসে বাড়ি। এই ভাঙাচোরা বাড়ি। ভালবাসে ভাই। ভালবাসে বাবা-মা। ভালবাসে।

কোনও কোনও মধ্যযামে সে এপাশ করে, ওপাশ করে আর ভাবে— ভালবাসা। এখনও গেল না তার। এখনও তা লটকে রইল স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে। ভালবাসা শেষ হলে, ফুরিয়ে গেলেই, সে তখন একটু একটু করে খুলে খুলে ফেলে দেবে হাড় রক্ত অস্থি মজ্জা মাংস।

ভালবাসা। এই ছেলেটির মধ্যে কোথাও সংগোপনে রাখা আছে ভালবাসা, বুঝেছে সে। প্রাথমিক জড়তার পর সে যখন ধীরে ধীরে শরীরে আসছিল, তখন, যেভাবে চুম্বন করছিল গালে ও কপালে, বন্ধ করে চোখ, যেভাবে আলতো হাত বুলিয়েছিল নাভিতে আর গহন অরণ্যময় গিরিখাত গভীরতায়, যেভাবে ঠোঁটের নরম দ্বারা চেপেছিল স্তনবৃন্ত— তাতে— তার বার বার মনে হয়েছিল, এক শরীরে শুয়ে অন্য কোনও শরীরকে সে মনে মনে ডাকছে।

তার ভাল লাগছিল খুব। আবেশ। গভীর আবেশ। ছেলেটি তার আঙুলের পরিচালনে এই বহুজনে অভ্যস্ত শরীরকে দিয়েছিল অপূর্ব তরঙ্গরেখা। সে চুরি করে ভালবাসা নিচ্ছিল তখন। রাহাজানি করছিল। সে জানে, চূড়ান্ত খরিদ্দার, বেশ্যার শরীরে ভালবাসা আঁকে না কখনও। তারা উচ্ছল সুখ আঁকে, বিষণ্ণ আঁচড় আঁকে, যন্ত্রণার কামড় এঁকে দাগ করে দেয়। কিন্তু ভালবাসা আঁকে না ভুলেও। এই ছেলেটি আঁকছিল কেবল। কারণ, সে অনুমান করে, চোখ বন্ধ করতেই ছেলেটি বিস্মৃত হয়েছে এই ঘর, এই দেহ— তার নয়ন জুড়ে তখন অন্য কোনও অববাহিকা নিশ্চিতই।

নারীদেহে অভ্যস্ত ছেলেটি। বুঝেছিল সে। ভাবছিল, এ-ই কি হতে পারে, তার স্বপ্নের কুমার?

না। পারে না কখনও। চাইলেও সে নিজেই গররাজি হবে। কারণ ছেলেটি অর্থবান নয়। পাঁচশো টাকার জন্য যে দামাদামি করে সে কিছুতে অর্থবান নয়। আর সে চায় অর্থবান স্বামী। না হলে, সে জানে,

বাচ্চুদির মতো, বিয়ের পরেও তাকে নামতে হতে পারে আবার ব্যবসায়।

আবার ব্যবসা। মানে আবার বিবিধ যন্ত্রণা, উপদ্রব, ঘৃণা ও আশঙ্কা। চায় না সে। চায় না আর। এমনকী কারও রক্ষিতা হয়ে থাকতেও চায় না। চট করে, বেশি অর্থের লোভে বাইরেও যেতে চায় না। চেনাজানাদের চেয়ে তাই তার টাকা কম। বেশি রোজগার করতে চাইলে অত ভয় থাকলে চলে না এ কথা বাচ্চুদি তাকে বহুবার বুঝিয়েছে। কিন্তু নিরঞ্জন জানা তাকে আজও আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে আছে।

দিঘা নিয়ে গিয়েছিল তাকে। নিরঞ্জন। নিরঞ্জন জানা। পাঁচ হাজারের চুক্তি। চার দিন তিন রাত্রি থাকা। মা তখন সদ্য এসেছে হাসপাতাল ফেরত। হাঁ-মুখ সংসারে টাকার গভীর আর্তি। পাঁচ হাজার টাকা তার লেগেছিল অপূর্ব আশীর্বাদ। সে গিয়েছিল সহজেই আর ফিরেছিল একরাশ যন্ত্রণা ও সংক্রমণ নিয়ে।

কোনও মানুষের যে এতখানি খিদে থাকতে পারে— সে জানত না। সে দিনে সাতবারের খিদে অবধি দেখেছে। কিন্তু এইরকম, সারা দিনমান নিম্নাঙ্গসেবী মানুষ আর দেখেনি। আহার ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াদির সময় বাদ দিলে বাকি সারাক্ষণ নিরঞ্জন জানা তার মোটা ও দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ দিয়ে তাকে আঘাত করত। এমনকী পুরুষাঙ্গও নমিত হয়ে যেত একসময়। ক্লান্ত হয়ে যেত। কিন্তু নিরঞ্জনের ক্লান্তি নেই। সে তখন বার করত গাজর, মুলো, পটল, বেগুন এবং মোমবাতি। পর্যায়ক্রমে যোনিপথে প্রবেশ করাত সেইসব। বিমুখ যোনি হয়ে যেত শুকনো খটখটে। দারুণ যন্ত্রণা হত। সে আপত্তি করেছিল। হাত পা ছুড়েছিল। নিরঞ্জন জানা তখন তার পা দুটি খাটের সঙ্গে বেঁধে ফেলে এবং প্রহারে ভরিয়ে দেয় গাল। শেষ দিন সে যন্ত্রণায় কঁকিয়েছিল সারাক্ষণ। কেঁদে ফেলছিল মাঝে মাঝে। নিরঞ্জন জানার দয়া হয়নি। প্রাপ্য বুঝে নিয়েছিল।

সাত দিন ঠিকমতো হাঁটতে পারেনি সে। বাচ্চুদির কাছে গিয়ে আকুল কেঁদেছিল।

শরীরের লোভেই আসে, অথচ শরীরকে এতটুকু যত্ন করে না, সম্মান দেয় না, ভালবাসে না তারা। বুঝিয়েছিল বাচ্চুদি। পৃথিবীতে শরীরই একমাত্র— যাকে অর্থব্যয় করে অবহেলা ও অপমান করা হয়।

বাচ্চুদিই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যে পাঁচ হাজার টাকা সে আয় করেছিল তার থেকে এক হাজার টাকা তার নিজেরই চিকিৎসায় ব্যয় হয়। তার ওপর পনেরো দিন টানা সে লোক নিতে পারেনি। রোজগার বন্ধ ছিল।

সেবার যখন সে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল বাবার হাতে, বাবার ঘোলাটে চোখে চকচকে ঝিলিক উঠেছিল। পরদিন সে যখন পাঁচশো টাকা চায় এবং তার পরদিন আরও পাঁচশো, বাবার কপালে তখন তীব্র ভ্রূকুটি। যেন দিয়ে দেওয়া টাকা চেয়ে অনধিকার চর্চা করছে সে। সে যে নিজের জন্য রাখেনি কিছুই, তার কোনও মূল্যই ছিল না।

সেদিন, বাবার ভ্রূকুটি দেখে তার কান্না পেয়েছিল। সেই প্রথম, তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়— পরিবারে সে এক উৎপাদন যন্ত্রবৎ। অর্থযন্ত্র। যদি অন্য কোনও সম্মানীয় উপায়ে এই অর্থ এসে যায়, ধরা যাক তার ভাই একটি চাকরি পেল— সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িতে সে অচ্ছুৎকন্যা হবে। তারও যে আছে সব মানবিক গুণ, তারও যে আছে স্বপ্ন, মায়া, ভালবাসা— ভাববে না কেউ।

সে জানে, নগরনটীদের নিয়ে, গণিকা, বেশ্যা, উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, মালবিকাদের নিয়ে এখন তুমুল আন্দোলন। শ্রমিকের সম্মান দিতে হবে— দাবি। স্বাস্থ্যের অধিকার দিতে হবে— দাবি। সমাজের এক কোণে নয়— তারা মধ্যমণি হবে। যারা গায়ে ঢাকা দিয়ে গণিকালয়ে যায়, তাদের গৃহের পাশে মুখ তুলে দাঁড়াবেই গণিকার বাড়ি। আরও—আরও—আরও কিছু।

হাক্—থু! থুঃ থুঃ!

সে মানে না এসব। হবে না। হবে না কিছুই। বরং স্বীকৃতি পাবার মোহে দলে দলে নেমে আসবে অভাবী মেয়েরা। উদ্বৃত্ত আয়ের

লোভে মধ্যবিত্ততার সীমিত সামর্থ্য থেকে আরও—আরও—আরও পেতে গৃহবধূ রাস্তায় দাঁড়াবে। আরও বেশি শোষণের জাল নেমে আসবে শ্রমিকের স্বীকৃতিবেশে।

হ্যাঁ। মানে সে। লোকালয়ে বসবাস মানে। আলাদা থাকবে কেন? অস্পৃশ্য থাকবে কেন গণিকার দল?

সম্মেলনে গেছে সে কয়েকবার। উত্তেজিত দাবি-দাওয়া বিতর্কের পর হাজার গণিকার মধ্যে মঞ্চের মুখাপেক্ষী বসে থেকে ভেবেছে—দাবি হোক একটাই— পৃথিবী হোক এমনই সমৃদ্ধ যাতে গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

দেওয়াল ঘড়িটা একবার দেখে নেয় সে। সময় আছে। আরও একবার রাস্তায় যাওয়া যেতে পারে। আগরাত্রে খদ্দের পেয়ে যাওয়ায় তার আজ আরও রোজগারের সম্ভাবনা।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে খাতা টানে সে। ছেলেটি শার্টের বোতাম আঁটছে। এলোমেলো চুল আঙুলে সাজিয়ে নিল। এখনও অন্যমনা। চশমাটা পরে নিল এবার। সে নাম চাইল। জিজ্ঞাসায় অনুরোধ মেখে। ছেলেটি থমকাল একটু। হয়তো অবাক হল। কিংবা ভয় পেল মনে মনে।

সে জানে, সকলে সঠিক নাম জানায় না তাকে। কিছু এসে যায় না তার। সে শুধু একটা নাম চায়। নাম।

এমনও হয়েছে, সে দেখেছে এমন যে একই ব্যক্তি ঘুরে ফিরে এল তার কাছে। একই লোক। সে চেনে। চিনে ফেলে। লোকটিও কি চেনে না তাকে? চেনে। কিন্তু চেনা দেয় না বেশির ভাগ। চলতে থাকে ভানের লড়াই। সে তখন নাম জানতে চায়। হতে পারে একই লোক দু' রকম নাম বলল। হতে পারে। হয়ে থাকে। সে সবসময় বুঝতেও পারে না। মুখ মনে থাকে তার। কিন্তু বেশির ভাগ নাম ভুলে যায়।

তার কাছে একজন মানুষের জন্য একটি নাম। একই মানুষ পর পর চারদিন এলেও তারা সব আলাদা আলাদা লোক। কারণ, সে জানে,

আজকের লোকটি আর থাকে না কোথাও। কালকেই অনেকটা বদলে যায়।

ছেলেটি সারা ঘর দেখে। সে হাতে কলম ধরে, খাতা ধরে চুপচাপ। ছেলেটি জানতে চায় না কিছু। তার চোখে চোখ সরাসরি। সেই চোখে সুদূরের ভাষা। সে মৃদু হাসে। ঘড়ির দিকে হাত বাড়ায়। তিনশো টাকায় যতটুকু সময় দেওয়া যায়, পেরিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি ইশারা বুঝে ফেলে দ্রুত। নাম বলে। রুমালে মুখ মুছে নেয়। আর সে নাম লেখে।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে তারা। অজানিত কেউ প্রলম্বিত ছায়া ফেলে তাদের পেছনে এসে দরজা বন্ধ করে যায়।

দু'জন দু'দিকে চলে যাবে। কোনও টান নেই। বন্ধন নেই। কোনও দাবি-দাওয়া-অধিকার নেই। শরীর। তুচ্ছ শরীর। মল, মূত্র, কৃমি, কফ, পুঁজ ও রোগজীবাণুমণ্ডিত আকাট শরীর। তাই দিয়ে বন্ধন হয় না কখনও।

গলি থেকে বেরিয়ে মূল রাস্তায় পৌঁছে যায় তারা। হঠাৎ ছেলেটি তার হাত ধরে। প্রশ্ন করে, এই পেশা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যাকেই তার শ্রেয় মনে হয় কিনা।

আত্মহত্যা। মানে হত্যা। মানে মৃত্যু।

মালবিকা হাত ছাড়িয়ে নেয় এবং দৃঢ় জানায়, এই জীবনে থাকবে বলেই, জীবনের থেকে পালিয়ে যাবে না বলেই, মৃত্যুর অভিমুখে নিজেকে এবং পরিবারের কারওকে যেতে দেবে না বলেই সে অপারগ গ্রহণ করেছে এ-বৃত্তি।

ছেলেটি কথা বলে না কোনও। ব্যাগ কাঁধে ফেলে ধীর পায়ে হেঁটে যায়। সে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এ বৃত্তি গ্রহণ করা কি সহজ ছিল? ছিল না, ছিল না। অসম্ভব দাহ থেকে যায় সারা জীবন। অসম্ভব কষ্ট। অভ্যাসের আড়ালে সে কষ্ট চাপা থাকে মাত্র।

সে জানে না, এই ছেলেটি, শুভদীপ নাম, অনুভব করে কিনা, জানে কিনা যে কোনও-কোনও পরিবার এক-একটি সময় বজ্র-বিদ্যুতে ভরে যায়। তখন জ্বলে জ্বলে ছাই হয় মানুষগুলি।

এই যে তারা, নিরুপায় বৃত্তিকে নির্ভর করে জীবনকে ধারণ করেছে, প্রাণকে ধারণ করছে, তার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষয়ও কি ধারণ করছে না? শুকনো বালুরাশির ওপর দিয়ে ছুটতে চাইছে তারা। হাত নড়ছে, পা চলছে, পেশির আন্দোলন ঘটে যাচ্ছে— কিন্তু গতি আসছে না। জীবন-জীবন করে মা-বাবা-ভাই কেউ আর ঠিকঠিক মা-বাবা-ভাই নেই, যে রকম থাকার কথা ছিল। সেও নেই যথাযথ মালবিকা। সে হারাল 'বি', হারাল পরের বর্ণ, আর সকলকেই নিয়ে পরিচয় ভাসিয়ে শুধু 'মাল' হয়ে বেঁচে থাকল। বেঁচে থাকতে হয় বলে বেঁচে থাকল। বজ্রবিদ্যুৎ প্রত্যাহৃত হলেও তারা আর স্বাভাবিক হবে না কখনও। বেশ্যাবৃত্তির গাঢ় দাগ তাদের গায়ে দগদগে লেগে থাকবে।

একটি গাড়ি আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তার। গম্ভীর ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসে সে। ছেলেটি চলে গিয়েছে কোথায়। সে সামনের দিকে তাকায়। লোকের ভিড় এখানে। বাস ধরার জন্য জমায়েত সব। এক মধ্যবয়সি পুরুষ, গোঁফদাড়ি নিখুঁত কামানো, হাতে বাক্স, গাঢ় নীল কোটের মাঝখানে টকটকে লাল গলাবন্ধ, আকুল অসভ্য ভুঁড়ি দৃশ্যমান অভিজাত পোশাকের ফাঁকে। সে এই লোকটির লোভী চোখ দেখে। চকচকে ইচ্ছাময় দৃষ্টি দেখে। আর মনে মনে বড়সড় দাঁও মারার অভিপ্রায়ে মৃদু হাসি তুলে অগ্রসর হয়।

৪

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে এগারোটা গড়িয়ে গেল। তাদের পুরনো ইট-বের-করা দেওয়ালের দিকে তাকাল সে কিছুক্ষণ। মালবিকা নামে মেয়েটির বাড়ি থেকে খুব বেশি কিছু আলাদা? না। ক্ষয়িষ্ণুতার দৌড়ে পিছিয়ে নেই দেওয়াল। তবে কব্জাগুলো আজও শক্তিমান। এখনও

আলগা করেনি বাঁধন। জানালাদের ঝুলে পড়তে দেয়নি।

কত দিন রং হয় না বাড়িটায়। ছাদ থেকে, দেওয়াল থেকে মেঝে অবধি মেরামতির প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত। বর্ষাকালে ঝরনার মতো জল গড়ায় ছাদ থেকে। যেখানে-সেখানে বসিয়ে দিতে হয় বালতি গামলা। নোনা ধরে গেছে দেওয়ালে। দরজা-জানালা বিবর্ণ। মেঝের মসৃণতা হারিয়ে গিয়েছে পায়ে পায়ে। এক রিক্ততার হাড়-জিরজিরে অস্তিত্ব।

মেরামতি আর হবে না। কেমন করে হবে। সব অর্থ বাবা আর বোনের ওষুধে, ডাক্তারে এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে ফুরিয়ে যায়। এতটুকুও উদ্বৃত্ত নেই। বরং প্রতি মাসে টান পড়ে। প্রতি মাসে বিজ্ঞাপনের সংগ্রহ থেকে সরাতে হয়। আবার পরের মাসের মাইনে থেকে পুষিয়েও দিতে হয়। অভাবের চক্র তাই মাসে মাসে আবর্তনই করে।

তার মনে হয়, তারা প্রত্যেকেই এই বাড়িটারই মতো নোনাধরা, ফেটে যাওয়া, পলেস্তারা খসা মানুষ। তাদের বেঁচে থাকাটা নিতান্তই অর্থহীন। প্রাণ যেন ঝুলে রয়েছে গলায়। আরও কিছু বিপর্যয় এলেই দেহত্যাগ করবে।

দরজায় শব্দ করে সে, আর দরজা খুলে যায়। মা। বিরক্ত, অপ্রসন্ন মুখে ঝুলকালির মতো লেগে আছে প্রশ্নটা। লেগে আছে, কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে না। হবে না শুভদীপ জানে। রোজগার করে বলেই এই সংসার তাকে দেয় কিছু বাড়তি সুবিধা, সম্ভ্রম। কিছু বাড়তি গুরুত্বও, যা তার বাবা পেয়ে আসত আগে। কবে থেকে সে এই পদে অভিষিক্ত হল জানতেও পারেনি। সংসার প্রচলিত নিয়মে তাকে একটি পদমর্যাদা দিয়েছে। সে নিজে এই পদ বা মর্যাদা চায় কি চায় না সেটা কোনও কথাই নয়। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের হাতে পায়ে অজস্র শিকল। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র এই শিকল মানুষকে অধিকার করে। এক-একটি শিকলের এক-একরকম অর্থ ও অভিমুখ। ক খ-এর চেয়ে স্বাধীন। খ গ-এর চেয়ে। কিন্তু ক খ গ কেউ সীমাহীন স্বাধীনতা লাভ

করে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই কোথাও, ছিল না কখনও। হবে কি না একমাত্র বলতে পারে মহাকাল। কিন্তু মহাকালের সঙ্গে কথোপকথন করবে কোন শক্তিমান?

অতএব পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের হাতে-পায়ে অদৃশ্য শেকল। চলনে-বলনে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ। কে কী চায়, কী পথ, কোন জীবন, কী পেশা, কোন সংগীত— সেই সব আর্ত চিৎকার বাতাসে বাতাসে বাজে। তার অদৃশ্য হাত মানুষকে ঠেলে দেয় ছোট্ট বলের মতো। গড়িয়ে দেয় যে-দিকে তার খুশি আর গড়ান নিয়ন্ত্রণ করে না। এমনকী লোফালুফি করে যখন যেমন ইচ্ছে।

এই যে সে, শুভদীপ, সে নিজের ইচ্ছেয় জন্মায়নি, নিজের ইচ্ছেয় শুভদীপ ভট্টাচার্য হয়নি। নিজের ইচ্ছেয় বনে যায়নি নিম্নবিত্ত সংসারের মুকুটহীন অধিপতি। অসংখ্য ভারী, অনপনেয় দায়বদ্ধতা তার ওপর আরোপ করা হয়েছে। কিছু পূর্বনির্ধারিত রীতি অনুসারে, কিছু বর্তমানের তাগিদে। তার জন্য তাকে দেওয়া হয়নি কোনও সতর্কবার্তা। কোনও প্রস্তুতির সময়। যেন এই দায়বদ্ধ করা— এক অধিকার। আর অধিকারের অন্য পিঠে সেই কঠিন বন্ধন। কিন্তু এই অধিকার, এই বন্ধনও নিত্য নয়। চিরস্থায়ী নয়। বাঁধন ওঠে, ছেঁড়ে, ছিঁড়ে দেয়। অধিকারবোধ জাগে, পরিণত হয় এবং টুটে যায় একদিন।

সুবল, টিয়ার জাত, খাঁচায় বসে ঘুমোচ্ছিল। শুভদীপের সাড়া পেয়ে ঘুমন্ত চোখ খুলল। শব্দ করল একবার। আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরে এল সে। প্রতিদিনের থেকে এতটুকু আলাদা নয়। যেন একটি দিন আরেক দিনকে নকল করছে মাত্র। যত ক্ষয়, যত বদল, যত গড়ে ওঠা— এতখানি বিন্দু বিন্দু পর্বে— নজরে আসে না। অনেকখানি বড় হয়ে গেলে মনে হয়, এ কী! এ কেমন করে হল! কবে হল!

নিভু-নিভু আলো জ্বলছে। বাবার জন্য। খেয়ে-দেয়ে ঠিক দশটায় ঘুমিয়ে পড়ে বাবা। আর মা জেগে থাকে। ঘুমোয় এবং ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে। গত দশ বছর ধরেই এমন। এখন মা আয়ত্ত করেছে নিজস্ব ঘড়ি। কোনও যন্ত্র ছাড়াই ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে যায় মার।

চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া মায়ের সঙ্গে স্নাতক ও কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী বাবার বিয়ে হয়েছিল। সমস্ত জ্ঞান এবং পারদর্শিতা নিয়ে বাবা শুয়ে আছে বছরের পর বছর। আর মা বেঁচে থাকার যন্ত্র ও কৌশল আবিষ্কার করছে প্রতিদিন।

বাবার এতটুকু কষ্ট যাতে না হয় তার জন্য আলো নিবিয়ে দেয় মা। দু'জনের বয়সের পার্থক্য প্রায় পনেরো বছর। কিন্তু এখন মাকে বাবার সমবয়সি লাগে। বিছানায় শুয়ে পড়ার পর বাবা ধীরে ধীরে মরছে। মা দ্রুত।

কয়েক বছর আগেও তাদের তিন ভাইবোনের কারও না কারও পড়ার প্রয়োজন থাকত। তখন তারা পাশের ঘরে চলে যেত। শরিকি বাড়ি ভাগ বাঁটোয়ারার পর এই ঘরখানা তারা পেয়েছে রসুই হিসেবে। ছোট নিচু স্যাঁতসেঁতে ঘর। একটি মাত্র জানালা। দেওয়ালের একদিকে তাক। তাতে মায়ের রান্নার সরঞ্জাম। জানালা বরাবর গ্যাসের উনুন রাখার টেবিল। বাড়তি একফালি জায়গায় একটা খাট। তারা দু'ভাই তাতে গা ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে থাকে সারা রাত। একজন চিৎ হলে অন্যজনকে পাশ ফিরতে হয়।

খাটের পা-গুলি ইটের ওপর ইট সাজিয়ে উঁচু করা। নীচে জলের পাত্র, চালের ভাঁড়ার, হাঁড়ি-কড়াই, আনাজ, ছাতা, বঁটি, ময়লা ফেলার পাত্র। বর্ষায় উঠোনের জমা জল হুড়মুড় ঢুকে পড়ে। এই বিছানার ওপর তখন সব তুলে দেওয়া হয়। তারা দু'ভাই পা-ডোবা জলে দাঁড়িয়ে মগ দিয়ে জল ছেঁচে। আর রাত্রে তখন পাঁচজন এক বিছানায় শোয়। বড় ঘরের বড় বিছানায় পাথালি দিয়ে শোয়। মশারিতে পা লেগে যায় বাবার এবং দু'ভাইয়ের। তারা পা গুটিয়ে শোয়। সারা রাত টান করতে পারে না।

আর এইসব জলছেঁচার কাজে, জিনিসপত্র টানাটানির কাজে দীপান্বিতা ভট্টাচার্যকে তারা নেয় না কখনও। দীপান্বিতা তখন শুচু হয়ে বড় ঘরের খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। কারণ, জল ঘাঁটাঘাঁটি করলেই ওর জ্বর এসে যায়। সারতে চায় না। তাই শুচুকে ভারী কাজ করতে দেওয়া হয় না। রান্নাও করতে দেওয়া হয় না। মার

হাতে হাতে টুকটাক করে। সুবলকে খেতে দেয়। সুবলের খাঁচা পরিষ্কার করে। সুবল একমাত্র ওকেই কামড়ে দেয় না তখন। ওর হাতে মাথা ঘষে অস্ফুট শব্দ করে। শুচু তখন মহীনের ঘোড়াগুলির গান শোনায় সুবলকে— ...সেই বাড়ির নেই ঠিকানা। শুধু অজানা লাল সুরকির পথ শূন্যে দেয় পাড়ি। আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি... সুবল তার থেকে বেছে নেয় কিছু পছন্দমতো শব্দ। আর আওড়ায় সারাদিন।

কোনও ভারী কাজ করার শক্তিই নেই শুচুর। ওর মধ্যে একটি স্বাভাবিক শীর্ণতা আছে। স্বাভাবিক দৌর্বল্য। Congenital Cyanotic Heart Disease। হৃদ্‌যন্ত্রের জন্মকালীন অসুখ।

শীর্ণতার সঙ্গে, নিয়মিত অসুস্থতার সঙ্গে, তারা দেখেছিল, ওর জিভ ক্রমশ নীলচে হয়ে যাচ্ছে। চোখ নীলচে। এমনকী গায়ের রঙেও কালচে নীল ছোপ। যেন বিষ ভরে গেছে শরীরে। চিকিৎসকেরা জানালেন, ওর অলিন্দ ভুলে ভরা, নিলয় ক্রটিযুক্ত। ওর বিশুদ্ধ রক্তে ঢুকে পড়ছে অশুদ্ধ রক্ত। অস্ত্রোপচার করলে ভাল হতে পারত। কিন্তু তার জন্য চাই এক সমুদ্র টাকা। দুর্ভাগ্য শুচুর। তার বাবার সমুদ্র ছিল না। পুকুরও না। শুধু বালতি একখানা। মাসে মাসে ভরত। আবার খালি হত। এখন ভাইয়ের ঘটিও পূর্ণ হয় না। তার অস্ত্রোপচার কেমন করে হবে! তাই ওষুধ আর ওষুধ আর ওষুধ। মাঝে মাঝে রক্ত দেওয়া। গায়ে চাকা চাকা হয় মাঝে মাঝে। মাথা ঘোরে। জ্ঞান হারায়। মরে যেতে পারে যে কোনও দিন। আবার বেঁচেও থাকতে পারে। বেঁচে আছে যেমন। নীল অপরাজিতার মতো অসম্পূর্ণতায়। কিন্তু ও বেঁচে আছে বলেই, ও যে মরে যেতে পারে, যে-কোনও দিন, সেই সম্ভাবনা মনে রাখে না কেউ। শুচুকে আগলে রাখা অভ্যাস—রাখে। যেমন দিনের পর দিন শুধু আলুসেদ্ধ আর ভাত খাওয়া অভ্যাস— খায়। আর সেইসব দিন শুধু বাবার জন্য একটু দুধের ব্যবস্থা রাখা। সে-ও অভ্যাসবশে রাখা থাকে অনায়াসে। আর শুচুও এই অসুস্থতা, ওষুধ আর মৃত্যুর সম্ভাবনার ভিতর অভ্যস্ত হয়ে যায় জীবনে। হাঁটা-পথের দূরত্ব ইস্কুলে পড়েছিল সে আর নিকটবর্তী কলেজে নাম

লিখিয়েছিল। ডাক্তারের আদেশনামা অনুসারে পরীক্ষা দিয়ে আসত শুধু। আর দেখতে দেখতে তারা স্নাতক হয়ে যায়। তারা তিন ভাই-বোন। বাবার অসুস্থতাজনিত অক্ষমতায় দারিদ্রের দণ্ড তাদের পাঠ ইত্যাদি সম্পর্কে বিরাগ জন্মাতে পারেনি।

এর মধ্যে শুচুকেই বলা যায় বৃহত্তম বিস্ময়। কারণ কলেজে না গিয়ে, কারও সাহায্য না নিয়ে সে একা একা পাশ দিয়েছিল। এমনই, মৃত্যুকে সঙ্গী করে। শীর্ণতার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছিল আর গান ভালবেসেছিল। বেশ কিছু ক্যাসেট তাদের সঞ্চয়। বিশ্বদীপ দুটি ছাত্র পড়িয়ে যা পায়, তার থেকে কেনে। হয়তো শুচুর কথা ভেবেই। আর নতুন গান বাজলেই মা টের পায়। কিছুক্ষণ অভিযোগ করে। গান সংসারের তেমন কোনও কাজে লাগে না, যেমন লাগে চাল, ডাল, চালকুমড়ো। শুচু শোনে। বিশ্বদীপও শোনে। কিন্তু চালিয়ে যায় আগের মতো। ক্যাসেটের সংগ্রহ বাড়ে। আর শুচু ঘুরে-ফিরে, সুবলকে খাওয়াতে খাওয়াতে গায় মহীনের ঘোড়াগুলি। শোনে অনেক গান আর খায় শুধু মহীনের ঘোড়াগুলি। হয়তো পঙ্‌ক্তিগুলি যথাযথ থাকে না। ক্রম বদলে যায়। শব্দও দু-একটা। কিন্তু ও প্রাণ দিয়ে গায়। মোটামুটি স্বরে মোটামুটি করে গায়। আর ওর গান শুনতে শুনতে তাদের সবার মুখস্থ হয়ে যায় গানগুলি। যেমন প্রায়ই সন্ধ্যায় বাবা আর মা টিভি দেখতে থাকলে ও গায় বোকা বাক্সের গান। মা তখন বিরক্ত হয়। দারিদ্রের দুঃখ অপনোদনের এই এক মাধ্যমের কাছে বসে মা বড় নিবিষ্ট হয়ে থাকে। আর শুচু উঠোনে ঘুরে ঘুরে, সুবলের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে, কলপারের কাছে গজানো সন্ধ্যামণি ফুলের দিকে তাকিয়ে গাইতে থাকে।

পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে
স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে
ড্রয়িংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি
আ-হা-হা-আ—হা
ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে

যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে
ঘুচে গেছে দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি
আ-হা-হা-আ—হা
ভেবে দেখেছ কি তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে
তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে

শুচুর অসুখ ধরা পড়ার পর দশ বছর সুস্থ ছিল বাবা। তারপর তার স্নায়ু বৈকল্য হয়। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও থাকতে পারে। কারণ সংসারের শ্রীমুখে কালির প্রলেপ লাগছিল শুচুর অসুখ ধরা পড়ার পরই। হতে পারে তার জন্য কিংবা কোনও অজ্ঞাত কারণে নিজেকে গুটিয়ে গুটিয়ে এতটুকু করে বাবা পুরোপুরি ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। তার আগে পর্যন্ত শুচুর সমস্ত তত্ত্বাবধান সেই করত। বাবার হাত থেকে অতঃপর শুচুর দায়িত্ব চলে আসে শুভদীপের হাতে। শুচুর দায়িত্ব এবং শুচুর সঙ্গে সঙ্গে গোটা সংসারেরও ভার। এ যেন সেই জ্বলন্ত মশাল দৌড়। মশাল নিভবে না। দৌড় থামবে না। শুধু বাহকরা বদলে বদলে যাবে। শুভদীপ জানে, সে যদি মরে যায়, এই ভার নেবে বিশ্বদীপ।

ইদানীং শুচুকে আরও শীর্ণ মনে হয়। উচ্চারণেও সামান্য জড়তা এসেছে। জিভ যেন আড়ষ্ট। নড়তে চায় না। শুভদীপ দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কথা শুনেছে। হৃদ্‌যন্ত্রের অস্ত্রোপচারের জন্য যারা দুঃস্থদের অর্থ সাহায্য করে। সে যাবে। ভেবেছে। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না তারা দুঃস্থ কি না। দুঃস্থ বলতে যে দৃশ্য আসে, তাদের তেমন নয়। তাদের দরিদ্র জীবনযাপনের গায়ে মধ্যবিত্ততার মায়া বুলানো আছে।

অতএব সে ভাবছে। সাহায্য পেলে শুচুকে নিয়ে সে চলে যেত দক্ষিণে। ভেলোর শহরে। আর সারিয়ে আনত। ভেলোরে যারা যায়, সবাই সুস্থ হয়ে ফিরে আসে। এমনকী এ শহরের প্রধান প্রধান চিকিৎসকরা যাদের জবাব দিয়ে দেন—তারাও। এমনই এক কিংবদন্তি এখন। অতএব সে ভাবছে। ভাবে। যাবে। বলবে তার সাহায্য চাই। ভাবে। কিন্তু যেতে পারে না।

বেশ বড়-সড় চেহারার বাবা ও সাধারণ মাপের মায়ের সঙ্গে বড় ঘরের বড় বিছানায় বেশ এঁটে যায় শুচু। এই বড় ঘর তার নিজস্ব পরিমাপের চেয়েও, এ সংসারে আরও অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আসলে। এ ঘরেই তাদের সমস্ত। সব বসবাস। টিভি, খাট, আলনা, আলমারি, সাজার টেবিল, জলছাঁকনির বাক্স, টেপরেকর্ডার, ক্যাসেট, কাঁসা-পেতলের বাসন, বসার চেয়ার, বই, ছবি। বস্তুসামগ্রী ঢোকাতে ঢোকাতে এত ঠাসাঠাসি—কোনও কিছুকেই আর নাড়ানো যাবে না। ঘরে ইঁদুরের ইন্তেকাল হলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

একটি অমোঘ প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল শুভদীপ। এ প্রশ্ন আর মা মুখে ঝুলিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াবে না। উচ্চারণ করবে। সে কী জবাব দেবে জানে না। স্পষ্ট কোনও জবাব না দিলেও চলে। সে বলবে. কাজে লেগেছে। কাল ওষুধ এনে দেবে। পর্যটন সংস্থায় যাবে আর টাকা পাবে। সে টাকা থেকে ওষুধ কিনবে। মাসের শেষ হলেই... সেই আবর্তন। সেই দুষ্টচক্র। শেষ পর্যন্ত আবার সংসারের ভাঁড়ারে টানাটানি। আর ঘ্যানঘ্যানানি বাড়বে। বিরক্তি বাড়বে। গোটা জীবনযাপন নির্বোধ চাহনিতে, হাঁ-মুখে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। তাকিয়েই আছে সারাক্ষণ। এই যে মৃত্যুকেই সে ভেবে বসে আছে পরম মোক্ষ, চিরনারীর কোলে সে আশ্রয় নেবে—এমনই ভেবে চলেছে নিরন্তর, আর তা বাস্তবায়িত করতে পারছে না, তার কারণ হতে পারে এই হাঁ-মুখ সংসার। যেখানে সে প্রায় অপরিহার্য এখন। দশচক্রে ভগবান।

৫

শার্ট খুলছিল সে। বিছানার এক পাশে বাবা। অন্য পাশে শুচু। মা মাঝখানে শোবে। মশারি টাঙানো। বহু পুরনো, বিবর্ণ মশারির সহস্র ছিদ্র কেটে অনেকগুলো বড় বড় ফুটো। তালি মারা হয়েছে কোনও কোনও জায়গায়। কোথাও কাপড় গোঁজা বা সেফটিপিন। কত দিন

মশারি কেনা হয়নি? বিছানার চাদর, ঢাকনি—এই সব? শুভদীপ মনে করতে পারে না কিছুতেই। বরং সে একটি মশারির দাম কত হতে পারে ভাবে। দুশো-তিনশো। তিনশো?

শার্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে শীতের ভাব লাগছিল তার গায়ে, নিমেষে সেটি উধাও হয়ে যায়। বরং গরম স্রোত নামতে থাকে কান মুখ বুক পিঠ বেয়ে। তিনশো টাকা! তিনশো টাকায় মশারি! অনায়াসেই হত। হতে পারত। সংসারে টানাটানিটা থাকত। কিন্তু একটা জিনিসও বাড়ত।

মা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসেছে ঘরে। সরাসরি ওষুধের কথা বলছে না। শুচুর কথা বলছে। আজ দুপুর থেকে শুচুর গায়ে জ্বর। তারপর, গুহ্য কথা জানাবার মতো গলা নামিয়ে, শুভদীপের বুকের কাছাকাছি এসে মা জানাচ্ছে, দেবনন্দন এসেছিল। দেবনন্দন তার বন্ধু। খুব ছোটবেলা থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে প্রায় রোজই আসে। সুতরাং তার আসার মধ্যে বিশেষত্ব কী, শুভদীপ বুঝতে পারছে না।

মা-র ভাঙাচোরা মুখে উজ্জ্বলতা। বিরক্তি উধাও ঠোঁটে চাপা হাসি। মিটমিটে আলোয় সে ঔজ্জ্বল্য রাঙা দেখাচ্ছে। তবে চাপা হাসিটা বোঝা যাচ্ছে ঠিকঠাক। মা জানাচ্ছে তখন, দেবনন্দন শুচুকে বিয়ে করতে চায়। সব কিছু জেনেশুনে বিয়ে করতে চায়।

শুভদীপ হাঁ করে থাকে কিছুক্ষণ। কথা বলতে পারে না। প্রথমেই তার মনে হয়, দেবনন্দন তাকে তো কখনও বলেনি। কেন? তারপরই দ্রুত কিছু ভাবনা তার মাথায় আসে। শীর্ণ, নীলচে, জৌলুসহীন, প্রাণশক্তিহীন, ক্ষণভঙ্গুর মেয়েটাকে বিয়ে করে কী করবে দেবনন্দন। কী পাবে! শুচু তার প্রিয়। অতি প্রিয়। তবু এই সব ভাবনা সে ভেবে বসে। এবং এ খবর দেবার সময় মায়ের মুখে যে প্রদীপ্ত আশা, তাকে ঘৃণা করে সে। মাকে স্বার্থপর মনে হয়। রোগা-ভোগা শুচুকে কেন তারা অন্যের হাতে তুলে দেবে! শুচু তো বিয়ের পিঁড়িতেও মারা যেতে পারে। কিংবা বিয়ের কাগজে সই করতে করতে। ও যে বেঁচে আছে এত দিন, সে-ই তো আশ্চর্য।

হঠাৎ সে উপলব্ধি করে, কত দীর্ঘদিন পর শুচুর মৃত্যুর কথা মনে

পড়ল তার। সে ভুলে গিয়েছিল। তার মনে হয়, মাও ভুলে গিয়েছে। অন্যরাও। এমনকী দেবনন্দনও। কে জানে শুচু নিজেও ভুলে গিয়েছে কি না। সে গায়ে গামছা জড়িয়েও কলপারে যেতে ভুলে যায়। মা বিবৃতি দিতে থাকে। মেয়েলি ঢঙে, মেয়েলি দৃষ্টিভঙ্গিতে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা ঝরায়। বিয়েই মেয়েদের চূড়ান্ত প্রত্যাশা। একটা ভাল ঘর। বর। মেয়েটা তবু একটু সুখ পেত বিয়ে হলে। যেচে আসা সম্বন্ধ। পায়ে ঠেলা কি ঠিক? সুখের মুখ দেখা থেকে মেয়েটাকে কি তা হলে বঞ্চিত করা হবে না?

সুখ! সুখ! কীসের সুখ! কেমন সুখ! বিয়ে হলে কি সুখ হয়? যৌনতা? বিয়ে হল যৌনতার আইনসঙ্গত স্বীকৃতি। দেবনন্দন কি শুচুকে... সে দরজার দিকে পা বাড়ায়। অসুস্থনীল বোনের জৈবিক ভাবনাজড়িত চিন্তনকে জোর করে দূরে ঠেলে রাখে। শুধু চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে মাকে জানিয়ে দেয়, শুচুকে পাত্রস্থ করার বিষয়ে তার মত নেই। মা আর কথা বাড়ায় না। সে অন্ধকার উঠোনে পা রাখে।

অন্ধকার গাঢ় নয়। কারণ ছোটঘরের আলো এসে উঠোনে পড়ছে। কলপারেও তাদের অন্য শরিকের ঘরের আলো। সে আর আলাদা করে কলপারের আলো জ্বালল না। তাদের বাড়িতে আজও স্নানঘর নেই। উঠোনের এককোণে কলতলা। সেখানেই সবাই স্নান সারে। মেয়েরা পোশাক পরেই গায়ে জল ঢেলে ঘরে চলে যায়। ছেলেরা গামছা পরে খালি গায়ে সাবান-টাবান মাখে। বিশ্বদীপের স্বপ্ন, চাকরি পেলেই সে প্রথমে একটা স্নানঘর করবে। টিনের চাল দেওয়া একটা সাধারণ স্নানঘর করতে হাজার দশেক টাকা লাগবে—সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে।

চাকরির জন্য খুব চেষ্টা করছে বিশ্বদীপ। সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে, আর বেসরকারি চাকরির জন্য আবেদন করছে। দৈনিক সংবাদপত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সে প্রতিদিন এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কাগজগুলো আদ্যোপান্ত পড়ে। কোনও বিশেষ প্রশিক্ষণ নেবার সঙ্গতি নেই। সুতরাং বেসরকারি সংস্থায় সে পেতে পারে একমাত্র

বিপণনের কাজ। ইতিমধ্যে কয়েকটি জায়গায় মুখোমুখি পরীক্ষা পর্ব সেরে এসেছে সে। একটি বড় সংস্থা তাকে দ্বিতীয়বার ডেকেছিল। আজই সেই দ্বিতীয়বার যাবার দিন। শুভদীপ এখনও জানে না বিশ্বদীপ গিয়েছিল কি না সেখানে। গিয়ে থাকলেও কী হল জানে না। প্রায় সমস্ত কথাই তারা আলোচনা করে রাত্রে।

বিশ্বদীপের বয়স এখন তেইশ। পাঁচ বছরের ছোট সে শুভদীপের চেয়ে। শুচুর চেয়ে দু'বছরের। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তাদের মধ্যে দাদা-দিদি বলার চল নেই। পরস্পরকে নাম ধরেই ডাকে তারা। হতে পারে, শুচু আর সে প্রায় পিঠোপিঠি বলে শুচুকে দাদা বলতে হয়নি। আবার বিশ্বদীপ ও শুচু পিঠোপিঠি বলে এবং দাদা ডাক শোনার প্রচলন ছিল না বলে বিশ্বদীপ ডাকেনি তাদের। মা প্রথম প্রথম বকাবকি করত। বাবার কাছে অনুযোগ করত। কিন্তু বাবা হেসে উড়িয়ে দিত সব। পশ্চিমের দৃষ্টান্ত দিত। শুনতে শুনতে মাও মেনে নিয়েছে। বাবা যতদিন সুস্থ ছিল, মাকে অভিযোগ করতে শোনেনি শুভদীপ, এই একটি বিষয় ছাড়া।

কলতলায় একটু বেশি শীত টের পায় সে। হঠাৎ আবার মালবিকাকে মনে পড়ে তার। মালবিকার বুক, পেট, নাভি মনে পড়ে। একশো টাকার তিনটি নোটও মনে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ। সে তখন গামছা জড়িয়ে ঘরে ফিরে যায়। শার্ট আনে। গেঞ্জি ও প্যান্ট পরেই আছে তখনও। সে স্থির করে ধোয়া কাচা করে ফেলবে সব। শার্ট-প্যান্ট-গেঞ্জি-জাঙিয়া। মায়ের কাছে সাবানের বাক্স চায় সে। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য ঘষা সাবান ব্যবহার করে তারা। গুঁড়ো সাবান নয়, মাঝে মাঝে এক-আধটা পাউচ কিনে আনে তিন টাকা দিয়ে।

সাবান হাতে করে উঠোনে আসে মা। এই রাতে, শীতের আভাসে, জামাকাপড় কাচার সারবত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। সে তখন এক বসন্তরোগীর কথা বলে। তার পাশে বসেছিল বাসে। এমন বলে। সবকিছুই বড় আগে আগে এসে যাচ্ছে এখন। গ্রীষ্মের মধ্যেই এসে যাচ্ছে বর্ষা। আর শীত না পড়তেই এসে যাচ্ছে বসন্ত।

এইসব বলতে বলতে মা ঘরে ফিরে যায়। খাবার গরম করার আয়োজন করে।

বাইরে পরে যাবার মতো একটি প্যান্ট, দু'খানা শার্ট। শার্টদুটো সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে। চন্দ্রাবলী একটি জিনস দিয়েছিল তাকে। তোলা আছে। আরও শীত নামলে পরবে। অথবা পরবেই না। আর কোনও দিন চন্দ্রাবলী তাকে শার্ট-প্যান্ট দেবে না। জিনস দেবে না। জুতো, ব্যাগ দেবে না। কিনে দেবে না চশমার ফ্রেম।

চন্দ্রাবলী তাকে একটি শার্টই দেয়নি। একটি প্যান্টই দেয়নি। দিয়েছে আরও। সে নিজের থেকে বিশ্বদীপকে দিয়েছে। একটিমাত্র ছেঁড়া শার্ট আর ছেঁড়া প্যান্ট পরে ঘুরত ছেলেটা। আর এক-একটি ছেঁড়া জায়গা ধরে-ধরে রিফু করে দিত শুচু। তাদের সবার জামাকাপড়ে শুচুর মেরামতি লেগে আছে। আর এ কাজটিও শুচু করে সুবলকে পরিচর্যা করারই মতো একাগ্র মনোযোগে। কাপড়ে ছুঁচ বেঁধায় আর গুন গুন করে। মহীনের ঘোড়াগুলির সুর।

গুনগুন স্বরে সুর গলিয়ে উঠোনে আসে বিশ্বদীপ। শুভদীপ লক্ষ করে—মহীনের ঘোড়াগুলির সুর। শুচুর মাধ্যমে তারা সবাই মহীনের ঘোড়াগুলি দ্বারা সংক্রামিত।

মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তির সুর গড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বদীপ। চড়া পর্দার সুর। ভেবে দেখেছ কি তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে তারও দূরে তুমি আর আমি... ভেবে দেখেছ কি...। যাই ক্রমে সরে সরে—বলতে পারছে না সে। গাইতে পারছে না। স্বর পৌঁছচ্ছে না তার। শুভদীপ জামা-প্যান্টে সাবান মাখছে। কলপারের কাছাকাছি পরিত্যক্ত তুলসীমঞ্চের আড়ায় বসছে বিশ্বদীপ। জানাচ্ছে, চাকরিটা হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু তার আগে কিছু বেয়াড়া শর্ত আছে। গৃহস্থালির জন্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো যন্ত্র বিপণনের কাজ। প্রথম ছ'মাস শুধু গাড়িভাড়ার বিনিময়ে বিপণন! তিনদিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে নেবে সংস্থাটি। এবং কাজ শুরু করার পর প্রতি মাসে একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয় করে দেবে। লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করতে পারলে চাকরি নিশ্চিত।

তখন চমকদার বেতন পাবে তারা। যদি চাকরি না পায় শেষ পর্যন্ত, তা হলেও লাভ কিছু আছে। লাভ অভিজ্ঞতা। বিপণনের জগতে অভিজ্ঞতা একটা বড় ব্যাপার। এই সংস্থার অভিজ্ঞতা তাকে একটি সুগম ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে পারে।

শুভদীপ জানে। এরকমই হয়। সে যে একটি ছোট সংস্থায় কাজ করে, সেখানেও তিন মাস বিনা বেতনে কাজ করতে হয়েছিল তাকে। শতকরা এক ভাগ সে পেত সমস্ত সংগৃহীত বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের ওপর। আলাদা করে গাড়িভাড়াও পায়নি। তবে তার কোনও লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট ছিল না। সে নিজেই নিজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল। প্রথম মাসে তার আয় হয় তিনশো টাকা।

বিশ্বদীপ জানায়, সে যোগ দেবে বলেই ভাবছে। শুভদীপের মত সে জানতে চায়। শুভদীপ তাকে যোগ দিতে বলে। তিন দিন পর তাকে যেতে হবে আবার সে জানায়। শুভদীপ চুপ করে থাকে। হিম জলে আঙুল টন টন করে। সাবানের ফেনা ছিটকে চোখে-মুখে লাগে তার। তিনটে একশো টাকার নোটের কথা তার মনে পড়ে আবার। কত কিছু হতে পারত এ টাকায়। মার একটা শাড়ি হতে পারত। কিংবা, বিশ্বদীপ কাজে যোগ দিলে হাতখরচ হিসেবে দেওয়া যেত তাকে কিছু।

তার গা ঘিনঘিনে ভাব হয়। আর একবার স্নান করার কথা সে ভাবে। বিশ্বদীপ শুভদীপের কেচে দেওয়া জামাকাপড় নিয়ে মেলে দিতে থাকে এবং কথা বলে যায়। নিচু গলায়, মা শুনতে পাবে না এমন ভাবে বলে—চাকরি পেলেই সে মিঠুর সঙ্গে বিবাহ নিবন্ধীকৃত করবে। কারণ মিঠুর সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। শুভদীপের মায়ের কথা মনে পড়ে। যেচে আসা সম্বন্ধ—মা বলছিল। মিঠুর জন্যও কি যেচে সম্বন্ধ আসছে?

শুভদীপ নিবন্ধীকরণের ঔচিত্য সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে না। বালতি থেকে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে সে বিশ্বদীপকে দেবনন্দনের ইচ্ছার কথা জানায়। বিশ্বদীপ হাসে। বলতে থাকে, দেবনন্দন আর শুচু প্রেমে আবদ্ধ। শুভদীপ আরও একবার বিস্মিত হয়। শুচু এবং

প্রেম—এই দুই প্রান্তকে সে কিছুতে মেলাতে পারে না। তা ছাড়া, দেবনন্দন তার ছোটবেলার বন্ধু, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে বলেনি কিছুই। কেন? ক্রোধ জাগে না তার, অভিমান জাগে না। শুধু এক অর্ধস্থবির মানসিকতায় ধীরে ধীরে বিস্ময়ঘোরে তলিয়ে যায়। বিশ্বদীপ কথা বলে ওঠে আবার। বলতে থাকে, সত্যিকারের প্রেমিকের মতোই দেবনন্দন শুচুকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায়। দেবনন্দনের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ হয় সে। কিন্তু সেই উচ্চকণ্ঠ শব্দগুলি শুভদীপের শ্রুতি বিদ্ধ করে না। শুধু 'সত্যিকারের প্রেমিক' শব্দটি তাকে ঘিরে ঘুরপাক খায়। সে গামছায় চুল মোছে আর কথাগুলি তার মাথায় ঢুকবে বলে ঘুরপাক খেতে খেতে জায়গা খোঁজে। খোঁজে আর ঠোক্কর খায় হাতে বা গামছায়। বিশ্বদীপ আবার নিচুকণ্ঠে ফিরে যায় এবং মিঠুর প্রসঙ্গে অবতরণ করে। মিঠু এখন কারওকে কিছু জানাবে না, যত দিন পর্যন্ত না বিশ্বদীপ উপযুক্ত হয়।

উপযুক্ত। কীসের উপযুক্ত? বিয়ের। কীসের উপযুক্ত? মিঠুকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারার। কীসের উপযুক্ত? সত্যিকারের প্রেমিক হতে পারার।

তা হলে, সত্যিকারের প্রেমিক হতে গেলে কোনও চাহিদা নেই ভালবাসায় টইটম্বুর হৃদয়খানির। বরং অনেক বেশি প্রয়োজন টইটম্বুর পকেট।

একটি মেয়েকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার জন্য শুধু ভালমানুষ হলেই চলবে না। থাকতে হবে উপার্জনের নিশ্চয়তা। থাকতে হবে কর্মক্ষেত্রের কৌলিন্য।

বিশ্বদীপ কথা বলে চলে। মিঠু এখন কারওকে কিছু বলবে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে বলবে। তার বাড়ি থেকে যদি জোর-জবরদস্তি করে তবে চলেও আসতে পারে এখানে।

সত্যিকারের প্রেমিক, স্ত্রীর মর্যাদা—কথাগুলো শুভদীপের ব্রহ্মতালুতে ঠোক্কর মারে। তার খুলি ভেদ করে অন্দরে যেতে চায়। যদি মিঠু নিরুপায় হয় আর চলে আসে এখানে তবে মিঠু আর বিশ্বদীপ শোবে কোথায়?

তার ভাবনায় একটি প্রেম এবং প্রেমের পর কুলীন এক উপার্জন— অন্তে সত্যিকারের প্রেমিক হয়ে বিয়ে করে ফেলা ও স্ত্রীর মর্যাদার পরই শয্যার প্রশ্ন আসে। দাম্পত্যর অধিকারে অন্তত রাত্রির নিভৃতিটুকু পাওয়া চাই।

শুভদীপ এই হিসেব বরাবর করেছে। যতবার বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে ততবার। সত্যিকারের প্রেমিক হওয়ার আগে সে বরং শয্যা নিয়েই ভাবিত হয়েছে বেশি।

গামছায় মাথা-গা-বুক-পিঠ ঘষতে ঘষতে সে মনে মনে সাজিয়ে নেয়— মিঠু যদি চলেই আসে তো সে তার জায়গা মিঠুকে দিয়ে দেবে। নিজে বড় ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে নেবে। বড় স্যাঁতসেঁতে মেঝে। তার ওপর দেওয়ালের জায়গা বাড়াবার জন্য ঘরের দুটি জানালার একটি খোলা হয় না।

হয়ে যাবে। কোনও ভাবে হয়ে যাবে। তার আগে বিশ্বদীপের চাকরিও নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। তারা দু'ভাই খুব পরিশ্রম পারে। সুতরাং তারা গলাগলি বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়। সে বিজ্ঞাপন ফিরি করবে। বিশ্বদীপ নামী সংস্থার পণ্যবস্তু।

বিশ্বদীপ একটি শুকনো পাঞ্জাবি শুভদীপের দিকে এগিয়ে দেয়। মা রান্নাঘর থেকে তাড়া দিতে থাকে। মায়ের গলা পেয়ে সে আবার সেই অমোঘ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতায় ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। উচ্চকণ্ঠে সে দেবনন্দনের প্রসঙ্গ তোলে আবার। বিশ্বদীপ জানায় দেবনন্দনের প্রস্তাবে তার কোনও আপত্তি নেই। বরং দেবনন্দনের মহত্ত্বকে সে সহায়তা দেবে। শুভদীপ এই বিবাহ-সম্মতিকে এক ধরনের প্রবঞ্চনা বলে ব্যাখ্যা করে কারণ শুচু এক রোগগ্রস্ত মেয়ে। বিশ্বদীপ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দেয়। সিগারেটের আগুন ধামাকা হয়ে জ্বলে। সেই জ্বলন দ্বারা নীরবতাকে পোড়াতে থাকে বিশ্বদীপ। আর শুভদীপ সেই আগুনে গা সেঁকে নেয়। নিজের শৈত্য সেঁকে তাপ নেয় আর সময়কে গভীর রাতের দিকে ঠেলে দিতে চায়। মার চোখ ঘুমে ঢুলে আসুক— এমনই সে আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু মা খাবার

আগলে বসে আছে। সারাদিন যা কিছু ভেবেছে মা, আশঙ্কা করেছে, সংসারে যা-যা ফুরিয়েছে, যা-কিছু প্রয়োজন, সব না বললে মার ঘুম আসবে না আদৌ।

সে গামছা মেলে দিয়ে হাত দিয়ে চুল ঝাড়তে থাকে। পাঞ্জাবি পরে নেয়। বোতাম লাগাতে গিয়ে দেখে বোতামের পাশ দিয়ে বিনুনির মতো নেমে গিয়েছে সরু সুতোর নকশা। তার অন্য এক বিনুনি মনে পড়ে। আজ বিজ্ঞাপন থেকে নেমে এসেছিল মেয়েটি— তার। তাকে ছাড়িয়ে আরও একটি বিনুনি। চওড়া ও কোমর-ছাপানো। রাশি-রাশি সেই চুলের সম্ভার যে-কোনও শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন হতে পারত। সেই চুলকে তার মেঘরাশি বলতে ইচ্ছে করে হঠাৎ। কিংবা রেশমের অন্ধকার। ঝলকে উপলব্ধি হয় তার। সে যে মৃত্যুর দেবীকে কল্পনা করেছে আর তার মাথায় বসিয়ে দিয়েছে চুল— যে চুল বিস্তৃত হয় আর অন্ধকারকে ঘনায়মান করে, সে চুল অবিকল চন্দ্রাবলীর। সে বিবশ বোধ করে। অসহায় লাগে তার।

তখন বিশ্বদীপ কথা বলে আবার। ভারী ও গভীর কথা বলে, যেন কোন অতল থেকে উঠে আসছে বাণী। সে ব্যাখ্যা করতে চায়। মানুষের পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবকে চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়। সে মনে করে, এই হিসেব খুব সহজ নয়, তুচ্ছও নয়। প্রত্যেক মানুষেরই চাওয়া ও তৃপ্তিবোধ একজনের অন্যের চেয়ে আলাদা। দেবনন্দন শুচুকে জীবনে গ্রহণ করবে, এ সিদ্ধান্ত তারই। কেউ তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়নি। কেউ অনুরোধও করেনি। অতএব, এর মধ্যে কোথাও কোনও বঞ্চনা লুকিয়ে থাকতে পারে না।

তখন মা উঠোনে পা রাখে। বলতে থাকে বাবারও এমনকী সম্মতি আছে, শুধু শুভদীপের আপত্তির কোনও অর্থ সে খুঁজে পায় না।

মা এগিয়ে এসে মাঝ-উঠোনে দাঁড়াচ্ছে। দুই ছেলের মাঝ বরাবর এসে থামছে সে সম্পূর্ণ। মাঝরাতের হিম হাওয়া উঠোনে ঘুরপাক খেতে শুরু করে দেয় তখন। বিশ্বদীপ সিগারেট লুকোয়। আকাশে গাঢ় কুয়াশার ঘোমটা পড়েনি। ঝিকমিক তারাগুলি দৃশ্যমান। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এই নৈঃশব্দ্যকে বড় কড়া, বড় অসহ লাগে

শুভদীপের। হয়তো বিশ্বদীপ তা টের পেয়ে যায়। আর শুধুমাত্র নীরবতা খণ্ডাতেই বহুবার বলা স্বপ্নের কথা বলতে থাকে আবার। চাকরি পেলেই উঠোনের কোণে একটি স্নানঘর বানাবেই সে। শুধু তাদের জন্য।

তখন মাকে অসহিষ্ণু লাগে। শুভদীপের দিকে মা সরাসরি তাকায়। জোর গলায় বলে, দেবনন্দন শুভদীপেরই বন্ধু। আর প্রস্তাবটাও তারই। সুতরাং দেবনন্দনের সঙ্গে শুচুর বিয়ে দিলে কোথাও কোনও অন্যায় নেই। বলে এবং ভুট্টাদানার মতো উঠোনে ছড়িয়ে দেয়।

শুভদীপ তার পরও তার অমতই প্রকাশ করে শুধু। সে প্রবঞ্চনার কথা বলে। পরিবারের অসম্মানের কথা বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনের গভীরে জেনে যায়, কারও পক্ষে শুচুকে বিয়ে করতে পারার সম্ভাব্যতা সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

এ তারই অক্ষমতা, নাকি এমনই পৃথিবীর মহাসত্য— সে সঠিক ধরতে পারে না। এবং মা তখনই তাকে এই গূঢ় অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেয়। স্বর নিচু করে, চোখ শূন্যে মেলে, প্রায় আত্মগত ভাবে তিন সন্তানের জননী ঘোষণা করে— শুভদীপের এই আপত্তি অবান্তর। অকারণ। ন্যায়-অন্যায়, মানবিকতা-অমানবিকতা, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি ছাড়াও এই বিবাহের একটি বাস্তব দিক আছে। দেবনন্দন শুচুকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে সংসারে একটি পেট তো কমবে। সেই সঙ্গে শুচুর জন্য নিয়মিত ওষুধ, ডাক্তার, হাসপাতাল করার ঝঞ্ঝাট ও প্রভূত ব্যয়ভারের হাত থেকেও কি মুক্তি পাবে না তারা! দেবনন্দনের পরিবারে এমন কেউ নেই যে শুচুর সঙ্গে বিয়েতে বাধা দেবে। অর্থের অভাবও তার হবে না কারণ দেবনন্দনের বাবা-মা তার জন্য গচ্ছিত রেখে গেছে প্রচুর অর্থ এবং একখানি গোটা বাড়ি। শুচুকে সে ভালভাবেই রাখতে পারবে। হয়তো সে আরও ভাল চিকিৎসা করাতে পারবে, যা তারা নিজেরা পারছে না।

মা আরও কিছু বলতে পারত। এমন কিছু— যা শুনলে শুচু আত্মহত্যাও করতে পারত। কিংবা যা শোনা, ভাবা, বলা অন্যায়।

ঘোর অন্যায়। শুভদীপের গলার কাছে যন্ত্রণায় ব্যথা-ব্যথা করে। কিন্তু কিছু বলে না সে। মা আর কী যুক্তি দেয়, শোনার জন্য সে অপেক্ষা করে। কিন্তু বিশ্বদীপ ধমকে থামিয়ে দেয় মাকে। বলে, শুধু শুচু কেন। প্রত্যেকেই তারা এক-একটি পেট। চাল আনতে ডাল ফুরনো সংসারে সকলেই বাড়তি। তারা তিন ভাইবোনই মরে যাক তা হলে। বাবার অবসরভাতার টাকায় বাবার ওষুধ কেনা হলেও মা-বাবার দুটি পেট তাতে চলে যাবে। পেট নিয়ে বেঁচে থাকুক তারা আর শতবর্ষ পার করে দিক।

কঠোরতম এই শব্দসমূহ শুনেও কিন্তু মা তেমনই স্বাভাবিক থাকে। এবং শান্তভাবে একটি আশ্চর্য কথা বলে। বলে যে পেট সকলের থাকলেও এ সংসারে মেয়েমানুষের পেট বড় শত্রু। কারণ তাদের কোনও মূল্য নেই। বিশেষ করে রুগ্‌ণ ও অকর্মণ্য যদি হয়ে থাকে কোনও মেয়েমানুষ— তার মূল্য কানাকড়ি। মেয়েমানুষের হল— যতক্ষণ গতর ততক্ষণ কতর। মানে কদর। সংসারে ব্যয় কমানোর জন্য মা মৃত্যুর কথা বলতে চায়নি। বললে তো পেটের সন্তানদের ভার লাঘব করার জন্য সে নিজেই আগে গলায় দড়ি দিত। কিন্তু সে তা করেনি। মৃত্যুর মধ্যে কোনও কল্যাণ থাকে না কখনও। কল্যাণ মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার মধ্যে। সুতরাং, মৃত্যু নয়, মা বাস্তবে উপস্থিত একটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছে মাত্র।

শুভদীপ বিশ্বদীপের দিকে তাকায়। বিশ্বদীপ তাকে মেনে নিতে ইশারা করে। কিন্তু শুভদীপ তখন সকলের ব্যাখ্যা অমান্য করে শক্ত হয়ে যায়। তার কপালের শিরা দপদপ করে। সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হিসেবে যে মনে মনে মৃত্যুকেই নির্বাচন করেছে তার পক্ষে মৃত্যুর বিরুদ্ধে এইসব সওয়াল সহ্য করা সম্ভব হয় না। সে অসহিষ্ণু ঘোষণা করে শুচুর অকালমৃত্যুর সম্ভাবনার কথা। যে-কথা সকলেই জানে এবং ভুলে গেছে, তার কথা আবার মনে করিয়ে দেয় সে।

মা কোনও কথা না বলে কেঁদে ফেলে হঠাৎ। তার স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে কেঁদে ফেলে। বিশ্বদীপ তুলসীমঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়ায়। দৃঢ় প্রশ্ন ছুড়ে দেয় শুভদীপের দিকে। কোনও মানুষ মারা যাবে যে কোনও

সময়— জানা গেলে— সারাক্ষণ তার পরিপার্শ্বে মৃত্যুরই আয়োজন রাখা যুক্তিযুক্ত, নাকি জীবনের!

শুভদীপ জবাব দেয় না। সভা ভেঙে ঘরের দিকে যায়। মা আঁচলে চোখ মুছে তাকে অনুসরণ করে। খেতে দিতে হবে। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরেছে অভুক্ত ছেলেটা। বিশ্বদীপ তাদের অনুসরণ করে বলতে বলতে ঢোকে। কোনও মানুষেরই কি শেষ পর্যন্ত জীবনের নিশ্চয়তা আছে? কেউই কি বলতে পারে, সে বেঁচে থাকবে ভরা আয়ুষ্কাল? একটি সুস্থ শরীরের মধ্যে যে বাসা বেঁধে নেই কোনও মারণরোগ— কে দিতে পারে তার নিশ্চিত ভরসা?

সে উদাহরণ দিতে থাকে। হঠাৎ ধরা-পড়া কর্কটরোগ, দুর্ঘটনায় মরে যাওয়া বাবা আর মেয়ে, দু'কিলো পটল কিনতে গিয়ে সন্ন্যাসরোগে ঢলে পড়া পাড়ার হরজ্যেঠু...

শুভদীপ কথা বলে না। শুনতে শুনতে বিছানায় পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে নেয়। মা হাতে খাবার তুলে দেয়। তিনটে রুটি আর ডাল। ডালে পেঁয়াজ কুচি, লংকা। সে থালা নিয়ে কাগজে রাখে। মা গজর-গজর শুরু করে। বিশ্বসংসারে সমস্তই শকড়ি হয়ে গেল এমনই উষ্মা। এবং যে সংসারে সমস্তই শকড়ি হয়, কে না জানে, সে সংসার উজায় না কখনও।

শুভদীপ মায়ের নিত্য-নৈমিত্তিক গজগজানি উপেক্ষা করে খায়। রুটি ছেঁড়ে। মুখে দেয়। তার পেট ভরে না। সে আরও রুটি চায়। এবং চাইতে চাইতে সে খবরের কাগজের পুরনো হলদে খবর পড়ে। মা তখন রুটি নেই জানায় এবং ইনিয়ে-বিনিয়ে নিত্যকার অভাবের কথা শুরু করে। আটা বাড়ন্ত, চাল বাড়ন্ত। এমনকী রোজগেরে ছেলের পাতেও সে তুলে দিতে পারল না পরিমাণ মতো রুটি। আর এই অভিযোগের মধ্যেও মা বিয়ে বিষয়ে তার আপত্তির কথা তোলে। এবং একই সুরে বলে যায়, দেবনন্দন বাড়ির জামাই হতে পারলে দরে-দরকারে, ঠেকায়-বেঠেকায় তার কাছ থেকে কিছু ধার করে নেবার সুবিধা অন্তত পাওয়া যায়।

সে মায়ের দিকে তাকায়। বিশ্বদীপ পাশে শুয়েছিল। চোখ বন্ধ করে আছে। হয়তো তার আর এ বিষয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না। সে মায়ের মুখ দেখে আর অবশিষ্ট ডালে চুমুক দেয়। তার মনে হয়, ভদ্রতাবোধের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মা। তার রাগ হয় না। ঘৃণাও জাগে না কোনও—যা এখন বড় বেশি হয়ে উঠেছে তার মধ্যে। সে মাকে উপলব্ধি করে। দীর্ঘদিন অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে, দারিদ্র-পীড়নে, অনিশ্চয়তায় ও নিরাপত্তাহীনতায় মরিয়া হয়ে উঠেছে মা। এবং কিছু একটা অবলম্বনের জন্য দেবনন্দনকেই আঁকড়ে ধরেছে। সে জানে, মা যেমন ভাবছে তেমন সঙ্গতি দেবনন্দনের নেই। দানছত্র শুরু করলে বরং সে-ই বিপদে পড়বে।

সে তবু মার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করে না। কিন্তু বিয়ে সম্পর্কে নিজস্ব প্রতিরোধ জারি রাখে। আর ভাবতে থাকে মালবিকাকে দিয়ে দেওয়া তিনশো টাকার কথা। তিন-শো-ও-ও-ও-ও! একটুকরো হিমবায়ু শোঁ-শোঁ ঢুকে পড়ে বুকের মধ্যে। আর ঠিক তখনই মা প্রশ্ন করে। অভিযোগ ও অভাবের পর্ব বাদ দিয়ে অমোঘ প্রশ্ন করে ওষুধ কোথায় রাখা আছে। ওষুধ নাও কেনা হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা তার মনে আসে না। সে মাথা নাড়ে। আনেনি। মা তার মাথা নাড়াকে বিশ্বাস করতে পারে না। ওষুধ বিষয়ে সে সর্বদা নিয়মানুবর্তিতা অভিব্যক্ত করেছে। একবারের বেশি দু'-বার তাকে কিছু বলতে হয়নি। সুতরাং মা বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। মুখের হাঁ বন্ধ করতেও ভুলে যায়। সে মায়ের বিস্ময়ের পাশ কাটিয়ে উঠে পড়ে। থালা নামিয়ে রাখে গ্যাসের টেবিলের তলায়। বিস্ময় সামলে মা তখন অবধারিত ওষুধের টাকা ফেরত চায়। সে জানায় খরচ হয়ে গেছে। কাল সে-ই ওষুধ এনে দেবে এমন প্রতিশ্রুতিও দেয়। হয়তো অনেক রাত হয়ে গেছে বলেই মা তাকে ক্ষমা করে দেয় দ্রুত। এবং জানাতে ভোলে না—চাল, ডাল, আটা, চিনি বাড়ন্ত। দেবনন্দনের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হয়েছে। নইলে এবেলা কেবল রুটি আর নুন খেয়ে থাকতে হত।

শুরু হয়ে গেছে, সে ভাবে, দেবনন্দনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া

শুরু হয়ে গেছে। তার মনে হয়, অতি ধীরে এবং নিঃশব্দে নৈতিক অধঃপাত ঘটে যাচ্ছে তাদের পরিবারে। আর এতদ্‌সত্ত্বেও ঘুম নেমে আসে তার চোখে। দ্রুতি ও গভীরতাসহ এক আশ্চর্য ঘুম।

৬

মুক্তি। শেষ কথা হল মুক্তি। শরীরের মুক্তি মৃত্যুতে। আত্মার মুক্তি মায়াপ্রপঞ্চজাল ছিন্ন করে যাওয়ায়। এই যে বিশাল অনিত্য জগৎ, এই জরা ও বিনাশময় পৃথিবী, আর অনিত্য পৃথিবীর প্রতি এই যে দুরপনেয় টান—তারই নাম মায়া। অনিশ্চয়তার ভোজবাজি। এই ভোজবাজির মধ্যে দিয়ে আত্মাকে টান ছিন্ন করতে করতে যেতে হয়। যত ক্ষয়, যত ক্ষতি হতে থাকে তার, তত সে বন্ধনহীন।

এ এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা। আত্মা মুক্ত হতে হতে স্বয়ং উপলব্ধি করে, সে কেউ নয়, কিছু নয়। এক ব্যাখ্যাতীত শক্তির প্রতিবিম্ব মাত্র। সত্য নয়। সত্তা নয়। তুমি নয়, আমি নয়। শরীর ধারণ করলেই তুমি-আমি। শরীর পুড়ে গেলে, মাটিতে মিশে গেলে ভূত নেই, ভবিষ্য নেই, নেই বর্তমান, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব সমস্ত আত্মাই তখন মিলেমিশে একাকার। জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, লয় নেই, ক্ষয় নেই। শত্রু নেই, মিত্র নেই। শুধু এক অখণ্ড অস্তিত্ব সদাজাগরণে।

এই কথা ভেবে কোনও সান্ত্বনা মেলে না কারও। এ ব্যাখ্যা এক সামান্য পরিতোষ। চিত্তানুভূতির সামান্য সংশোধন। যতক্ষণ পবিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ছাপা থাকে— ততক্ষণ পরমাত্মারই মতো সুন্দর, অনির্বাণ।

সে ভাবতে ভাবতে যায়। যদি তার মৃত্যু হয়, যদি সে অনিবার্য স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করে তবে তার আত্মা দেহবন্ধনহীন অসীম বিস্তারে যাবে। সে তখন কোনও শুভদীপ নয়। তার কোনও দায়বদ্ধতা নেই। মায়া-মমতা, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় নেই। সে তখন হয়তো-বা নেই হয়েও এক বিশাল আছে।

সে ভাবতে ভাবতে জনপদ ধরে এগোয়। শহরের এক ঘনবসতি ও প্রাচীন অঞ্চল। সে নস্করদের বাড়ির প্রবীণ পরির দেহভাঁজ দেখে আর পা ফেলে ফেলে এগোয়। এইসব বনেদি বাড়িতে নগ্ন পরিরা উড়ে এসে বসত, আর যেত না কোথাও। স্থির হয়ে থাকতে থাকতে তারা এখন পাথর। কারও নাক টুটে গেছে। কারও ডানা ভাঙা। তবু ঠোঁটে লেগে আছে হাসি। সে মনে মনে পরিদের খোলা, সাদা, মসৃণ বুকে মুখ রাখে আর সুন্দরী মৃত্যুকে কামনা করে আবার। এবং সহসাই তার মনে পড়ে, তাদের পরিবারে মৃত্যুকে জড়িয়ে বসে আছে আরও দু'জন।

সে ফলের দোকান, মাছের দোকান, ফুল, বাসন, খেলনার দোকান পর পর পেরিয়ে যায়। তার চোখে পড়ে ঘনিষ্ঠতা, চোখে পড়ে বিরাগ। চোখে পড়ে নোংরা মাখা শিশু আবর্জনা ঘেঁটে তুলে নিচ্ছে খাবার। শিশুর আগমন সম্ভাবনায় ভারী-পেট মা ফুল আর মালা বিক্রি করছে পা ছড়িয়ে বসে। মুরগি কাটছে ছেলেটি আর ছাল ছাড়াচ্ছে অনায়াসে, পাশেই পাঁঠার মাংস ডুমো ডুমো কাটছে বন্ধু তার। সার সার ছালছাড়ানো দেহ প্রলম্বিত। স্তম্ভিত মাথাগুলি স্থিরচোখে চেয়ে আছে অনুযোগহীন। আর গান বাজছে, মুরগি ও পাঁঠার দোকানে গান বাজছে একযোগে। একই গান বেতারে চালিয়ে দিয়ে তন্ময় শুনছে— পল পল দিল কি পাস, তুম রহতি হো...।

এই এত জনবসতি, ঘর-সংসার, তার শুচুকে মনে পড়ছে। শুচু কি ঘর পেলে, সংসার পেলে সুখী হবে? তৃপ্ত হবে? মৃত্যুর আগেও কি জীবনের স্বাদ নেবে আকণ্ঠ? নিতে পারবে?

এত দিন সে মনে করত প্রেম-ভালবাসা আসলে যৌন আগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। এর ওকে দেখে ভাল লাগল আর মনে হল ওর একে ছাড়া চলবে না। বৃথা এ জীবন। এই টান, এই না-চলা আসলে যৌনাকাঙ্ক্ষা যা একজনের অন্যজনকে দেখে জাগে। কোনও অজ্ঞাত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জাগে এবং লিপ্সা সার্থক না হওয়া পর্যন্ত চাঞ্চল্য থেকে যায়।

শুচুর কি যৌনবোধ আছে? এত অসুস্থতার মধ্যে না থাকাই সম্ভব। আবার থাকে যদি তবে দেবনন্দন সম্পর্কে তার আকাঙ্ক্ষা জাগতেও

পারে। কিংবা তার কোনও রাসায়নিক আবেগের উৎসার নেই। সে শুধুই, মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়, এমনই ধারণার গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়েছে মাত্র। কিন্তু যদি এমন হয় যে শুচুর যৌনবোধ নেই। কিন্তু প্রেম আছে? তা হলে? শুভদীপের ব্যাখ্যা তবে অচল হয়ে যায়। এমনকী দেবনন্দনকে সে কোনও ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না নিরন্তর বিশ্লেষণের পরও। সুস্থ, স্বাভাবিক, সবল দেবনন্দন কী করেই বা শুচুর প্রতি আকৃষ্ট হয়? নীলচে, ক্ষয়াটে, শীর্ণ শুচুকে দেখে কী ভাবেই-বা তার যৌনভাব আসে? হিসেব পায় না সে। তল পায় না। শুচুর মুখ তার মনে পড়ে। বড় বড় চোখের নীচে কালি-পড়া। শিরা-ওঠা হাত ও কণ্ঠ। দু'ঠোঁটের পাশে, গালে জরার হস্তক্ষেপ।

যন্ত্রণা পেতে পেতে যন্ত্রণাকেই শ্বাস-প্রশ্বাসে নিয়ে নেওয়া সে, শুচুর কারণে অনুভব করেছে এক নতুনতর যন্ত্রণা। আজই সকালে।

পারিবারিক প্রেম ও সম্প্রীতিকে সে ব্যাখ্যা করেনি কখনও। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বা মায়ের প্রতি মেয়ের গাঢ় অবিচ্ছেদ্য টানকে সে গ্রহণ করেছে চিরসত্যে। এর মধ্যে যৌনতা নেই কোথাও, অবিশ্বাস বা অসম্ভাব্যতা নেই কোথাও। পারিবারিক দায়দায়িত্বকে তার মনে হয়েছে আরোপিত কিন্তু সম্প্রীতিকে নয়।

সে কারও সঙ্গে তার এই মত বিনিময় করেনি। কারও বিপরীত যুক্তি দ্বারা আপন যুক্তির খণ্ডন প্রত্যক্ষ করেনি। সুতরাং পবিত্রতার ও সত্যের সবটুকু আলো সে পারিবারিক স্নেহে-প্রেমে-ভালবাসায় প্রক্ষিপ্ত করে অনাত্মীয় মানব-মানবী সম্পর্ককে দেখেছে শুধুই অশ্রদ্ধেয় যৌনতায়। এই যৌনতাকে সে অস্বীকার করেনি। কিন্তু যৌনতাসম্ভবের মানদণ্ড হিসেবে নির্বাচন করেছে শারীরিক সৌন্দর্য। এমনকী নিজের বোনকে পর্যন্ত এই মানদণ্ডের বাইরে রাখেনি সে।

আজ সকালে শুচুই তার চা এনেছিল।

মূল দরজা পেরিয়ে তাদের যে একফালি বারান্দা, যেখানে সুবল থাকে আর তাদের জুতো রাখা হয়, সেই সঙ্গে ছেঁড়া কাপড়ের বাক্স, গ্যাসের সিলিন্ডার, ঝাড়ু ইত্যাদি— তারই একপাশে মোড়া পেতে সে খবরের কাগজ পড়ছিল।

এই কাগজ রাখা নিয়ে মা আপত্তি তুলেছে অনেকবার। সে শোনেনি। টিভিতেই তো সারা দুনিয়ার খবর পাওয়া যায়। তা হলে আর পয়সা খরচ করে খবরের কাগজ রাখা কেন! এমনই বক্তব্য মা-র। সে শুনেছে বহুবার। কিন্তু তর্ক করেনি। সেই কোন ছোটবেলায় খেলার খবরের টানে কাগজ পড়া অভ্যাস হয়েছিল। পুরু মাখন লাগানো পাউরুটি দিত মা। সে অন্যমনস্ক ভাবে পাউরুটিতে কামড় দিয়ে মুখভর্তি মাখনের স্বাদ নিতে নিতে পড়ত। ধীরে ধীরে মাখনের ঘনত্ব কমতে লাগল বাড়িতে। একদিন শুধু পাউরুটি হয়ে গেল। তারপর তা-ও আর রইল না। রুটি এল। সে এখন কাজে বেরোয় বলে সকালেই ভাত খেয়ে নেয়। অন্যদের সকালে-রাতে রুটি। দুপুরে ভাত। মাত্র একপদের রান্না। সে-রান্না হতে পারে এমনকী শুধুই আলুসেদ্ধ।

এত কিছুই ছেড়েছে সে। এত কিছুই অভ্যাস করেছে। কিন্তু কাগজ পড়া ছাড়তে পারেনি।

তার সেই প্রিয় অভ্যাস সে যাপন করছিল সকালে। তখন শুচু তার চা নিয়ে আসে। আর একটি মোড়া টেনে বসে পড়ে পাশে। কিছু কথা আছে তার— জানায়। সে সহজেই বুঝে ফেলে শুচু দেবনন্দন বিষয়ে বলবে। এবং শুচু তাই বলে। কোনও ভণিতায় না গিয়ে তাকে সরাসরি অনুরোধ করে, সে যেন বিয়েতে আপত্তি না জানায়। সে চুপ করে আছে দেখে ব্যাখ্যা করে যায়। অবিকল মায়ের সুরে, অবলীলায় বলে— তার বিয়ে হলে সংসার থেকে একজনের বোঝা তো নেমে যায়।

এ কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না সে। বরং ভেবেছিল শুচু পবিত্র প্রেমের দোহাই দেবে। সে জানে না কেন, তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া মা বলেছিল একটা পেট তো কমে যায়। এখন স্নাতক শুচু বলছে একটি ভার কমে। অর্থ এক। অভিব্যক্তি আলাদা।

সে চুপ করে থাকে। খবরের কাগজ থেকে মুখও তুলতে পারে না। ভাবে, কেন এরকম বলছে শুচু। সে কি মায়ের বলা কথাগুলি শুনেছিল কাল? নাকি মা সরাসরি শুচুকেও বলেছে এমন? মা কি

এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে? হতে পারে এতখানি নির্মম, স্বার্থপর? সে সরাসরি প্রশ্ন করে বসে, মা কিছু বলেছে কি না। শুচু জিভ কাটে আর তার নীল জিভ দৃশ্যমান হয়। মা এমন বলতেই পারে না। সে নিশ্চয়তা দেয়। এবং বলতে থাকে আরও। সংসারের পরিস্থিতি সে কি উপলব্ধি করছে না? সে তো সহায়তা দিতে পারছে না এতটুকু। শুধু, কোন ছোটবেলা থেকে ব্যয়সঙ্কুল হয়ে বসে আছে।

সে জানে বিশ্বদীপ মিঠুকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায়। সে, অতএব, উপায় আছে যখন, আর বোঝা হয়ে থাকতে চায় না।

শুভদীপ ভেবেছিল, একবার জিজ্ঞেস করে, যার কাছে যাবে শুচু, বিয়ে করে, সে যদি বোঝা ভাবে স্বয়ং? কিন্তু সামলে রাখে নিজেকে। দেবনন্দনের সততা ও ভালত্ব সম্পর্কে তার দ্বিধা নেই কোনও। অতএব সে দেবনন্দনকে অপমান করতে চায় না। কিন্তু নতুন করে সে উপলব্ধি করে পরিচিত জগৎ-সংসারের অদ্ভুত নিয়ম। জন্ম থেকে আজ অবধি এই পরিবারে প্রতিপালিত শুচু নিজেকে এখানে বোঝা মনে করছে। যেন এ পরিবারে চুক্তি ছিল তার। মেয়াদ ফুরিয়েছে। এমনকী জন্মদাত্রী মাও মনে করছে এমন।

নতুন কোনও পরিবারে গিয়ে, আবার নতুন করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে সে। সেই প্রতিষ্ঠায় কোনও গ্লানি নেই, বরং সম্মান আছে। কারণ হাজার বছর আগে মানুষ এমনই একটি রীতি প্রচলিত করেছিল।

শুচু চলে গেলে মিঠু আসবে। এক মেয়ে যাবে। অন্য মেয়ে আসবে। শুধু পুরুষেরা স্থির। তারা বিনিময় হয় না কখনও। তাদের পরিবার পরিবর্তন নিন্দিত। ঘৃণার্হ। পুরুষেরা সূর্যেরই মতো থেকে যাবে অবিচল আর মেয়েরা তাকে ঘিরে আবর্তিত হবে।

শুচু তখন উঠে গিয়েছিল পাখির খাঁচার কাছে। খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে সুবলের মাথায় হাত বুলোচ্ছিল সে। গাইছিল। সরু কণ্ঠে গাইছিল। শুভদীপের অপার্থিব লাগছিল সমস্ত পরিস্থিতি। অসহ্য লাগছিল। এই গান ও গেয়েছে আগেও। কিন্তু তার এরকম লাগেনি কখনও। খাঁচার ধাতুগুলিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে ফিরে আসছিল শব্দগুলি।

ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি
খিদের থেকেও স্পষ্ট
কাজের মধ্যে অকাজ খালি
মনের মধ্যে কষ্ট
স্বপ্ন হয়ে যখন তখন আঁকড়ে আমায় ধরো
তাই তো বলি আমায় বরং ঘেন্না করো
ঘেন্না করো

তার অসার লাগে এইসব নিয়ম। অর্থহীন অসহ্য লাগে। পরিবারে প্রত্যেকেরই জন্মগত অধিকার নয় কেন! এমনকী মানসিকতাও নিয়ন্ত্রণ করছে এই সব নিয়ম! সমস্ত কিছুর মধ্যেই লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন। ইস্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, যানবাহন, পোশাক, চাকরি, পথ ও সময়, বিধান ও রীতি-নীতি—সমস্ত, সমস্তই। পুরুষ ও নারীর আলাদা আলাদা শৌচালয়ের মতো। কিংবা এই পৃথিবী, এই গোটা পৃথিবী, এবং এই সমাজ—যার প্রত্যেকটি রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের মানসিক সংগঠন—আসলে এক শৌচাগার মাত্র। এক বৃহৎ, বিপুল বিস্তৃত শৌচাগার।

৭

গভীর ভাবনা তাকে পথ চলা বিষয়ে অন্যমনস্ক করেছিল। সে দেখতে পায়নি একটি উঁচু ও বিশাল দরজা খুলে যাচ্ছে এবং তার ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে। অতএব সে এক ভারী ধাতব আঘাতে ছিটকে পড়ে মাটিতে। চশমা খুলে হারিয়ে যায়। ব্যাগ আছড়ে পড়ে। কপালে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে সে, আর তার দৃষ্টিপাত অন্ধকার সংসর্গে লিপ্ত হয়।

পরে সে শুনেছিল পাঁচ মিনিট তার জ্ঞান থাকেনি। বা গোটা সময়টা ধরলে দশ মিনিটই হবে।

বিশাল ভারী ধাতব দরজা খোলার সময় এক চিৎকৃত সাবধানবাণী

শুনতে পায়নি সে। এবং ধাক্কা খেয়ে অনিবার পড়ে গিয়েছে। তখন লোকবাহিত হয়ে সে সেই দরজারই ভিতরে প্রবেশ করে এবং দরজা আবার বন্ধ হয়ে যায়।

একটি ছোট দপ্তরখানায় সে শুয়ে ছিল যখন তার জ্ঞান ফেরে। নিচু ঘরটির কাঠের জানালা গলে আলো পড়ছিল তার মুখে।

দপ্তরখানা না বলে একে কারও বাসস্থানও অনুমান করা যায়। কারণ সে শুয়ে আছে একটি রীতিমতো বিছানায়। দেওয়ালের হুকে ঝোলানো দেখতে পাচ্ছে শার্ট-প্যান্ট। আবার দুটি আলমারি তার পায়ের দিকে। ফাইলে ঠাসা। সে অনুমান করে, একটি চেয়ার টেবিলও থাকবে নিশ্চয়ই। একটি টেবিল-আলো।

তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন। কিন্তু প্রায় মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটি মুখ। নিখুঁত দাড়িগোঁফ কামানো মেদবহুল মধ্যবয়সি মুখ। ভাঙা-ভাঙা বাংলায় সেই মুখ জানতে চায় ব্যথা করছে কি না। সে তখন কপালে ব্যথা অনুভব করে। মাথা তুলতেই মাথার মধ্যে ব্যথার ঝনঝন। সে মাথা নামিয়ে নেয় বালিশে আর শুনতে পায় মানুষগুলি হাত-মুখ নেড়ে সমবেতভাবে তাকে উঠতে বারণ করছে। সে তখন চশমার খোঁজ করে। ব্যাগ কোথায় জানতে চায়। একজন তাড়াতাড়ি চশমা এনে তার বালিশের পাশে রাখে। আরেকজন ব্যাগ তুলে তাকে দেখায় এবং নিশ্চিন্ত করে। বাইরে থেকে ভেসে আসে কুকুরের হিংস্র গর্জন।

একটি লোক বরফকুচি ভর্তি পাত্র এনে সেই মধ্যবয়সির হাতে দেয়। তিনি একটি রুমালে কুচিগুলি বেঁধে নিয়ে চেপে ধরেন তার ব্যথাদীর্ণ কপালে। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বালা টের পায়। আঘাতে থেঁতলে গেছে কপাল। সে ভ্রূ কুঁচকোয়। মধ্যবয়সি ইংরিজিতে বলেন, বরফকুচিতে সে সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যেই হয়তো আরাম পাচ্ছে সে।

সে ক্লান্ত বোধ করে। একবার চোখ বন্ধ করে। চুপ করে থাকে। খোলে আবার। দেখে মধ্যবয়সির ব্যগ্র উদগ্রীব মুখ। সেই মুখ দুঃখপ্রকাশ করে। অনিচ্ছাকৃত আঘাত দেবার কারণে তাঁর যেন

অনুশোচনার অবধি নেই। সে মৃদু হাসে। মানুষটি নাম বলেন। জন। কথা বলতে বলতেই বরফের শুশ্রূষা চালিয়ে যান তিনি। তার কপাল বেয়ে বরফগলা জল গড়িয়ে চুলে লেগে যায়। কিছু-বা বালিশ ভিজিয়ে ফেলে। এবার শুভদীপের নাম জানতে চান তিনি। বাড়ি কোথায় জানতে চান। সে নাম বলে। বাড়ি কোথায় বলে না। বরং উঠে বসতে চায়। জন তাকে শুইয়ে দেন আবার। বলেন, সে আহত। তার চিকিৎসা ও বিশ্রাম দরকার। তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব আসে। অথবা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মাথায় সাংঘাতিক কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে এমন নয়। আজ তার অনেক কাজ। অনেকগুলি বিজ্ঞাপন তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

জন, চারপাশে ভিড় করে থাকা লোকজনকে কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তারা চলে যায়। শুভদীপ জানতে চায় সে কোথায় আছে। মধুর হাসিতে মুখ ভরে যায় জনের। সে অত্যন্ত পুণ্যবান বলেই এখানে আসতে পেরেছে বলেন তিনি। যে-কোনও ব্যক্তি এখানে প্রবেশানুমতি পায় না। মুখে রহস্য মেখে প্রশ্ন করেন তিনি, শুভদীপ নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভ কী তা জানে কি না। নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভ। Tower of silence।

নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভ। Tower of silence। শুভদীপ শোনেনি কখনও। বরফকুচির শুশ্রূষা দিতে দিতে জন শোনান তখন। Tower of silence। নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভ। পার্শি সম্প্রদায়ের পরমগতির স্থল। মৃত্যুর পর চরম প্রার্থিত শান্তি।

তার আবছা মনে পড়ে। পার্শিরা মরদেহটি পাখির আহারের জন্য দান করে। তার সঙ্গে নৈঃশব্দের স্তম্ভ কীভাবে সম্পর্কিত!

জন তার প্রশ্ন উপলব্ধি করেন। ব্যাখ্যা করেন তিনি। Tower of silence। একটি উঁচু স্তম্ভ—যেখানে কোনও মৃত পার্শির মরদেহ রাখা হয় শেষকৃত্যের জন্য। সে চোখ বিস্ফারিত করে। কল্পনা করার চেষ্টা করে দৃশ্যটি। এবং শিউরোয়। কিন্তু মানুষটির মুখে তৃপ্তির বিচ্ছুরণ দেখে সংযত হয় সে। পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে মৃতদেহ খাচ্ছে—এ দৃশ্য

দৃষ্টিসুখকর নয়। কিন্তু মানুষের শরীর—প্রিয়জন, বাবা-মা-ভাই-বন্ধু-সন্তানের শরীর পুড়ে যাচ্ছে। মাথার খুলি ফেটে যাচ্ছে, রক্ত-মাংস পুড়ে গুটিয়ে দলা পাকিয়ে উঠছে, শব্দ উঠছে ফট্‌-ফট্‌—এই বা কী নয়নলোভন। সে শান্ত থাকে অতএব। শুয়ে শুয়ে জনের কথা শোনে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয়—জন মধ্যবয়সি নয়, যেন বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ। গভীর বয়স তাঁর ত্বকের গভীরে আছে।

Tower of silence-এর দেখাশুনো করেন জন। রক্ষণাবেক্ষণ করেন। করছেন সেই আঠারো বছর বয়স থেকে পঁয়ত্রিশ বছর। এখানেই তাঁর যৌবন এসেছে। চলে গেছে। এখানেই তাঁর চুলে লেগেছে পাক। এখানেই তিনি থেকেছেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এবং এই উঁচু প্রাচীর-ঘেরা জায়গাটির বাইরে যে জগৎ—তার সম্পর্কে হারিয়েছেন সব টান। সব তৃষ্ণা। বাইরে গেলে এখন তাঁর প্রাণ ছটফট করে। দম বন্ধ হয়ে আসে। কতক্ষণে ফিরে আসবেন এই শান্তিস্থলে—এমনই মনে হয়।

এখানকার বহু গাছ তাঁর হাতে লাগানো এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা। এখানকার সব ফুল-পাখি-প্রজাপতি-কীট ও পতঙ্গদের তিনি চেনেন আপনজনের মতো। দু'খানি কুকুর আছে, তাদের স্নান করানো ও খাওয়ানো—সারাদিনে তাঁর এটুকুই হাতে-কলমে কাজ। বাকিটা তত্ত্বাবধান।

মা-বাবা মারা গিয়েছেন তাঁর শৈশবেই। চার ভাইবোনের মধ্যে ছোট জন। বোন সংসারে থিতু। দাদারা বড় ব্যবসায়ী। তিনি তাই পিছুটানহীন। অনায়াসে চলে এসেছেন শান্তিস্থলে। এই Tower of silence—এই শান্তিস্থল—এই কোলাহলপূর্ণ শহরের মধ্যে থেকেও যেন পরিপূর্ণ নীরবতাময়। বাইরের সব শব্দ এর উঁচু উঁচু প্রাচীরগুলিতে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। এবং ভেতরকে শান্তিময় রাখে। এই শান্তির জন্য, নৈঃশব্দ্যের জন্য, তিনি নিবেদিতপ্রাণ। এমনকী যৌবনে বিয়ে করার কথাও মনে হয়নি তাঁর।

এই উঁচু প্রাচীরময় স্থানেই তাঁর থাকা। তাঁর জীবন। বহুজনের শেষ শান্তি দেখতে দেখতে, বহু পরিবারের শোক-সন্তাপের সঙ্গী হতে হতে

আজ তাঁর আত্মীয় শহরময়। এমন কোনও পার্শি পরিবার নেই যারা জনকে চেনে না। এমন কোনও পার্শি পরিবার নেই এ শহরে, যার কোনও-না-কোনও সদস্যের শেষযাত্রায় জন সঙ্গী থাকেননি।

মাঝে মাঝে যখন পথে বেরোন, দেখতে পান, কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে এই শহর। জনবসতি হয়েছে আরও ঘন। যানবাহন হয়েছে আরও থিকথিকে। শব্দ হয়েছে অনেক বেশি বিবদমান। বাতাসে ধোঁয়া-ধুলো-ময়লার পুরু স্তর। গাছের পাতার সবুজ রং ঢাকা পড়ে যায়। আকাশ থাকে না নীল।

এখান থেকে বিবর্ণ আকাশ তিনি দেখতে পান। কিন্তু এই বিশাল ক্ষেত্রে, উঁচু প্রাচীর ঘেরা, বৃক্ষমণ্ডিত এই পরিবেশে, শেষযাত্রার এই শান্তিভূমিতে ধোঁয়া-ধুলো-আবর্জনা নেই। শব্দ নেই। বিবদমান শব্দ নেই। ধ্বনি নেই এমন যাতে মস্তিষ্ক ভেদ করে তির চলে যায়।

শুভদীপ উঠে বসে এবার। তার কিছুটা সুস্থ লাগছে। বিস্ময়ে অভিভূত সে এখন। এত ঘুরেছে সে এ শহরে, এত গিয়েছে এই রাস্তায়, কিন্তু Tower of silence-এর অস্তিত্ব জানে না। সে পুরো জায়গাটি ঘুরে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে। জন সানন্দে রাজি থাকেন। কিন্তু জানিয়ে দেন, সে যেন Tower of silence-এ যাবার ইচ্ছে প্রকাশ না করে। জন এবং মৃতের আত্মীয় ছাড়া আর কারও সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

সে রাজি হয়। বিছানা থেকে নামে। আর তার নামার সময় জন তার কাঁধ ধরে থাকেন। তার মাথা ঘুরে যায়। মাথায় এমনকী যন্ত্রণাও অনুভব করে সে। কপালেও। কিন্তু প্রকাশ করে না। শরীরের কোনও যন্ত্রণা, কোনও বৈকল্যই প্রকাশ করে না সে। ঘরজোড়া রোগ ও ওষুধগন্ধে নিজেকে জড়াতে চায় না।

সে জনকে ধন্যবাদ দেয়। চশমা পরে। জল চায় খাবার। জন কারওকে জল আনতে আদেশ করলে সে জুতো পরতে থাকে। সে বিস্মিত হয়। কে তার জুতো খুলে দিল। পায়ে হাত দেওয়া সম্পর্কে আজন্মকালের এ সংস্কার তাকে বিচলিত করে। জনের দিকে তাকিয়ে তার গতকালের সেই মুসলমান ভদ্রলোককে মনে পড়ে। কেন মনে পড়ে সে বুঝতে পারে

না। জনের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল না কোনও। তবু এই সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি সংযোগ আছে বলে মনে হয় তার।

গতকাল সে এক কবরখানায় ঢুকেছিল। আজ সে চলে এসেছে অন্য এক মৃত্যু-আয়োজনে। যেন কোন অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক তাকে এভাবেই চালিত করছে এখন। সে ঈশ্বর মানেনি কখনও। নিজস্ব যুক্তিবোধ দ্বারা সমস্ত কার্যকারণের পেছনেই এতকাল মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে দেখে এসেছে সে। প্রকৃতির ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করেছে। ঈশ্বর মানার জন্য পুজো-পাঠের জন্য মাকে, শুচুকে এবং চন্দ্রাবলীকেও তিরস্কার করেছে সে। অথচ এখন তার মনে হচ্ছে সে সারাক্ষণ আপন ইচ্ছার বশে নেই। অন্য কেউ, অন্য কিছু তাকে চালিত করছে। এই বোধেরই নাম ঈশ্বর কিনা সে জানে না। এমনকী সে জানে না মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষিত তার চিত্ত দুর্বলতার বশবর্তী হল কি না।

জনের সঙ্গে বেরিয়ে আসে সে। তার রোমাঞ্চ হয় কেমন। কেমন গা-ছমছমে ভাব। সে যেন ক্রমে দেখে নিচ্ছে মৃত্যুর কাছে তার পৌঁছনোর আগেই—দেহের পরিণতিগুলি। মানুষের অন্তিম লগ্নের প্রভূত, বিপুল ও বিচিত্র আয়োজন। সে চাক্ষুষ করে নিচ্ছে। অনুভব করে নিচ্ছে। মৃত্যু মানে এ দেহেরই মৃত্যু। নশ্বর দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যচ্ছে অবিনশ্বর আত্মা আর জড়পদার্থে তৈরি শরীর মিলিয়ে যাচ্ছে জলে, মাটিতে, হাওয়ায়।

জনের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যায় সে। এতক্ষণে জনকে সে সম্পূর্ণ দেখতে পায়। খর্বকায় কিন্তু বিপুলপ্রস্থ জন থপ থপ হেঁটে যাচ্ছেন। কিছুটা হেলেদুলে। চোখে মুখে লেগে আছে প্রশান্ত আবেশ। কথা বলছেন। এ শহরে পার্শি পরিবার হাতে গোনা। তাই বন্ধনও প্রগাঢ়।

শুভদীপ কিছু শোনে, কিছু শোনে না। দেখতে থাকে এই বিশাল বাগান। ঋজু বৃক্ষে ভরা। অথচ পাতা পড়ে জঞ্জাল হয়ে নেই। সবুজ ঘাসের গায়ে যত্নের ছোপ। পাখির গান ও কলরব শোনা যাচ্ছে নিরন্তর। গতকালও কবরস্থানে এই কলরব সে শুনেছিল। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছিল বলে সেই রবে ক্লান্তি মেশা ছিল। এখন এই ডাক অনেক বেশি সতেজ, সমুজ্জ্বল।

নানারকম ফুলের গাছেও ঝলমলে এই বাগান। সে ফুল দেখার জন্য দাঁড়ায়। জন কর্মরত মালি ইত্যাদি কর্মীর সঙ্গে কথা বলেন। তার দৃষ্টি ঝাপসা লাগে। চশমা খোলে সে। ধুলো ও হাতের ছাপে ময়লা হয়ে আছে পরকলাদ্বয়। সে মুছে নেয় রুমালে। আর মুছতে মুছতে ডাঁটি দু'খানি নজর করে। ভাঙেনি দেখে আশ্বস্ত হয়।

এই চশমা। চন্দ্রাবলীর উপহার দেওয়া চশমা। ঘুরতে ঘুরতে, জনের কথা শুনতে শুনতে চন্দ্রাবলীর মধ্যে ডুবে যায় সে আজও। যেমন ডুবেছে প্রত্যেক দিন। গত কাল। গত পরশু। গত তরশু। ডুবে যাচ্ছে সেই কবে থেকে।

ডাঁটিভাঙা চশমা পরত সে। চন্দ্রাবলীর ভাল লাগেনি। অর্থের বিনিময়ে আতিথ্য পদ্ধতিতে জীবনযাপন করত যখন চন্দ্রাবলী, রবিদাকে ছেড়ে এসে, তখন শুধুমাত্র ইস্কুলের ওপর নির্ভর না করে কয়েকটি বাড়ি গিয়ে গান শেখাতে শুরু করে সে। বস্তুত অর্থের প্রয়োজন ছিল তার। দুপুরেও কিছু করার ছিল না। তার ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সাহায্যে কয়েকজন গৃহিণীকে গান শেখাবার কাজ পেয়ে যায় সে। এই বাড়তি অর্থের কিছু সে ব্যয় করত শুভদীপেরই জন্য। কিছু নাটক, চলচ্চিত্র বা উদ্যানের প্রবেশমূল্যে। আর মাঝে-মধ্যে বেরিয়ে পড়ত তারা। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে শহরের বাইরে যাচ্ছে এমনই বলত শুভদীপ বাড়িতে। আর চন্দ্রাবলীর কোনও বাধা ছিল না। আতিথ্য নেওয়া জীবনে সে ছিল সর্বার্থেই মুক্ত। এইসব দিনগুলিতে সে কখনও শুভদীপকে অর্থব্যয় করতে দেয়নি।

বেড়াতে তারা ভালবাসত দু'জনেই। কিন্তু এই কয়েক মাস কেটে গেলেই যে ভ্রমণপিপাসা জেগে উঠত তাদের, তার মধ্যে শরীরও ছিল অনেকখানি। সে তো জেগেই থাকত, তৃষ্ণার্ত হয়েই থাকত মহুলির দ্বারা। সুতরাং সে শুধু মোক্ষণ করত নিজেকে। নিজের মোক্ষণ ঘটাত। উপভোগ করত না। উপভোগের জন্য তার চাহিদা সুন্দর শরীর। শ্বেত, ক্ষীণ, নরম ও ভরাট। সুদৃশ্য ও সুগঠিত। মহুলির শরীর। যা সে সম্পূর্ণ পায়নি কখনও। এমনকী মহুলির না হলেও মালবিকাদির শরীর। কিন্তু সে কালকের মালবিকা মেয়েটির সাদামাটা বুক পেট

নিম্নতল সৌন্দর্যের তরে চায় না। এবং বিরাট, বিশাল, কালো ও কুদর্শনে তার তৃপ্তি ছিল না এতটুকু। তবু শরীরের এত তীব্র খিদে — সে চলে গিয়েছিল তালসারি। গিয়েছিল মাইথন। এবং কোণার্ক।

তালসারিতে তাদের প্রার্থিত নির্জনতা ছিল। অনেকটা বালিয়াড়ি পার হয়ে তারা পেয়েছিল সুগভীর খাঁড়ি। খাঁড়ি পার হলে, ধু ধু বালিয়াড়ি পার হলে, সমুদ্রের রেখা। বহু দূর সে-সমুদ্র স্নানের উপযোগী নয়। নরম পাড় সমুদ্রকে ছুঁয়েই তলিয়ে গেছে হঠাৎ। যেন এই ছিল তার সারা জীবনের সাধনা। সমুদ্রকে ছোঁয়া। তবে ঢেউয়ের সঙ্গে আছড়ে পড়া জলে অল্প গা ভিজিয়ে নেওয়া যায়।

খাঁড়ির গায়ে সার সার নৌকা বাঁধা। তারা দু'জন নৌকা চেপে পার হয়েছিল খাঁড়ি। আর সৈকতে পৌঁছেছিল। বালির মধ্যে পা ডুবছিল তাদের আর গতি হচ্ছিল শ্লথ। বর্ষা তখন লাগছিল সবে আকাশে। কিন্তু ছায়া ফেলেনি। গরম বালু। গরম হাওয়া। চন্দ্রাবলীর সালোয়ারে বালু মাখামাখি। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল টুপটাপ। কী এক অপার খুশিতে দু'চোখে ছিল বালুকাবেলার চিকচিক। একটু হাঁপ-ধরা স্বরে গান গাইছিল সে। সুর ঝরিয়ে চলেছিল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে প্রশ্ন করেছিল এ সুর সে চেনে কিনা। সে মাথা নেড়েছিল। চেনে না। ছায়ানট। বলেছিল সে। তারপর বাণী শুনিয়েছিল। সুর যে কথাগুলি আশ্রয় করে আছে সেই কথা। এমন বহু বাণী মুখস্থ ছিল তার।

> সাঁঈকে সঙ্গ সাসুর আঈ।
> সঙ্গ না রহি স্বাদ না জানৌ।
> বয়ো জোবন সুপনেকী নাঈ।
> সখী-সহেলি মঙ্গল গাবেঁ
> সুখদুখ মাথে হরদি চঢ়াঈ।
> ভয়ৌ বিবাহ চলি বিন দূলহ
> বাট জাত সমধী সমঝাঈ।
> কহেঁ কবীর হম গৌণে জৈবে তরব কন্ত লৈ
> তূর বজাঈ।

সে একটি বর্ণও বোঝেনি। তাই অর্থ জানতে চেয়েছিল। বুঝিয়েছিল চন্দ্রাবলী। সে বিশ্বাস করত, সুর যে বাণীকে আশ্রয় করে, তার প্রত্যেকটি অর্থ বোধগম্য না হলে গানের প্রকাশ সঙ্গত হয় না। গান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করত সে। পড়াশোনাও করত। কিন্তু গান মাধ্যমে কখনও সে বিখ্যাত হতে চায়নি। সে বরং তার জীবনের অর্ধেক দিয়েছিল গানকে। অর্ধেক সে লালন করত একটি নিটোল সংসারের স্বপ্নে ভরা।

সেদিন, বালিতে পা ডুবিয়ে চলতে চলতে গানের অর্থ বলে সে। সে কি ভেবে এসেছিল, এটাই বলবে, এমনই গাইবে বালিয়াড়িতে পা দিয়েই? কিন্তু সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় অন্তত নিজের কাছে— ততখানি জটিল, ততখানি সুপরিকল্পিত ছিল না চন্দ্রাবলী মেয়েটি। তার ছিল আবেগ। আপাদমস্তক চটচটে আবেগ।

> "স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি এসেছি। কিন্তু থাকতে পারিনি সঙ্গে। জানি না স্বামীসঙ্গের স্বাদ। স্বপ্নের মতো কেটে গেল এ যৌবন। সখীরা মাঙ্গলিক গায় আর আমার মাথায় দেয় সুখ-দুঃখের হলুদ। বিয়ে হয়ে গেল আমার। কিন্তু স্বামীকে ছাড়াই চলেছি। জ্ঞাতি-গোষ্ঠী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কবীর বলছে, আমি দ্বিতীয় বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাব। প্রিয়তমকে নিয়ে তুরী বাজিয়ে চলে যাব।"

সমুদ্রের গা-ঘেঁষা পারে যখন পৌঁছেছিল তারা, পেছনে তাকিয়ে দেখেছিল, খাঁড়ির পারে সার-সার নৌকাগুলিকে বিন্দুর মতো লাগছে। সুতরাং নৌকার মানুষের কাছে তারাও ছিল বিন্দুবৎ। বিপুল ঢেউ সমুদ্রে ছিল না। হাওয়ার আদরে জলের গায়ে অল্প অল্প দোলা। দিগন্তবিস্তৃত জল। তরঙ্গ নেই বলে সমুদ্র যেন তেমন করে সমুদ্র নয় এখানে। অনেকটা, সুন্দরবনে গিয়ে মোহনা যেমন দেখেছিল তেমনই। জলে নানা রঙের ছড়া। পারের বালুতে মিশে গৈরিক জল কিছু দূর অবধি গিয়ে সবুজাভ। তারপর নীল। নীলের পর চকচকে। রৌদ্র পড়ে

সুবিস্তৃত আলোয় প্রতিফলিত পরকলা। কোনও এক অদৃশ্য বৃহৎ চোখের বৃহত্তর কাচ।

সে সমুদ্রের দিকে মুখ করে স্তব্ধ দাঁড়িয়েছিল। একটিও কথা বলতে তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু চন্দ্রাবলী আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বড় অস্থির সে তখন। বড় চঞ্চল।

একটা গোটা সমুদ্রবেলায় তারা মাত্র দু'জন। যেন এই বেলাভূমি, তারা আসবে বলেই সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। তার ওপর চন্দ্রাবলী খুশি বাজিয়ে ঘুরছিল। তার চলায় নৃত্যছন্দ প্রকাশ ছিল সেদিন। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে সে আঃ বলছিল, উঃ বলছিল। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে হঠাৎ সে প্রশান্ত হয়ে যায়। ধীর পায়ে এগিয়ে আসে শুভদীপের কাছে এবং চোখে চোখ রাখে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ।

শুভদীপ সমুদ্র থেকে চোখ ফিরিয়ে চন্দ্রাবলীতে নিবদ্ধ করতে চায়নি। কিন্তু চন্দ্রাবলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার। এবং একটি ইচ্ছার কথা জানায়। খোলা আকাশের নীচে, গায়ে রোদ্দুর মেখে, ধুলোবালি জড়িয়ে সঙ্গমের ইচ্ছা। স্বপ্নের পুরুষের সাথে সঙ্গম।

অতএব সে তার দীর্ঘ কেশ মুক্ত করে দেয়। দোপাট্টা ফেলে দেয় বালুকাবেলায়। হাওয়ায় দোপাট্টা উড়ে যেতে থাকে। কামিজ খুলে ফেলে সে। অন্তর্বাস খুলে ফেলে। উথলে ওঠে কালো ভারী স্তন। সালোয়ার খুলে ফেলে। মেদবহুল পেট নেমে আসে নিষিদ্ধ বস্তার মতো। এবার সে শেষতম অন্তর্বাসে টান দেয়। তার চুল ওড়ে। পোশাক বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে যায়। মত্ত হস্তিনীর মতো হেলেদুলে সে এগোয়। চোখের পলক ফেলে না। শরীরের মেদ-মাংস থরথর করে নড়ে।

আর শুভদীপের বিবমিষা আসে। সে পিছু হটে। দেখতে পায়, চন্দ্রাবলীর খোলা ঠোঁট ঝুলে আছে। নড়ছে। চোখ সম্মোহিত। শুভদীপ কেন তার জীবনে এত দেরি করে এল তাই বলছে বারবার। আর ঝাঁপ দিচ্ছে। শুভদীপকে জড়িয়ে নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে অবলীলায়। আর শুভদীপ তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, ঘৃণ্য ঘেয়ো লোম ওঠা কুক্কুরী যেমন ঠেলে ফেলে দেয় মানুষ।

চন্দ্রাবলী বিস্ময়াহত তাকিয়েছিল তার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে জল গড়িয়ে দিচ্ছিল চোখ থেকে। এই বিশাল বালুচর, যার ওপর তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না, যা ছিল তাদের একার, একান্তের— তার ওপর দাঁড়িয়ে এই প্রত্যাখ্যানে তার বুক ভেঙে খানখান।

শুভদীপের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটি একটি করে পোশাক পরে নিয়েছিল সে। তারপর প্রশ্ন করেছিল, শুভদীপ কি ভালবাসেনি তাকে? কেন তা হলে সে থেকে যাচ্ছে তার সঙ্গে সারাক্ষণ? কেন শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে তারা?

কথা বলতে ভাল লাগছে না এমন অজুহাত দেয় সে। অতিথি নিবাসে ফিরে সে আলোচনায় যোগ দেবে—এমন বলে। চন্দ্রাবলী জোর করে না।

সমুদ্র দেখার অভিলাষ চলে গিয়েছিল তাদের। নীরবে হাঁটতে হাঁটতে তারা খাঁড়ির কাছে পৌঁছয়। যাওয়া এবং প্রত্যাবর্তনের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত করে চন্দ্রাবলী স্তব্ধ হয়ে ছিল। হাতছানি দিয়ে নৌকা ডেকেছিল শুভদীপ। তারপর অতিথিনিবাসে ফিরে স্নান করে নেয় দু'জনে। এবং স্নান করা মাত্রই শুভদীপের তীব্র কাম জাগে। তৎক্ষণাৎ কামার্ত পুরুষ হিসেবে সে চন্দ্রাবলীকে শুইয়ে দেয় বিছানায়। চন্দ্রাবলী এতটুকু আপত্তি করে না। বরং নিজেকে সমর্পণ করে।

এবং যখন সে অন্তঃস্থিত, যখন তার দেহ সংলগ্ন হয়ে আছে চন্দ্রাবলীর দেহে, যখন পরস্পরের রোমরাজিতে ঘটে গিয়েছে আলিঙ্গন—যখন সে, শুভদীপ, স্বদেহ প্রকাশ করে নগ্ন রাত্রির দেহে শুয়ে আছে টানটান আর আবিষ্ট নিদ্রার ন্যায়—তখন তার পিঠে হাত রেখে, গালে চেপে গাল, তাকে আবার পুরনো প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয় চন্দ্রাবলী। জিজ্ঞাসা করে, সে কি তবে ভালবাসাবিহীন শরীর সংযোগ করে? কেন করে? কেন?

ঘোর টুটে যায়। শুভদীপ কঠোর মুখে তাকায় তখন। উঠে পড়তে থাকে। সংলগ্ন স্নানঘরে যায় আর পোশাকে আবৃত করে দেহ। চন্দ্রাবলী শুয়ে থাকে। খোলা। আনমনা। উদাস। শুভদীপ সহ্য করতে পারে না। যে-দেহে সে উপগত হয়েছে কয়েক মুহূর্ত আগে, স্বেচ্ছায়,

স্বকামনায়, সে-দেহ অবান্তর মনে হয়। উন্নত পেট ও বিপুল বক্ষদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে।

চন্দ্রাবলী প্রশ্ন করে ফের। একই প্রশ্ন। অবিকল। শুভদীপ জল খায়। চন্দ্রাবলীর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বসে। তারপর কঠোর কণ্ঠে বলে সেই সেদিনের কথা। রায়মাটাং বনে যাবার পথে থেকে যাওয়া তাদের। শিলিগুড়ি শহরে। আর সে-রাত্রে পরিচয় গভীর ছিল না, প্রেম ছিল না, ভালবাসার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু শরীর সর্বময় ছিল। স্বেচ্ছায়। কেন?

চন্দ্রাবলী ভেঙে পড়েছিল। কান্না আটকে যাওয়া বিকৃত স্বর ভেঙে ভেঙে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, সুন্দরবনের সেই অসামান্য ভ্রমণকালে শুভদীপের শির চাঁদ স্পর্শ করে, আর সে, চন্দ্রাবলী, জল সাক্ষী রেখে, জ্যোৎস্না সাক্ষী রেখে, নৌকার গলুইয়ের শুভলক্ষ্মীকে সাক্ষী রেখে, বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের আশীর্বাদ নিয়ে শুভদীপকে ভালবেসে ফেলে। এমন ভালবাসা সে কারওকে বাসেনি আগে। কখনও বাসেনি। সে শুধু সর্বাংশে শুভদীপকেই নিয়ে নেয় সেদিন। তার ভুল-ভ্রান্তি ন্যায়-অন্যায় সমেত। তার ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সমেত। তাই শরীর বিষয়ে কোনও দ্বিধা ছিল না তার। আজও নেই। যাকে মনের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যায়, সে যে শরীরেও থাকে সারাক্ষণ।

শুভদীপ তখন মহুলির কথা বলে দেয়। বলে দেয় মহুলিকে সে ভালবাসে। ভালবাসবে। বলে দেয় আর রোষে দগ্ধ হতে থাকে। কেন এই রোষ সে নিজেও জানে না। এবং টের পায়, মহুলির কথা বলতে বলতে অদ্ভুত আরামে ভরে যাচ্ছে মন। চন্দ্রাবলী কাঁদছে। হো-হো কাঁদছে। বালিশে মুখ চেপে শব্দ কামড়ে কাঁদছে। খোলা চুল খোলা পিঠময়। কান্নার দমকে ভারী নিতম্বে দোল লাগছে। তার খেয়াল নেই সে নগ্ন। অনাবৃত। কাঁদছে। আর শুভদীপের আরাম হচ্ছে। অদ্ভুত আরাম। সে ব্যাগ খুলে ছবি বার করছে। মহুলির ছবি। এই সফরেও সে মহুলিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

ছবি হাতে নিয়ে চন্দ্রাবলী আশ্চর্য শান্ত হয়ে যায়। রাগে না। চেঁচায়

না। চোখের জল মুছে ফেলে। যত্ন করে পাশে ছবিটি রেখে সে একে একে পোশাক পরে নেয়। আবার ছবিটি হাতে নিয়ে দেখে। ফিরিয়ে দেয়। উদাস চোখে জানালার কাছে দাঁড়ায়। যেন, মহুলির সৌন্দর্যের কাছে বিনা যুদ্ধে তার আত্মসমর্পণ।

বিছানায় মিলনের দাগ লেগে আছে তখনও। চন্দ্রাবলীর হালকা ঘরোয়া পোশাকেও লেগে গিয়েছে দাগ। সে তার চুল তুলে মস্ত খোঁপা করছে। আরও একবার স্নানের আয়োজন নিয়ে চলে যাচ্ছে স্নানঘরে। নিঃশব্দে কেটে গিয়েছে কিছুক্ষণ। শুভদীপের আর মহুলির ছবি দেখতে ভাল লাগছিল না। যেন সুর বেপথুমান হল। তাল কেটে গেল সময়ের। সে ছবিটি ঢুকিয়ে রাখল ফের। আর তখন, নিঃশব্দ ধারাস্নানের ভেতর থেকে বেপথুমান সুর টেনে, বেতালকে তালে বেঁধে শব্দাবলি ছড়িয়ে দিল বাতাসে। বন্ধ দরজা ঠেলে সেই সব শব্দ এসে পৌঁছল বিছানায়। সে শব্দগুলিকে আলাদা করতে পারল না। স্নানঘরের দরজা খুলে গেল। চন্দ্রাবলী সুরের ধারায় ভেজানো চুল সুরের হাওয়ায় শুকোতে লাগল। শুভদীপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। সে না চাইলেও তার মন চন্দ্রাবলীর সুর ছাড়িয়ে অন্য কোথাও যেতে পারল না।

নৈনা অন্তরি আব তুঁ জ্যূ হৌঁ নৈন ঝঁপেউঁ।
না হৌঁ দেখৌঁ ঔরকু না তুঝ দেখন দেউঁ ॥

—এসো আমার চোখে, আমি বুজে ফেলব চোখ। আমি আর কারওকে দেখব না। তোমাকেও আর দেখতে দেব না অন্য একজনকেও।

কবীর রেখ সিন্দূরকি কাজল দিয়া ন জাই।
নৈনুঁ রমইয়া রবি রহা দুজা কহাঁ সমাই ॥

—কবীর বলে, যেখানে সিঁদুররেখা দেবার কথা, সেখানে দেওয়া

যায় না কাজল। আমার দু'চোখে রামকে দিয়েছি আসন, সেখানে অন্যের স্থান কোথায় হবে।

মন পরতিতি ন প্রেম-রস নাঁ ইস, তনমেঁ ঢংগ।
কেয়া জানোঁ উস পীবসুঁ কৈসেঁ রহসি রংগ ॥

—বিশ্বাস করতে পারি না কিছু। মনের মধ্যে প্রেমের নাগাল পাই না। এ শরীরে যে প্রিয়তমকে আকর্ষণ করার মতো কিছুই নেই। কী কৌশলে তার সঙ্গে রঙ্গরহস্যে ডুব দেব আমি?

৮

সেই রাত্রেই জ্বর এসেছিল শুভদীপের। সঙ্গে বমি ও বহুমলত্যাগ। ওই নির্জনতায়, ওই গ্রাম্য জেলেপাড়ায় কোনও চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। চন্দ্রাবলী অপরূপ সেবা করেছিল তার। সারা রাত্রি শিয়রে বসেছিল। আধঘণ্টা পর পর খাইয়েছিল নুন-চিনির জল।

সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তখন। জীবন মানে শুধু দারিদ্র নিয়ে ভাবনা-চিন্তা নয়। প্রেম-ভালবাসা নিয়ে কান্নাকাটি মান-অভিমান নয়। জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বমন, ঘন কফ, কফে রক্তের ছিটে লেগে থাকা, জড়িয়ে থাকে মূত্রত্যাগ ও ক্যাথেটার, এবং মল। দুর্গন্ধযুক্ত মল।

সে বমনের বেগ পেলে ছুটে যাচ্ছিল স্নানঘরে আর বমনের চাপে তার মল বেরিয়ে আসছিল। সে রোধ করতে পারছিল না। তার পোশাকে মল মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল আর স্নানঘরের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছিল উদ্‌গিরণের ময়লা।

চন্দ্রাবলী যত্নে ধুয়ে দিচ্ছিল তাকে। ময়লা পোশাক খুলে পরিয়ে দিচ্ছিল পরিষ্কার পোশাক। পূতিগন্ধময় সেইসব পোশাক ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছিল এবং স্নানঘর ধুয়ে দিয়েছিল নিজহাতে।

ভোরবেলা লোক পাঠিয়ে ওষুধ আনায় সে এবং রসুইঘরে গিয়ে তার জন্য পথ্য প্রস্তুত করে।

দুপুর থেকেই সে একটু একটু সুস্থ বোধ করেছিল।

দু'দিন ক্রমাগত শুশ্রূষার পর তৃতীয় দিন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল চন্দ্রাবলী। এই বলে যে শুভদীপ বাড়িতে অসুস্থ হলে সে দেখতেও যেতে পারবে না। কারণ শুভদীপ কখনও তাকে বাড়িতে ডাকেনি।

এমন নয় যে শুভদীপের বান্ধবীরা তার বাড়িতে আসে না। কলেজের বান্ধবী সোমা ও সুপ্রিয়া এসেছে কয়েকবার। মহুলি এসেছে। সোমা ও সুপ্রিয়ার তুই-তোকারি সম্বোধন ও ন্যাকামিবর্জিত স্বাভাবিকতায় মায়ের কখনও কোনও সন্দেহ জাগেনি। মহুলিকে দেখেও নয় কারণ মহুলি বিবাহিতা। মহুলি শুভদীপের উচ্চপদস্থ সহকর্মী। বরং মা মহুলিকে সমাদর করেছিল খুব।

কিন্তু চন্দ্রাবলী সহকর্মী নয়। সহপাঠী নয়। বিবাহিতা নয়। বরং স্বামীবিচ্ছিন্ন সে। বিবাহবিচ্ছিন্ন। তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক মা মেনে নেবে না। এমনকী শুভদীপেরও ইচ্ছে করেনি কখনও। চন্দ্রাবলীকে বাড়ি নিয়ে যেতে।

চন্দ্রাবলী কান্নার ভেতর বলে তখন। ফের বিয়ের কথা বলে। রবিদার সঙ্গে বিচ্ছেদ আইনসম্মত হলেই তারা বিয়ে করবে বলে। শুভদীপ অবাক দেখে, মহুলি নামের অন্য একজনের সরব অস্তিত্ব এই মেয়েটির বিয়ের স্বপ্ন ভেঙেচুরে দেয়নি।

তার ইচ্ছে হয়েছিল দৃঢ় ধমকে সে চন্দ্রাবলীর স্বপ্ন ভেঙে দেয়। চিৎকার করে বলে, বিয়ে নয়। বিয়ে কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু পারে না। এতখানি শুশ্রূষার ঋণ তার কণ্ঠ রোধ করে দেয়, সে ভাবে, পরে বলবে। পরে নিশ্চিতই ধমকে থামিয়ে দেবে কোনও দিন।

এবং ফিরে আসে তারা। নির্জন তালসারি থেকে শহরে প্রত্যাবর্তন করে। বাস থেকে নেমে দু'জনে দু'দিকে যাবার জন্য তৈরি হয়। তখন, শুভদীপ, বিনা ভূমিকায় বলে দেয়, সে আর চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে সম্মত নয়। এবং চন্দ্রাবলীকে কোনও সুযোগ না দিয়েই বাসে উঠে যায়।

একটি শক্ত বস্তু শুভদীপের মাথায় এসে পড়ে। সে হাতে নিয়ে দেখে একটি শুকনো মরা হাড়। এবং ফেলে দেয়। জন লক্ষ করেন এবং হেসে আশ্বস্ত করেন। মানুষের হাড় নয়। বলেন। পশুপাখির হাড় কোনও। পাখিরা ঠোঁটে তুলে নিয়ে আসে বাইরের বাজার থেকে। সে সম্মুখস্থ ফুলের দিকে তাকায়। একটি খয়েরি ও সাদা মেশা বৃহৎ ডালিয়া। জন কথা বলে যান। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা। ক্লেশ ও যন্ত্রণার কথা। মানুষের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই বলেন তিনি। সারাজীবন শোকে, তাপে, যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষেরা প্রকৃত শান্তি পায় মৃত্যুর পরেই। যখন তারা এই নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভের কাছে পৌঁছয়, আর মৃতদেহ হিসেবে শায়িত হয় এই বেদিতে—

শুভদীপ দেখতে পায় একটি পরিচ্ছন্ন শ্বেতপাথরের বেদি। সবুজ ঘাসের ওপর প্রকাশিত রজতশুভ্রতায়।

...যখন তারা নীত হয় ওই কক্ষে এবং স্নাত হয় আত্মীয়-পরিজনের দ্বারা—

তারা ঢুকে পড়েছে প্রাচীরঘেরা এলাকার ভেতর আরও এক প্রাচীরঘেরা জায়গায়। সেইখানে বেদি। দূরে মোটা মোটা থাম ও খিলানের ঘর। পুরনো অথচ সুঠাম মজবুত। সেইখানে মৃতদেহ স্নাত হয়।

...যখন স্নাত হয়ে, পরিজন বাহিত হয়ে স্তম্ভে চলে যায়, নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভে আর নিজেকে বিলিয়ে দেয় পাখিদের ভোজনের তরে, পাখিরা ছিঁড়ে নেয় মাংস আর মানুষটির দুঃখ দূর হয়, কষ্ট দূর হয়, পাপ, শাপ, সন্তাপ দূর হতে থাকে—

শুভদীপ সবিস্ময় দেখে। মৃত্যুর পর পরিণতি দেখে।

একটি উঁচু গোল মঞ্চ। বিশাল আয়তনে। তেমনি বিশাল প্রাচীর

দিয়ে ঘেরা। আর মঞ্চ ঘিরে মাটির ওপর বৃত্তাকার বাঁধানো অঞ্চল। তার চারকোণে চারখানি সুগভীর কুয়ো। ঢাকা। বাঁধানো। মাটি থেকে মঞ্চ অবধি সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে সবুজ রং করা তালাবন্ধ দরজা। একমাত্র জন ও মৃতদেহবাহকেরা সেইখানে যেতে পারে। আর কেউ নয়।

পাখিদের আগমন সুবিধার্থে মঞ্চের ওপর দিক খোলা। সেই চারখানি কুয়ো বরাবর মঞ্চ থেকে নেমে এসেছে চারখানি ঢাকা দেওয়া নর্দমার আদল।

জন বুঝিয়ে দেন, মঞ্চের তল ঢালু। দেহাবশেষ হিসেবে যে টুকরো-টাকরা থাকে, ওই ঢালু বেয়ে নেমে আসে নীচে আর নর্দমাবাহিত হয়ে কুয়োয় পড়ে যায়। যতটুকু থাকে, প্রাকৃতিক বারিপাতে চলে যায় নালিকা বেয়ে।

যদি বৃষ্টি না হয়, কী হয় তখন? শুভদীপ ভাবে, কিন্তু প্রশ্নটি করে না। সে বরং ভাবতে থাকে, কত দিন গিয়েছে এ পথে, জানতেও পারেনি এইখানে রয়ে গেছে Tower of silence। নৈঃশব্দ্যের স্তম্ভ। এখানেই মাংসাশী পাখিরা খেয়ে যাচ্ছে মরা মানুষের হাড়-মাস। সে কল্পনা করে— প্রিয়জনের দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে পাখিরা, জেনে সতৃপ্ত ফিরে যাচ্ছে পরিজন।

এই প্রথম তার মনে হয় সে পৃথক ধর্মের। পৃথিবীর অসংখ্য লোকের সঙ্গে তার বিশ্বাস, বোধ, রুচি ও জীবন-যাপনে অসংখ্য অমিল। তার ধর্মে মৃতদেহ শেয়ালে-শকুনে ছিঁড়ে খেলে পাপ। অন্যায়। অমঙ্গল।

জন বলে চলেন, যে যত বেশি পুণ্যবান, তার দেহ খেতে আসে তত বেশি পাখি। পাখিরা, পবিত্র বায়স, শকুন, চিল পুণ্যের গন্ধ পায়।

তখন একটি পাখি শিস দেয়। সে শিস শুনে চমকে ওঠে। শিস শুনলে চন্দ্রাবলী স্বর মেলানোর চেষ্টা করত। পঞ্চমে না ধৈবতে। বিভোর হয়ে পড়ত। চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী তাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। তাকে না দেখে থাকতে পারত না। সেবার সে যখন চন্দ্রাবলীকে সম্পর্ক না রাখার কথা জানিয়ে চলে যায়, তিনদিন— সম্পূর্ণ তিনদিন

চন্দ্রাবলী সামান্যও যোগাযোগ করেনি। কিন্তু একদিন ভোরবেলা, ছ'টাও বাজেনি, সে আলুথালু উপস্থিত হয় শুভদীপের বাড়ি। সৌভাগ্য তার, দরজায় শব্দ হতে আর কারও ঘুম ভাঙার আগেই সে-ই উঠে পড়েছিল আর দেখেছিল আরক্ত চোখ, এলোমেলো চুল— সম্মুখে চন্দ্রাবলী। তাকে দেখেই সে কেঁদে ফেলে নিঃশব্দে। কালো গালে অনর্গল অশ্রুপাত করে।

সে তখন চন্দ্রাবলীকে বাড়ি থেকে দূরে একটি তিনকোনা মোড় দেখিয়ে দেয়। অপেক্ষা করতে বলে তৈরি হয় দ্রুত। মা উঠে পড়েছিল। তাকে বেরুতে দেখে কোথায় যাচ্ছে প্রশ্নও করেছিল। অত্যন্ত নৈপুণ্যে একটি মিথ্যে বলে সে তখন। মহুলির স্বামী বাণিজ্যিক ভ্রমণে গেছেন এবং মহুলি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পরিচারিকা তাকে ডাকতে এসেছে।

মা তখন কপালে হাত ঠেকিয়েছিল। মহুলির আরোগ্য কামনা করেছিল মনে মনে। আর সে বেরিয়ে এসেছিল। চন্দ্রাবলীকে মহুলির পরিচারিকা করে দিতে এতটুকু দ্বিধা হয়নি তার। পাড়া-প্রতিবেশীর নজর এড়াতে চন্দ্রাবলীকে নিয়ে সে দ্রুত উঠে পড়ে একটি ফাঁকা ট্রামে। আর চন্দ্রাবলী ট্রামের পরিচালককে পরোয়া না করে, যাত্রীদের তোয়াক্কা না করে অবিশ্রাম কাঁদে। কাঁদে আর তার কাছে সম্পর্ক ভিক্ষা চায়। ভিক্ষা চায় আর বার বার বলে মহুলিকে সে নেবে। মেনে নেবে। কিন্তু শুভদীপকে ছাড়তে পারবে না।

চারপাশ ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত বোধ করে সে। মাথায় যন্ত্রণা টের পায়। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে তার। তবু সে বলে না কিছুই। বরং শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে বলেই সে এই Tower of silence থেকে বেরিয়ে পড়ার তাগিদ বোধ করে। হঠাৎ পর পর কিছু সমাধি চোখে পড়ে তার, এবং সে থমকে দাঁড়ায়।

জন ব্যাখ্যা করেন তখন, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রীতি পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেন। কিছু কিছু পার্শি পরিবার প্রকৃতিকে দেহ ফিরিয়ে দেবার এই রীতি মেনে নিতে পারছে না এখন। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের অনুসরণে মৃতদেহ সমাধিস্থ করছে কেউ, কেউ আবার

হিন্দুদের প্রভাবে মৃতদেহ দাহ করে ছাই এনে সমাধিস্থ করে যাচ্ছে Tower of silence-এর কাছাকাছি। ধর্মকে তারা গড়িয়ে দিচ্ছে নিজের মতো।

শুভদীপ সমাধির খুব কাছে চলে যায়। সেই অজানা অচেনা গন্ধ পায় সে। যে-গন্ধ মিষ্টি নয়, কটুও নয়, তীব্র নয়, হালকাও নয়। উগ্র নয়, নয় মাদকতাময়। সে ফুল খোঁজে। কোনও বিশেষ ফুল পায় না। শুধু জনের স্বর ভেসে আসে।

পার্শি সম্প্রদায়ের এই পরিবর্তনে তিনি দুঃখিত নন। আনন্দিতও নন। পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। যেমন করে শৈশব থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয় মানুষ, মানুষ এবং গোটা জীবজগৎ, না চাইলেও পরিবর্তিত হয়ে যায় দেহকলা— তেমনি— এমনকী ধর্মেরও পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য, অনিরুদ্ধ।

শুধু জন, নিজের ক্ষেত্রে, সেই পুরনো প্রথাই অনুসৃত হোক চান। সমস্ত জীবন তাঁর কেটে গেছে এই স্তম্ভের পরিমার্জনায়। মৃত্যুর পর তিনি অতএব শুতে চান ওই শ্বেতপাথরের বেদিতে আর পরিজনবাহিত হয়ে স্নানঘরে যেতে চান। স্নাত হয়ে তিনি নীত হতে চান পবিত্র স্তম্ভে। প্রার্থনা করেন—যেন বহু পাখি খেয়ে যায় তাঁকে। শত শত পাখি। এতটুকু অবশেষ যেন তারা ফেলে না রাখে।

চন্দ্রাবলী বলত, তার মৃত্যুর পর সে দাহ হতে চায় না। সে ইচ্ছাপত্র করতে চেয়েছিল, যেন তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী।

হিমেল হাওয়া বয়। গাছের শুকনো পাতা সর-সর শব্দে খসে পড়ে।

চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী।

শুভদীপ সমাধি ফলকের লেখা পড়তে থাকে। জন ক্ষমা চেয়ে দপ্তরে চলে যান এবং ফিরে এসে একটি খাম শুভদীপের হাতে তুলে দেন। চিকিৎসা ও পথখরচের জন্য যৎসামান্য অর্থ। শুভদীপ প্রত্যাখ্যান করতে চায় কিন্তু জনের আর্তি ও আন্তরিকতাকে ফেরাতে পারে না। পকেটে খাম রেখে সে প্রার্থনা কক্ষের দিকে এগোয়। মনে মনে উচ্চারণ করে সমাধি ফলকের সেই লেখা। অচেনা জায়গায়,

অচেনা ধর্মের পরিমণ্ডলে তার মনে পড়ে সেইদিন কত আশ্চর্য পন্থায় চন্দ্রাবলী তার বাড়িতে পৌঁছেছিল। ঠিকানা জানত না। শুধু জানত নিকটবর্তী স্কুলের নাম। জানত, শুভদীপ স্কাউটের দলে ছিল। অন্ধকার থাকতেই একটি ট্যাক্সি নিয়ে সে পৌঁছে যায়, শুভদীপদের অঞ্চলে, এবং জনবিরল পথে যাকে পায়, তাকেই প্রশ্ন করতে করতে এগোয়। তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল চা-ওয়ালারা। দুধের দোকানের মালিক। আর কাগজের হকার।

চন্দ্রাবলীর ঘোর লেগে যাচ্ছে দেখে শুভদীপ বেরুতে চায় তার থেকে। তার মাথার যন্ত্রণাকে স্মরণ করে সে। Tower of silence স্মরণ করে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজ এবং বাবার ওষুধ স্মরণ করে এবং সমাধিফলকের লেখাগুলি আবৃত্তি করে বার বার—

Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that blow
I am that diamond glints on snow
I am that sunshine on ripped grain
I am that gentle autumn rain
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep.

—কাঁদিয়ো না, সমাধির প্রান্তে বসি কাঁদিয়ো না আর
আমি নহি, নিদ্রিত নহি, দেখো বিশ্ব পারাবার
আমি সেই বায়ুমালা, আমি সেই বিপুল অশেষ
হিমকুচি হিম গায়ে আমি সেই হীরকের বেশ
শস্য থরে থরে রাখা, আছি আমি আলো ঠিকরানো
যখন ঝরিবে বৃষ্টি—আমারেই মেঘে-বর্ষা জানো
কাঁদিয়ো না, সমাধির প্রান্তে বসি কাঁদিয়ো না আর
আমি নহি, নিদ্রিত নহি, দেখো বিশ্ব পারাবার।

৯

সে গিয়েছিল কন্ডোম কিনতে। কন্ডোম ফুরিয়ে গেছে তার। কন্ডোম ছাড়া সে কারওকেই কখনও গ্রহণ করে না। ছেলেটিকে দোকানেই দেখেছিল সে। আর দেখামাত্রই ভাল লেগেছিল তার। চিকন শরীর। গালে মাখা বিষণ্ণতা। চশমার আড়ালে শূন্যে ভাসা চোখ। সে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। যদি চায়। চায়নি। সে তখন তার পিঠ বরাবর দাঁড়ায় এবং ছেলেটির নিতম্বে চাপ দিতে থাকে। একটিবার ঘাড় ঘুরিয়েছিল সে। বলেনি কিছুই।

সে যখন রাস্তায় দাঁড়ায়, আর কোনও কামার্ত পুরুষ তাকে আবাহন করে, তখন সে দেখে পুরুষটির রুচিবোধ। গড়ন। পরিচ্ছন্নতা। বলিষ্ঠ, রুচিবান ও পরিচ্ছন্ন পুরুষরাই একমাত্র লাভ করে তাকে।

ইদানীং নিত্যনতুন সুনায়র নেয়ই না সে। প্রয়োজন নেই। যৌনতা বৃত্তি হলেও সে যৌনদাস নয়। শুধুমাত্র এই বৃত্তিই তার গ্রাসাচ্ছাদনের সহায়ক নয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করে সে। ভাল মাসোহারা পায়। পড়ায় সে যৌনকর্মীদের। নিরক্ষরকে অক্ষর চেনায়। যে পড়তে-লিখতে পারে, তাকে দেয় বহির্জগতের দীক্ষা। আর দেয় স্বাস্থ্যজ্ঞান। জন্ম থেকে এ অঞ্চলে থেকে সে দেখেছে, শরীরই সব, শরীরই একমাত্র সারবস্তু, জীবনের মূলধন। কিন্তু শরীরকে যত্ন করে না কেউ। সাজায়। ক্রিম মাখে। শ্যাম্পু করে। গয়না পরায়। দামি পোশাক তোলে। কিন্তু যত্ন করে না। অসুখ করলে চেপে রাখে, যতক্ষণ না দগদগে হয়ে দেখা দেয়।

কন্ডোম ব্যবহার করতে রাজি হয় না অনেক খদ্দের। নরম যোনিতে সরাসরি প্রবেশ করলে শিশ্নের যে-সুখ, কন্ডোমে তার প্রায় সবটাই ব্যাহত হয়। তারা তখন জোর করে। টাকা দিচ্ছে বলে সুখের ব্যাপারে আপস চায় না। বেশি জোর করলে কিছু না করে চলে যাবে বলে ভয় দেখায়। আর বেশ্যার দল উপার্জন হারানোর ভয়ে রাজি হয়ে যায় তখন। খোলা অরক্ষিত যৌনাঙ্গ মেলে ধরে অক্লেশে আর সংবহন করে রোগজীবাণু।

তাদের শরীরে থিকথিকে রোগ। থিকথিকে অপুষ্টি। ভাবলে তার বুকের মধ্যে টনটন করে। যক্ষ্মা, রক্তাল্পতা ও যৌনরোগে সমস্ত প্রাণশক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। ইদানীং মড়কের মতো ঢুকে পড়ছে এডস। ভয়াল, ভয়ঙ্কর, এডস।

সে শুধু বোঝাবার চেষ্টা করে। সকলেই সংহত হলে, সকলেই কন্ডোম পরার দাবি জানালে, যারা আসে, তারা বাধ্য হবে। চলে যাবে না কোথাও। যাবে না কারণ বেশ্যাদের দুয়ারে যারা আসে তারা কামপীড়িত। সঙ্গম না করে তাদের উপায় নেই।

বেশ্যার দল হেসে-হেসে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। বলতে থাকে, এবার থেকে বাবুদের উদ্ধত যন্ত্রে টুপি পরিয়ে বসাবে তারা। টুপি পরালে শিশ্নসমূহ কীরকম বেড়ালের ন্যাজের মতো নরম হয়ে যায়, তেজ কমে গিয়ে কীরকম অসহায় হয়ে নড়-নড় করে— তার সবিস্তার আলোচনা করে। বাঁড়া হয়ে যায় ভেজা ন্যাকড়ার মতো— এমনই তাদের উদাহরণ।

সে নিজে এ সব শব্দ ব্যবহার করে না। তার জিভ আটকে যায়। এইসব বেশ্যাদের মতো সে নিজেকে রাখতে পারে না কুঠুরিবদ্ধ জীবনে। এই অঞ্চলে, এই সব বেশ্যাদের জীবন তার মনে হয়, চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারের মতো অনেকটা। শুধু তোষণ। শুধু দেহানুরঞ্জন। বিনিময়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। পেট পুরে খেতে পর্যন্ত পায় না সব।

খোলতাই চেহারা থাকলে রোজগার ভাল হয় যদিও। একেবারে সোনা-গয়নায় মুড়ে যায় শরীর। যেমন তার নিজের বাড়ছে ব্যাঙ্কে জমানো টাকার পরিমাণ। কিন্তু তাতেও, সে দেখেছে, এই সব মেয়েদের জন্মখিদে একটি সংসারের জন্য। স্বামীর জন্য। সমাজের স্বীকৃতির জন্য। এই সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজও সেই সব নিয়ে। স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে যৌন কর্মীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা। যৌনকর্মীদের তারা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত করতে চায়।

সে নিজে এই সব আন্দোলনে যোগ দেয় না। সে এমনকী বিশ্বাসও

করে না, শ্রমিকের স্বীকৃতি পেলেই যৌনকর্মীরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। গৃহস্থ পাড়ায় বাস করে পাশের বাড়ির কাকিমার হাতে রান্না করা কাঁচকলার কোপ্তা পাবে, অথবা কাকুর কাছে হয়ে উঠবে ঘরেরই মৌটুসী।

হবে না। হবে না এমন। হাজার বছরের পুরনো এই বৃত্তি টিকে আছে ঘৃণিত হয়েই। এই ঘৃণা মুছতে চলে যাবে আরও হাজার বছর। ঠিক যেমন করে সমাজে দেবতারা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর পেয়ে যায় এক অনন্ত আয়ু। কিন্তু অনন্তও শেষ হয়ে যায় একদিন। কারণ অনন্ত পরিবর্তিত হয়ে পায় অন্য অনন্তধারা। এক অসীম অন্য অসীমে ধাবিত হয়। এক যম, আজও জীবিত থেকে পরিবর্তিত হয়েছেন কতবার! পুরাণে যম ন্যায়ধর্মের অধিপতি ধর্মরাজ। ধর্মাধর্ম বিধানজ্ঞ সর্বধর্ম প্রবর্তক। ঋগ্বেদে যম অগ্নিস্বরূপ। অগ্নিরূপী যম উচ্যতে। তিনি তাপশক্তিরূপে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংযমিত করেন। আবার এই ঋগ্বেদেই যমকে বলা হচ্ছে সূর্য। সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে সারা বিশ্বভূমন্ডলকে প্রতিপালিত করছেন সূর্য। যিনি সূর্য তিনিই যম। অন্তরীক্ষস্থ তিনি। মাধ্যমিক। মাধ্যমিকো যম ইত্যাহুঃ।

আবার সূর্য ও যম অভিন্ন বলেই যমের আরেক নাম তুর। কারণ যম তীব্র গতিসম্পন্ন। সূর্যের আলোকরশ্মির চেয়ে দ্রুতগতি আর কিছুই নেই এ মহাবিশ্বে। অতএব যম শব্দ তরণার্থক। তুর শব্দের অর্থ দ্রুত গমনশীল যম। তরণার্থক তৃ ধাতু থেকে বা শীঘ্রত্ব পরিচায়ক ত্বর ধাতু থেকে তুর। যম তরণশীল। সূর্য তরণশীল। দ্রুতগতিতে প্রতিদিন পার হয়ে যান মহাকাশ। তরণশীল ও তূর্ণগতি।

এরপর যম হয়ে উঠলেন কিংবদন্তি। মহাভারতে যমের বর্ণনা আছে... পুরুষং রক্ত বাসসম্। বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।

এখানে যম হয়ে উঠেছেন ভয়াবহ। রক্তবাসা। বদ্ধমৌলি। দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী। শ্যামবর্ণ। রক্তনয়ন। ভয়ানক পুরুষ। দিবাকরের মতো তেজস্বী—অর্থাৎ যম এখানে স্বয়ং সূর্য নন আর। পাশ হস্তে তিনি দণ্ডায়মান। অর্থাৎ এখন আর তিনি জগতের

প্রতিপালক নন। তিনি ধর্মরাজ বটে। কিন্তু ঘাতক।

কালিকাপুরাণে যমকে বলা হয়েছে প্রাণদণ্ডস্য সাধনম্। এখানে তিনি ভয়াল দর্শন—কৃষ্ণাস্ত্রং স্থূলপাদং বহির্নিঃসৃতদন্তকম্ ভয়াভয়প্রদং নিত্যং নৃণাং মহিষবাহনম্ ॥ মহিষের পিঠে বসে থাকেন যম। তাঁর সঙ্গে কালো অস্ত্র, পাগুলি স্থূল আর মুলোর মতো দাঁত। মানুষকে নিত্য ভয়-দান করেন, অভয়ও।

মৎস্যপুরাণে যমের রূপ একটু খুলেছে। এখানেও তিনি ধর্মরাজ এবং প্রাণহরণকারী। নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরধরং প্রভুম ॥ বিদ্যুল্লতা নিবদ্ধাঙ্গং সতোয়মিব তোয়দম্। নীলপদ্মের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণ যম, পীতবস্ত্রধারী— যেন বিদ্যুৎবেষ্টিত জলভারাক্রান্ত মেঘ।

পদ্মপুরাণে যম পাপীগণকে দণ্ডপ্রদান করছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যম আবার স্বয়ং ধর্ম নন। যদিও এখানে যমের অনেক নাম। যেমন— ধর্মরাজ, শমন, কৃতান্ত, দণ্ডধর ও কাল। পাপীগণের শুদ্ধিনিমিত্ত তিনি দণ্ডধারণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং ধর্ম নন। ধর্মের অংশ।

শেষ পর্যন্ত টিকে আছেন যম। কথায়, ভাবনায়, বাগধারায়। কিন্তু ধর্মরাজ হিসেবে তাকে আর মনে রাখে না কেউ, যতখানি তিনি আছেন কৃতান্ত হয়ে, শমন হয়ে। যুগে যুগে রূপ এবং মর্যাদা পাল্টে পাল্টে গিয়েছে স্বয়ং কৃতান্তের।

এমনই হতে থাকবে এই বৃত্তির। এই বেশ্যাবৃত্তির। ভোল পাল্টাবে হয়তো। কিন্তু কৃতান্ত হয়েই টিকে থাকবে আরও হাজার হাজার বছর। ঘৃণিত হয়ে টিকে থাকবে।

তবু সে চায় এই আন্দোলন সফল হোক। যা আছে তাকে নেই বলার ভণ্ডামির মুখে প্রস্রাব করা যাবে তাহলে। হাড় জিরজিরে বেশ্যার কাছ থেকে বখরা খিঁচে নেওয়া পুলিশের মুখে লাথ কষানো যাবে। খুশি হবে সে, খুব খুশি হবে, যদি স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আদালতে গিয়ে মানুষের মতো অধিকার তো চাইতে পারবে। এমনকী সুরক্ষিত হতে পারবে সন্তানের ভবিষ্যৎ।

সে ছেলেটির দিকে তাকায়। কোমল মুখ। কিন্তু চোখের তলায় ক্লিষ্টতার ছাপ। ঘুমোচ্ছে। ডাক্তার বলে গিয়েছেন, তাকে যেন ঘুমোতে

দেওয়া হয়। কপালের এক জায়গায় ফোলা, থ্যাঁতলানো। ওষুধ দিয়ে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো হয়েছে সেখানে। তার গা থেকে ধুলোমাখা শার্ট খুলে দিয়েছে সে। পরিয়ে দিয়েছে নিজের নতুন পাঞ্জাবি। ছেলেটি তখন ঘোরের মধ্যে চন্দ্র বলছিল। চন্দ্রাবলী উচ্চারণ করছিল। চন্দ্রাবলী কে সে জানে না। কিছুই জানে না ছেলেটি সম্পর্কে। শুধু নাম জানে। শুভদীপ। শুভদীপ ভট্টাচার্য। শার্টের পকেটে নামপত্র ছিল। অবশ্য যদি নামপত্রখানা তার নিজেরই হয়ে থাকে।

ডাক্তারকে এই নামই বলেছে সে। শুভদীপ। আর শুভদীপ ছেলেটির রক্তচাপ নিম্নগামী। সে যে দোকান থেকে বেরিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে যায়, সেসব এ কারণেই। ডাক্তার বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখে দিয়েছেন। ছেলেটি জেগে উঠলে সে সব পরীক্ষার জন্য তাকে নিয়ে যেতে পারত। তার ভাল লেগেছে, শুভদীপকে ভাল লেগেছে।

তার কাছে যারা খদ্দের হয়ে আসে এখন, বেশির ভাগ চেনা হয়ে গেছে। দূরভাষে সময় নির্দিষ্ট করে নেয় সে। এবং সে জানে, কার পছন্দ পায়ুসঙ্গম। কে চায় চোষণপ্রক্রিয়া। পেশাগত যৌনতার সময় তার নিজের পছন্দের কোনও জায়গা নেই। বেশির ভাগই পায়ুসঙ্গম চায় আর চোষণ করতে হয় বলেই সে চায় পরিচ্ছন্ন লোক। যদিও তার অভিজ্ঞতা আছে, পরিচ্ছন্ন, মূল্যবান পোশাক পরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ— অন্তর্বাসে বড়ই নোংরা। নোংরা অন্তর্বাসের নীচে তাদের যৌনকেশে ময়লা চিটচিটে হয়ে লেগে থাকে।

প্রথম প্রথম যখন তার দারিদ্র ছিল— সে, চোখ বুজে, দম বন্ধ করে চোষণ করত। খদ্দের চলে গেলেই বমি করত হড়হড় করে। বাড়তি খরচ করার সঙ্গতি হওয়ার পর সুগন্ধি লাগানো তোয়ালে দিয়ে সে সমস্ত শরীর মুছে দেয় আগে। অতিরিক্ত পরিষেবা হিসেবে প্রত্যেকেই উপভোগ করে এই প্রক্রিয়া।

এদের কারও প্রতি তার ভাললাগা মন্দলাগা নেই। এদের দেহে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেতেও সে অভ্যস্ত। গোটা খেলায় তার আছে কিছু নিয়মানুগ প্রক্রিয়া। কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ

থাকা। তারপর কানের লতি থেকে শুরু হয় লেহন। তার আগে অবশ্য নিজেকে পোশাক-মুক্ত করে নেয় সে।

কানের লতি থেকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামে। স্তনবৃন্তে দু'ঠোঁটের চাপ দিলেই পুরুষগুলো ছটফট করে। উঃ আঃ করে। সে তখন শিশ্নে হাত রাখে। আপন শিশ্ন ঘষতে থাকে পুরুষটির ঊরুতে, কোমরে, পেটে। তারপর নামে সে। মুখ রাখে শিশ্নে। আর টেনে নেয়। রস টেনে নেয়। পুরুষটি তখন তার গলা অবধি ঢুকিয়ে দেয় যৌনদণ্ড। এভাবে চোষণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে সে। আর যারা পায়ুসঙ্গম চায় তারা তাকে আঁকড়ে ধরে। তার বৃন্ত পিষ্ট করতে থাকে এবং তার পায়ুতে এক ধাক্কায় প্রবেশ করিয়ে দেয় ছুরির ফলার মতো কঠিন শিশ্ন। কেউ তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, কেউ চতুষ্পদের ভঙ্গি নিতে বলে। কেউ কেউ তার ক্লান্তির পরোয়া না করে দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় দস্যু-তস্করের মতো চালিয়ে যায় ক্রিয়া।

চোষণের জন্য সে নেয় সাতশো। পায়ু সেবনের জন্য হাজার।

দেখে-দেখেই চমৎকার নাচ শিখেছিল সে। তার শরীরে আছে মেয়েলিপনা। ছিপছিপে, ফর্সা, টানা টানা নাক-চোখের কারণে, কোঁকড়ানো মাথাভর্তি চুলের মহিমায়, সে জানে সে আকর্ষণীয়। যতখানি মেয়েদের কাছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পুরুষদের কাছে। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সে পছন্দ করে কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার কোনও যৌন আকর্ষণ নেই। নিজের আনন্দের জন্য সে চায় সুদর্শন ছিপছিপে পুরুষ। যেমন এই শুভদীপ ছেলেটি।

ভাল নাচ করে বলে একটি হিজড়ের দলের মধ্যমণি হয়ে বহুবার লগানে গিয়েছে সে। বিহারের নানা অঞ্চলে ঘুরেছে। এক-একবার গেলে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা উপার্জন হত তার। এই লগানই তাকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দেয়। শেষ পর্যন্ত সে এই যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ হিজড়ের দল তাকে তাদের গুরুমার কাছে দীক্ষা নিতে বলে এবং শিশ্ন কর্তন করার পরামর্শ দেয়।

সে হিজড়ে নয়, সে জানে। লিঙ্গ পরিবর্তন করতেও সে চায় না। সে সমকামী। সে টের পায় তখন, হিজড়েরা তাকে নিজের লোক মনে

করতে পারছে না। সে কেমন না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে থাকছে তাদের মাঝে। কলেজে স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা এসে গিয়েছিল তখন। সে সব বন্ধ করে পড়াশোনায় মন দেয়। সেই থেকে আর যায়নি। হিজড়ে নাচের ওই ঢং ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে ও বাক্য ব্যবহারের সঙ্গে নিজেকে মানাতেও পারছিল না সে। অর্থবান বিহারিদের আঙিনায় নাচ দেখানো, প্রায় ভিক্ষের মতো লাগত।

নাচের পেশা সে ছাড়েনি। নাচ অবলম্বন করে এক নতুনতর পেশায় তাকে নিযুক্ত করেন অলকবাবু।

অলকবাবু বেশ্যাদের দালাল। বেশ্যাপাড়ার ছিঁচকে দালাল নন। তাঁর কাজ বড় মাপে। প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাবান মানুষদের জন্য 'সমাজবালিকা' সরবরাহ করেন তিনি। এই বালিকারা কেউ-ই নির্দিষ্ট অঞ্চলের নয়। এরা থাকে বড় ফ্ল্যাটে, বিলাসে, আরামে। স্বাভাবিক লাগে এদের জীবন। বাইরে থেকে দেখলে অন্যান্য গৃহস্থালির সঙ্গে কোনও তফাত করা যাবে না ঘর-দুয়ারের।

এই অলকবাবুর কিছু খদ্দের আছেন মহিলা। তাঁদের উচ্চপদস্থ বা ব্যবসায়ী স্বামীরা ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ। হুট করতেই দেশে বিদেশে চলে যান। উপোসী ও উপেক্ষিতা স্ত্রীরা তখন পুরুষ খোঁজেন। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়। শুধু দেহ। তাঁরা দেহ খোঁজেন। তরুণী হলে পুরুষ শিকার সহজ। কিন্তু প্রৌঢ়া হলে, ঠোঁটে যতই রং থাকুক, ব্লাউজের পরিমাপ যতই হোক অন্তর্বাসের মতো সরু, পুরুষ পাওয়া সহজ হয় না। তখন দালাল লাগে।

অলকবাবু অনেক খদ্দের দিয়েছেন তাকে। প্রথমে তাঁর প্রস্তাব ছিল মহিলা খদ্দের নেবার। সে তখন তার অপারঙ্গমতা জানায়। অলকবাবু তখন ভাবনাচিন্তা করে অন্য প্রস্তাব পাড়েন। বড় বড় শহরে যেমন হচ্ছে, তেমন তিনি চালু করেন এ শহরেও।

এক-একটি বাড়িতে কয়েকজন মহিলা সমবেত হন। সেখানে মঞ্চের মতো নাচের জায়গা করা হয়। সেই মঞ্চে সে নাচতে নাচতে একটি একটি করে পোশাক খুলতে থাকে। শর্ত, কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এক ঘণ্টা নাচের জন্য কুড়ি হাজার টাকা।

সে নাচে। খুলে ফেলে আঁটো পোশাক। খুলে ফেলে উর্ধ্ববসন। হাত মোজা। খুলে ফেলে প্যান্ট এবং জাঙ্গিয়া পরে নাচতে নাচতে একসময় অন্তর্বাসও খুলে ফেলে। তখন.. তুমুল হর্ষধ্বনি ওঠে। মহিলারা, চুম্বন ছুড়ে দেন। কেউ কেউ শর্ত ভুলে তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য ছুটে আসেন। অনেকে এ ওর ব্লাউজ খুলে স্তনে হাত রাখে। সে নাচে। মুক্ত হয়ে নাচে। আর নগরদেবীরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করে চরম কামনায়।

সে বিশ্বাস করে, অদ্যাবধি বিশ্বাস করে, পৃথিবীময় কাম। গোটা পৃথিবী কাম দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ মরণ মুহূর্তেও এক-একজন জাগ্রত কামুক।

আরও একবার ছেলেটিকে দেখতে যায় সে। ঘুম ভাঙেনি এখনও। পাশ ফিরে শুয়েছে। ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে আছে। কম্বল সরে গিয়েছে গা থেকে। মশা ঘুরছে।

মশা তাড়াবার যন্ত্রটি প্লাগে বসিয়ে দেয় সে। জ্বালে, কম্বল দিয়ে শরীরটা ভাল করে ঢেকে দেয়। এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। দীর্ঘদিন পর সে আজ তীব্র তৃষ্ণা বোধ করছে। ছেলেটি যখন অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়, সে ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আশ্চর্য শান্তিতে ভরে গিয়েছিল শরীর। তার জড়িয়ে ধরার মধ্যে এমন এক নিশ্চয়তা ছিল, আবেগ ছিল যে পথচারী ও দোকানিরা ছেলেটিকে তার আত্মীয় মনে করে।

তাকে বিছানায় শুইয়ে জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল যখন, খোলা শরীরের সৌন্দর্য তাকে পরিপূর্ণ মুগ্ধ করে। সে, সেই খোলা শরীর স্মরণ করে ব্যালকনির গ্রিল জড়িয়ে থাকা লতার ত্রিকোণ পাতাগুলোয় হাত বোলায়। ছেলেটির ওষ্ঠ স্মরণ করে আপন হস্তের ত্বকে চুম্বন করে। মনে মনে সংকল্প নেয়, ছেলেটিকে আহ্বান করবে সে। যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, মেনে নেবে। যদি না হয়, নিজের শরীর দিয়ে আরেকটি শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে দেবে প্রেম।

প্রেম! সে আশ্চর্য হয়। সে প্রেম ভাবছে! প্রেম! কাকে বলে প্রেম,

জানে না সে। সে শুধু জানে স্পর্শ, জানে শরীর। শরীরের পরিমাণ মূল্য। সে নিজেকে জানে না। নিজের অন্তরকে জানে না। প্রেম জানে না এই ছেলেটিকে জড়িয়ে তার শরীর জুড়ে শান্তি নেমেছিল। এর নামই কি প্রেম? কিংবা এই স্পর্শ করার আকুলতা?

সে যখন ছোট ছিল, তার এই মেয়েদের মতো চলন-বলন যে-কোনও মেয়ের চেয়েও মেয়েলি হয়ে দেখা দিত। তার মা বেশ্যাপাড়ারই এক মধ্যবয়সিনী, চার সন্তানের জননী— তার নাম রেখেছিল বুলা। সে জানে না, তারা চার ভাইবোন একই পুরুষের সন্তান কিনা। না হওয়াই সম্ভব। চারজনের চেহারাতেও মিল নেই। যদিও সে নিজে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছিল বিনোদবাবুকে। মায়ের বিনোদবাবু। তারাও ডাকত বিনোদবাবু। বিনোদবাবু আসার পর তার মা আর অন্য পুরুষ নেয়নি।

বিনোদবাবু যত্ন করতেন মাকে। তাদের পুরো পরিবারের প্রতিপোষণ করতেন। তাদের জন্য নিয়মিত উপহার আনতেন। বিনোদবাবুর তাগিদেই মা তাদের সকলকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়।

তার মনে আছে, মায়ের একটু জ্বর হলেই বিনোদবাবু মাথার কাছে বসে থাকতেন ঠায়। কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। বিনোদবাবু তাদের সত্যিকারের বাবা হলেন না কেন, এই আলোচনা তারা প্রায়ই করত। বড়দি একটু বড় হয়ে উঠলে বিনোদবাবুই তার বিয়ে দিয়ে দেন।

এই বিনোদবাবু পাগল হয়ে গেলেন। মায়ের তখন মধ্যবয়স। যৌবন দাঁত কামড়ে ঝুলে আছে প্রত্যেকটি বাঁধনে। বিনোদবাবুর যত্নে কোথাও এতটুকুও যন্ত্রণার ছাপ পড়েনি। তার নিজের বয়স তখন তেরো। মেজদির আঠারো। সেজদির ষোলো।

দিশেহারা হয়ে গেলেন মা। কিছুদিন কান্নাকাটি করলেন। তারপর হাল ধরলেন শক্ত করে। পাগল বিনোদবাবুও রয়ে গেলেন এ বাড়িতেই। মা তাঁকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের বাড়ি, কিন্তু খুঁজে পাননি কোথাও। ঠিকানা জানা ছিল না। শুধু একটা ধারণা। তাই ফিরিয়ে আনলেন বাড়িতে। খেতেন না, ঘুমোতেন না, শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন বিনোদবাবু। মা কয়েক গ্রাস ভাত জোর

করে তাঁর মুখে পুরে দিতেন। তিনি মুখে নিয়েই বসে থাকতেন সেই সব। কোনও এক সময় গিলে ফেলতেন। নিয়ম করে মা প্রাকৃতিক ক্রিয়াদির জন্য স্নানঘরে নিয়ে যেতেন বিনোদবাবুকে। যন্ত্রের মতো বসে থাকতেন বিনোদবাবু। শরীর ধর্মে মলমূত্র ত্যাগ করতেন কিন্তু শৌচ করতেন না। মা তাঁকে এক শিশুজ্ঞানে সাফসুতরো করে দিতেন।

এই বাসস্থান, যেখানে সে নিশ্চিন্তে থাকে এখন, বিনোদবাবুর করে দেওয়া।

কিছু টাকা ছিল মায়ের আর ভারী ভারী গয়না। সব গয়না বিনোদবাবুর দেওয়া। সেই সব দুই মেয়ের বিয়ের জন্য আগলে কাজে নামলেন মা। জমা টাকা ভাঙিয়ে খেলে সব ফুরিয়ে যাবে একদিন, মা এমনই বলতেন।

পুরনো বৃত্তিতে অনায়াসেই ফেরা সম্ভব ছিল মা-র পক্ষে, কিন্তু মা কয়েকটি বাড়িতে রান্নার কাজ নিলেন। একে একে দিদিদের বিয়ে দিলেন। খেয়ে-পরে বাঁচবার মতো বিয়ে দিতে গিয়ে সব টাকা আর গয়নাগুলো চলে গেল। আর বিয়ের সময় বিনোদবাবুকেই পিতা হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

যেমন হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বিনোদবাবু, তেমনি হঠাৎ মরে গেলেন একদিন। ঠিক পনেরো দিনের মাথায় মাও চলে গেলেন।

ভালবাসা বলে একে? এই সম্পর্ককে? এই টানকে? যা স্বার্থের সীমা ছাপিয়ে যায়, দেওয়া-নেওয়ায় বাঁধা থাকে না, অর্থলিপ্সাকে যে হেলায় দেয় পাশে ফেলে?

হয়তো। হয়তো। তার কখনও হয়নি এমন। ইস্কুলে পড়ার সময় মেয়েদের মতো আচরণ ছিল বলে, সে মূত্রত্যাগ করতে গেলে অন্য ছেলেরা উঁকি মেরে তাকে দেখতে চাইত। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা জড়িয়ে ধরত তাকে। চুমু খেত। কোলে বসিয়ে তার শিশ্ন চটকাত অনেকে।

একদিন একাদশ শ্রেণির দেবকান্তিদা তাকে ইস্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যায়। এবং জোর করে তাকে ধর্ষণ করে। পায়ুদ্বারে নির্মম ভাবে

ঢুকিয়ে দেয় শক্ত শিশ্ন এবং তাকে চেপে ধরে গমন ও প্রত্যাগমন করতে থাকে যতক্ষণ না বীর্যপাত হয়।

অসম্ভব যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল সে। যেন একটি ছুরিকা দিয়ে মাংসগুলি খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছে তার। হাড়গুলি মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেই যন্ত্রণাকে কী ব্যাখ্যা দেওয়া যায় সে জানে না। সে শুধু জানে, তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ওই কষ্ট সজ্ঞানে হজম করার নয়। সে গলা মাধ্যমে যে স্বর তখন বার করে আনছিল তাকেই বলে আর্তনাদ। আর্তনাদ। সে কাঁদছিল। খুব কাঁদছিল। হঠাৎ দেবকান্তিদা তার পিছন-সামন ক্রিয়া থামিয়ে স্থির হয়ে যায়। নিজেকে ঠেসে ধরে তার পশ্চাতে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

সে তখন ওই অবস্থাতেই শুয়ে পড়েছিল মাটিতে। তার আর কান্নারও ক্ষমতা ছিল না কারণ যন্ত্রণায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল। ডাঙায় ছেড়ে দেওয়া জলচরদের মতো মুখে বড় হাঁ রচনা করে খাবি খাচ্ছিল সে। পায়ুদ্বারের যন্ত্রণায় নিজের অজান্তেই রেখেছিল হাত। হাতে রক্ত উঠে এসেছিল। তোয়ালে দিয়ে শিশ্ন মুছতে মুছতে হ্যা হ্যা হেসেছিল দেবকান্তিদা। আমোদ পাওয়া গলায় বলেছিল, সে শুধু নারীসুলভই নয়, সতীত্বের সমস্ত লক্ষণ তার মধ্যে আছে। নথ ভাঙানোয় কীরকম রক্তপাত হচ্ছে! তার সতীচ্ছদ টুটিয়ে দেবকান্তিদাই তাকে করে তুলেছে পরিপূর্ণ নারী।

সে তখনও পড়ে পড়ে কাঁদছে দেখে তাকে লাথি কষিয়েছিল দেবকান্তিদা। সে যেন আর ছেনালি না করে এমন আদেশ করেছিল। বেশি ছেনালি করলে সে আরও একবার বাঁড়া ঢুকিয়ে দেবে বলে হুমকি মেরেছিল।

ভয়ে উঠে বসেছিল সে। মাথা টলছিল তার। কোনওক্রমে প্যান্ট পরে সে বেরিয়ে আসে বাইরে। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক রাগ হয়েছিল তার। ঘৃণা হয়েছিল দেবকান্তিদার ওপর। উঁচু ক্লাসের যত ছেলেকে সে চিনত, তাদের সকলের প্রতি ঘৃণা হয়েছিল। যন্ত্রণার সঙ্গে, রাগের সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে— অপমানবোধ মিশে দুই কান ঝাঁ-ঝাঁ

করছিল তার। এই অপমান ও যন্ত্রণার কথা সে বলেনি কারওকে। কোনও দিন। আজ অবধি বলেনি।

সেদিন বাড়ি ফিরে সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। চিৎ শোয়ার উপায় ছিল না এমন যন্ত্রণা। সর্বাংশেই সে নির্দোষ ছিল। অথচ মনে মনে সে হয়ে উঠেছিল বিষম ভীরু। তার প্যান্টে রক্তের দাগ লেগেছিল। একটি বড় স্ফোটকই এর কারণ— এমনই ব্যাখ্যা করেছিল সে। দশদিন ইস্কুলে যায়নি। ক্ষত সারিয়ে নিতে থাকার সেই দিনগুলিতে অসম্ভব উদ্বেগ তাকে তাড়া করত। মনে হত, ইস্কুলে পৌঁছলেই হা-হা হাসির তোড়ে সে ভেসে যাবে। ধর্ষিত হওয়ার কারণে সবাই তাকে দুয়ো দেবে। যদিও শেষ পর্যন্ত তেমন হয়নি। ইস্কুলে যাবার পর কোনও হা-হা হাসি তাকে তাড়া করেনি। দেবকান্তিদা বলে দেয়নি কারওকে কিছুই। এখন সে বুঝতে পারে, ভয় তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল দেবকান্তিদার। সে যদি বলে দিত মাকে বা কোনও চিকিৎসককে, কিংবা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে তাহলে দেবকান্তিদাই চরম শাস্তি পেত। অথচ সে বারো বছর বয়সের বোকামি ও ভীরুতায় নিজেই মুখ বুজে গুটিয়ে ছিল নিজের মধ্যে।

ওই ঘটনার পর প্রথম যেদিন দেখা হয় দেবকান্তিদার সঙ্গে, সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে জানে না কেন, সেই অমানুষিক যন্ত্রণার কথা মনে করে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। দেবকান্তিকে এড়িয়ে সে চলে যায়। চোখের জল ও যন্ত্রণাকে মহাবিশ্বের কারও সঙ্গে ভাগ করে না নিয়ে, সে সব কিছু মুছে ফেলেছিল গোপনে।

ইস্কুল ছুটির সময় দেবকান্তিদা তাকে ধরে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে দেবকান্তিদা সেইসব প্রসঙ্গেই গেল না। বরং তাকে রোল খাওয়াল। ক'দিন পর খাওয়াল চিনে খাবার। আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে, দেবকান্তিদার প্রতি তার রাগ ও ভীতি চলে যাচ্ছিল। একেবারে সম্পূর্ণ মুছে গেল যেদিন দেবকান্তিদা তাকে উপহার দিল একটি কিশোরকুমার এবং একটি লতা মঙ্গেশকরের ক্যাসেট। সে অভিভূত হয়ে গেল সেদিন। এমনকী দেবকান্তিদাকে অল্প-অল্প পছন্দ করতেও শুরু করল সে।

প্রায় ছ'মাস কেটে গিয়েছে এর মধ্যে। সে তখন অষ্টম শ্রেণির। দেবকান্তিদা বারোর। 'শোলে' এসেছে আবার। সে শোলে দেখেনি শুনে দেবকান্তিদা তাকে নিয়ে গেল। সে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকল সারাক্ষণ। হেলেনের উন্মত্ত নাচ, তারও রক্তে নাচের দোলা লাগিয়ে দিল তখন। গভীর ঘোর নিয়ে সে বেরিয়ে এল যখন, দেবকান্তিদা তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, সে দেবকান্তির বাড়ি যাবে কিনা। সে না করতে পারল না।

সেই শুরু। তারপর থেকে ভাল রেস্তরাঁয় খাওয়ার বিনিময়ে, টি-শার্ট বা ক্যাসেট প্রাপ্তিতে, কিংবা চলচ্চিত্র দেখাবার শর্তে সে তার পেশা চালিয়ে যেতে থাকল।

দেবকান্তিদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিছু দিন আগে। সঙ্গে বউ ছিল। তাকে দেখামাত্র বোকার মতো হেসেছিল দেবকান্তিদা। কীরকম ভয় পাওয়া আক্কুটে মুখ করে কথা বলল। একবার বাড়িতেও যেতে বলল না। কোথায় থাকে বলল না তাও। ভয়, ভীষণ ভয় পেয়েছিল দেবকান্তি। সে জানে। যদি সে ওর বউকে সব কীর্তির কথা বলে দেয়।

একা একাই হাসতে থাকে সে। ভয়! ভয়তাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়ায় সমস্ত মানুষ। সে নিজেও। প্রত্যেকে। প্রত্যেকেই যেন ভীত। সন্ত্রস্ত। সন্দিহান। কেউ কারওকে বিশ্বাস করে না। কেউ কারও কাছে আসে না। বাজারের থলে হাতে বেরুলেই যেমন সন্দেহ জাগে, এই বুঝি ওজনে ঠকাল, এই বুঝি দাম বেশি নিল, তেমনই ক্রেতা-বিক্রেতা মানসিকতা সর্বত্র। কয়েক বছর ধরে যাঁরা আসছেন তার কাছে, তাঁদের মধ্যে এমনকী আছেন বিবাহিত পুরুষরাও। পরিবার-পরিজন নিয়ে ছা-পোষা পুরুষ। পথে-ঘাটে দেখা হলে তাঁদের চোখেও ত্রাস ফুটে ওঠে। অচেনার ভান করে এড়িয়ে যান তাকে। বিশ্বাস নেই। কারও মনে বিশ্বাস নেই।

সে চা করবে বলে ভেতরের দিকে গেল। আজ রাত্রি ন'টায় একজনের আসার কথা। একজন খরিদ্দার। এই ছেলেটি না এলে তার জীবন নিত্যছন্দেই চলেছিল। ছেলেটিকে সে আরেকবার আকাঙ্ক্ষা করে মনে মনে। এবং টের পায়, আকাঙ্ক্ষা করার মতো আর কিছুই

তার জীবনে নেই। একজন মনের মতো মানুষ ছাড়া আর কী-ই বা সে চাইবে! বাড়ি আছে, অর্থের অভাব নেই, পেশাগুলির প্রতি তার কোনও অভিযোগ নেই। সে কোনও বাবা হতে পারবে না। মা-ও না। কেউ তার স্ত্রী হবে না কখনও, স্বামীও হবে না। সে শুধু পেতে পারে মানুষ একজন। পুরুষমানুষ। বন্ধু। যৌনতার অংশীদার। জীবনের অংশীদার।

চা করার আগে, ছেলেটি জেগে উঠেছে কি না দেখতে গেল সে। একসঙ্গেই চা করবে তা হলে। ঘরে ঢোকার আগেই সে দেখতে পেল, ওঠেনি শুধু, বসে আছে বিছানায়।

কাছে গেল সে। মাথায় হাত রাখল। জিজ্ঞেস করল কেমন বোধ করছে। মাথা নাড়ল ছেলেটি। মাথা থেকে সরিয়ে দিল তার হাত। সে বিছানার কিনার ঘেঁষে বসে পড়ল তখন। ছেলেটি চশমা চাইল। চশমা এগিয়ে দিয়ে ছেলেটির বুকে হাত রাখল সে। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলতে লাগল—কীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে। কীভাবে তাকে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। ডাক্তার কী বলে যান। আর এই সব বলতে বলতে তার জিভ শুকিয়ে আসছিল। বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল। ছেলেটির ঠোঁটদুটো বড় মসৃণ, নাক তীক্ষ্ণ, চশমার কাচের নীচে দুটি উদাস নয়ন। এলোমেলো চুলে, কপালের ক্ষতকারুণ্যে আর হালকা চন্দন রঙের পাঞ্জাবিতে তাকে দেখাচ্ছে যেন বিরহক্লিষ্ট প্রেমিকপুরুষ। তার মাথার পেছনে জ্যোৎস্না উদ্বেলিত চাঁদ, তার পায়ের তলায় অসীম বিস্তৃত সুনীল সমুদ্র, তার চারপাশে নারী। অগণিত, আকুল, বিবসনা। তার মধ্যে একাই সে দিগ্বসন। একাই সে পুরুষদেহী পুরুষ-কামনা।

ছেলেটি হাত নামিয়ে দেয় তার। শার্টের খোঁজ করে। তার অসুস্থতার পর থেকে, জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে, ডাক্তারের আগমন ও নির্দেশগুলি সমস্তই তার মনে আছে, সে জানায়। একটি গভীর নিদ্রার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করেছিল মাত্র। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগও ছিল। শুধু ওঠার শক্তি ছিল না।

ছেলেটি পাঞ্জাবি খুলতে চায়। আর মেয়েলি হিল্লোল তুলে সে

বারণ করে তাকে। ছেলেটি শোনে না। সমস্ত কিছুর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবি খোলে ও শার্ট পরিধান করে। মুহূর্তকালের জন্য তার নির্মেদ বুক-পেট চুনি-পান্নার সম্ভার উদ্ভাসিত হয়। তার ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে মুখ রাখে সেখানে। চুনিবৃন্তে ঠোঁট স্থাপন করে শুষে নেয় প্রেম। বুকে পান্নার মতো রোমরাজিতে মুখ ঘষে। তার শিশ্ন উন্মুক্ত করে পেতে দেয় নিজস্ব নরম গোল নিতম্ব।

কিন্তু পারে না কিছুই। শুধু ইচ্ছেরা সংগোপনে মাথা কুটে মরে। কোমল আঙুল ছেলেটির শার্টের বোতাম এঁটে দিতে যায় আর বোতামের ছলনায় নিজস্ব ভাষায় কথা বলে বুকের সঙ্গে। কিন্তু ছেলেটি নির্বিকার থাকে। নারীসুলভ পুরুষের শরীর তাকে জাগাতে সক্ষম হয় না। কোমল আঙুলগুলি প্রত্যাখ্যান করে সে নিজেই লাগিয়ে নেয় সমস্ত বোতাম। এমনকী চা পানের অনুরোধও ঠেলে দেয় সে। বরং ধন্যবাদ দেয়। বারংবার ধন্যবাদে অপরিচয়ের দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তার মনে পড়ে ছেলেটির গেঞ্জিটি মেলে দিয়েছিল খুলে। ছেলেটির মনে পড়ছে না। সে-ও বলে না আর। বলে না কিছুই। আপাদমস্তক জুড়ে কী গভীর ঔদাস্য! তার ইচ্ছাকে সবলে প্রতিহত করে। সে চূড়ান্ত হতাশায় ভাল-লাগা ছেলেটিকে চলে যেতে দেয়। ছেড়ে দেয়। গেঞ্জির কথা বলে না কারণ, এ দিনের স্মৃতি হিসেবে সে রেখে দেবে ওই বাস।

এ কি স্বাভাবিক? সে ভাবে। হয়তো স্বাভাবিক নয়। শুধু দেখা, শুধু একটি দুর্ঘটনা দ্বারা সম্পর্ক রচিত হয় না। হতে পারত, যদি সে হত নারী! পুরুষ হয়ে পুরুষকে কামনা না করে সে যদি নারী হয়ে পুরুষকে কামনা করত, তবে এই দুর্ঘটনা, স্পর্শ, শুশ্রূষা—কাহিনী হতে পারত। এই প্রথম, নারী নয় বলে কষ্ট হয় তার। সে আলমারি খোলে। তার মনে হয়, এই যে রক্তপরীক্ষার নির্দেশ—এই সব তারই করার কথা ছিল। এই ওষুধের নিদান—এই সব তারই দেবার কথা ছিল। সে তো কোনও দিন কিছু করেনি কারও জন্য। সে শুধু নিজেকে কেন্দ্র করে বিনিময় করে গেছে। এ তার নতুনতম বোধ। এই উপচিকীর্ষা। এই

আপন করে নেবার ইচ্ছা। সে একটি খামে চিকিৎসকের নির্দেশপত্র পুরে দেয়। সঙ্গে থাকে তিন হাজার টাকা। এটুকুই ছিল তার কাছে। সে দিয়ে দেয়। বলে না কিছুই। চিকিৎসকের নির্দেশপত্র হিসেবে ধরিয়ে দেয় ছেলেটির হাতে। ছেলেটি আবারও ধন্যবাদ দিয়ে খাম ব্যাগে পোরে। সে দেখতে পায়, তার প্রেমের প্রণামী চলে যাচ্ছে ব্যাগের গহ্বরে।

ছেলেটি ধন্যবাদ ছাড়া একটিও কথা বলে না আর। নাম বলে না। নাম জানতেও চায় না। বাইরে বেরিয়ে আসে। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে আসে। ছেলেটি ট্যাক্সি ডাকে। সে দাঁড়িয়ে থাকে। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে দাঁড়িয়েই থাকে। ছেলেটি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ চেপে ধরে সেই হাত। ট্যাক্সি চলার উপক্রম করে আর সে ছেলেটির হাতে চুম্বন এঁকে দেয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় ছেলেটি। ট্যাক্সি চলতে থাকে। ক্রমশ একটি কালো বিন্দুর মতো মিলিয়ে যায় দূরে।

সে ঘরে ফিরে আসে। ফাঁকা লাগে। খুব ফাঁকা লাগে। মেলে দেওয়া গেঞ্জিটি হাতে নেয় সে। গন্ধ শোঁকে। নতুন পুরুষের গন্ধ। যাকে ভাল লেগেছিল, পেল না। পাবার সম্ভাবনাও নেই। আফসোস হয় তার। যে কার্ডটা পেয়েছিল, রেখে দিতে পারত। কপালে করাঘাত করতে থাকে সে। ভেতরটা হাহাকারে ভরে যায়। যে-বালিশে শুয়েছিল ছেলেটি—শুভদীপ? সে কি শুভদীপ? জেনে নেওয়া হল না আর। যে-বালিশে শুয়েছিল সে—তাতে মুখ রেখে, গেঞ্জিটি বুকে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে রমণীসুলভ পুরুষ। কিছুক্ষণ। তারপর টেলিফোন টেনে নেয়। ফোন করে। আজ আর লোক নেবে না সে। তার ভাল লাগছে না।

একবার কপালের ফোলা জায়গায় হাত রাখল সে। ব্যথা কম লাগছে। ঘুম-ঘুম ভাবটা যায়নি এখনও। ঠিকমতো ভাবতেও পারছে না। মস্তিষ্ক ক্লান্ত। সমস্ত শরীর জুড়ে গভীর বিষাদ। ট্যাক্সিতে পিঠ এলিয়ে দেয় সে। এখনও অনেকটা পথ। তারপর বাড়ি। সে যেন বাড়ি যায়নি কত দিন! মা-বাবা-ভাই আর শুচুকে দেখতে পায়নি কত দিন! আজ সকাল থেকে এই সন্ধে পর্যন্ত সে যেন কয়েকশো বছর পেরিয়ে এসেছে। ঘুমের ভেতর দিয়ে, ঘোরের ভেতর দিয়ে সে যেন পরিক্রমা করে গেছে শত শত বৎসরের পথ। সে ছুটি নেবে। ক্লান্ত সে। ক্লান্ত বড়ই।

ছুটি নেবে। কিন্তু কত দিন! চিকিৎসক বলেছিলেন তার রক্তচাপ নিম্নমুখী। হয়তো সে-কারণে দু'-বার মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। না। প্রথমবার ধাক্কা খেয়ে পড়েছিল। এবং জ্ঞান হারিয়েছিল। তা হলে জ্ঞান সে হারিয়েছিল দু'বার। একই দিনে। সে টের পায় বিশ্রাম প্রয়োজন তার। সকাল থেকে পর পর যা যা কিছু ঘটে গেছে মনে করে সে। শুচুকে মনে করে। তখন গাড়িচালক এফ এম বেতার চালিয়ে দেয়। সে একটি গানের শেষ কয়েকটি লাইন শুনতে পায়। ক্রমশ ফিকে হয়ে-আসা গানের শব্দগুলি আনমনে শুনতে শুনতে সে আবিষ্কার করে, একটিই পঙ্‌ক্তি বার বার গাওয়া হচ্ছে। বাঁধ ভেঙে জল এসেছে বানভাসি। সে জানে না কার গান। কিন্তু যে-গান সে জানে, তাকে চমকে দিয়ে সেই গানই বেজে ওঠে অতঃপর। ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি, খিদের থেকেও স্পষ্ট—! কী হতে পারে? তার শুচু মনে পড়ে, চন্দ্রাবলী মনে পড়ে, শুচু-চন্দ্রাবলী-শুচু-চন্দ্রাবলী। চোখের সামনে সুবলের খাঁচা দুলতে দুলতে যায়। সে খাঁচা শূন্য। সুবল নেই। শূন্য খাঁচা একবাটি ছোলা নিয়ে, দু'খানি কাঁচালংকা নিয়ে দুলতে দুলতে যায়। তার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। 'ঘেন্না করো ঘেন্না করো' 'ঘেন্না করো ঘেন্না করো' বলতে বলতে কারা যেন ধাবিত হয় তার দিকে। চোখ বড় করে তাকায় সে। দু'জন পূর্ণবয়স্ক নারী। একজন অন্ধকার।

বিপুলকায়। খোলাচুল মেলে দিয়ে ঊর্ধ্ববাহু। অন্যজন শীর্ণা। শ্যামলা। দুই কাঁধে দুই বিনুনি ফেলে নতমুখী।

চশমা খুলে চোখ মোছে সে। পিঠ সোজা করে সামনে তাকায়। দ্রুত পিছলে যাচ্ছে পথ-ঘাট। পিছলে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, মানুষজন। কোথাও কোনও খাঁচা নেই। চন্দ্রাবলী নেই। শুচু নেই। তবুও এক বিরাট খাঁচা সে অনুভব করে। আর বিরাট খাঁচার সীমাবদ্ধতায়, বিরাটের সীমাবদ্ধতায় ছটফট করে প্রাণ। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। সিদ্ধান্ত নেয়, শুচুর সঙ্গে দেবনন্দনের বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত নেয় সে এবং একরকমের আরাম বোধ করে তৎক্ষণাৎ। তার ঘুম পায় আবার। প্রলম্বিত জৃম্ভণ দেখা দেয় মুখে। ট্যাক্সিতে ঘুমিয়ে পড়া উচিত হবে না ভেবেও সে অতঃপর এলিয়েই পড়ে। টুকরো টুকরো জন আসে তার চোখে। টুকরো টুকরো পাখির ডাক। হাড়ের টুকরো। একটি বিশাল কুয়োর গায়ে বন্ধ দরজা। সে পায়ে পায়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। তার ঠোঁটের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে দেয় এক মস্ত শকুন। সে হুস্-হাস্ করে, তাড়াবার চেষ্টা করে। পারে না। বরং সেই শকুন, সেই কুয়োর উঁচু প্রাচীরের গায়ে পা ঝুলিয়ে বসে মানুষের আদল নেয়। মানুষটি পুরুষ কিন্তু নারীসুলভ। সে একটি প্রলম্বিত হাত বাড়ায়। নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খুলে দেয় জামার বোতাম। সে দেখে, সরু সরু আঙুলে তীক্ষ্ণ নখ। নখে লাল রং-করা। হঠাৎই সেই কুয়োর দরজা থেকে একটি অন্ধকার ঘরে চলে যায় সে। টের পায় একটি উষ্ণ ও নরম কোলে সে শুয়ে আছে। তার চুলে আদরের আঙুলের টান দিচ্ছে কেউ। চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তার ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। কিন্তু ঘাড় টনটন করছে। যে-কোলে শুয়ে আছে তার বেধ বড় বেশি। তার দমও বন্ধ হয়ে আসছে কারণ নাকের ওপর নেমে এসেছে ভারী স্তন। আর জন প্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পায়ের কাছে। বলছেন মন জাগত নাহি। মন জাগত নাহি। ফির যাওল শাম। আহা! কী সুর! অবিকল চন্দ্রাবলী। তখন ছেলেটি তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে দুধের গ্লাস। তাকে খেয়ে নিতে বলছে। গ্লাসের গায়ে তার আঙুলের নখে হলুদ রং করা। তার গা গুলিয়ে উঠছে। বমি পাচ্ছে।

সে চন্দ্রাবলীর কাছে অনুযোগ করছে, দুধ খাবে না, কিছুতেই খাবে না। দুধ খেলে তার বমি হয়ে যাবে। আর চন্দ্রাবলী উধাও। সে দেখল সে বসে আছে ট্যাক্সিচালকের কোলে, আর চালক তার কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা চাইছে। দু'লক্ষ টাকা না হলে কিছুই হবে না, অস্ত্রোপচার হবে না। সে পড়িমরি করে উঠে বসেছে। দু'লক্ষ টাকা! দু'লক্ষ টাকা সে পাবে কোথায়!

চোখ মেলছে সে। চালকের পাশের খোলা জানালা দিয়ে হু-হু হাওয়া ঢুকে পড়ছে। হাত-পা হিম হয়ে আছে তার। জমাট অন্ধকারে পথ করে ছুটছে ট্যাক্সি। সে হয়তো বা একটি মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তার চোখে পড়ছে মাঠের কোনায় জলের ফোয়ারা। তার ওপর রঙিন আলো পড়ছে। ফোয়ারার জল নৃত্যপর। সে জানে, ওখানে গান বাজছে। আর গানের তালে তালে ফোয়ারার জল নৃত্যপর। সন্ধে যেতে না যেতেই জেগে উঠেছে নাগরিক মুনসিয়ানা।

সে ব্যাগের চেন খোলে। জনের দেওয়া খাম খোঁজে ভেতরে। আজও সে যেতে পারেনি সেই ভ্রমণ সংস্থায়, জনের দেওয়া বদান্যতার অর্থে ভরসা করে ট্যাক্সি নিয়েছে। না হলে, এই অসুস্থ অবস্থায় তাকে বাসে চাপতে হত। এই সন্ধ্যায় ঘর-ফিরতি যাত্রী বোঝাই বাস। সে দম নিতে পারত না। ব্যথা জায়গায় ব্যথা পেত আবার। এই যেমন একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তেমনি হলে কেউ পা মাড়িয়ে জাগিয়ে দিত তাকে। কেউ কনুইয়ের গুঁতোয়। ধীরগামী বাসে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত ঠায়, আর এই শীতের সন্ধ্যায় এখন তার হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছে, তখন সে ঘেমে উঠত। সারাদিন পরিশ্রম করা, ক্লান্ত, বিরক্ত, তিরিক্ষি মেজাজের মানুষগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঘেমে উঠত। আর, হয়তো, কে জানে, অজ্ঞান হয়ে যেত আবার।

সে হাতে খামের অস্তিত্ব টের পায়। দু'আঙুলে ধরে বার করে আনে। ট্যাক্সির ভিতরকার আধো আলো আধো অন্ধকার খামটি সম্পর্কে মনে বিভ্রম জাগায়। ঠিক এরকমই খাম তাকে দেননি জন। কিছু একটা তফাত। কিছু একটা অন্যরকম। সে মুখ খোলে। খোলা

মুখ ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে উপুড় করে দেয়। আর দেখতে পায়, একটি ভাঁজ করা কাগজের ওপর সার সার একশো টাকা। তার বাঁ হাতে ভর দিয়ে, খামে অর্ধাংশ লুকিয়ে সোজা। শিষ্ট। সে বার করে নেয় সব। গুনে মোট তিন হাজার টাকা আবিষ্কার করে। এবং কিছু বুঝতে পারে না। ভাঁজ করা কাগজটি খোলে। চিকিৎসকের নিদানপত্র। ছেলেটির মুখ ঝলকে মনে পড়ে যায়। সে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের উপলব্ধিকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে সন্দেহ করে, জনের দেওয়া টাকা সে এই খামে পুরে ফেলেছে কিনা! ঘোরের মধ্যে, ঘুমের ঘোরের মধ্যে, সে এই ধরনের কাজ কিছু করে ফেলেছে কি না। এমনকী এই সম্ভাবনার কথাও বিশ্বাস করতে পারে না সে। সে তখন গুনতে থাকে। একে একে গুনতে থাকে। তিরিশে দাঁড়ায়। আবার গোনে। আবার গোনে। আবার! তার কাছে তিন হাজার টাকা!

সে তখন আবার ব্যাগ খোঁজে। এবং আরও একটি খাম পেয়ে যায়। ব্যাখ্যাতীত ভাবে তার মনের মধ্যে প্রত্যাশা জাগে—এই খাম খুলেও সে পেয়ে যাবে পরিষ্কার টান-টান ত্রিশখানা একশো টাকার নোট। গভীর আগ্রহে খামে উঁকি মারে সে। আছে। টাকা আছে। আগের খামটি উরুর নীচে চেপে রেখে সে গুনতে থাকে। তার ক্লান্তি হঠে যায়। কপাল ব্যথা করে না। নিম্নচাপমুখী রক্ত, ঊর্ধ্বচাপের সম্মুখীন হয়। আর ঝকমকে টান-টান টাকার পরিবর্তে সে পায় ময়লা নরম একশোটি দশ টাকা। এক হাজার টাকা সর্বমোট। তার আর দ্বিতীয়বার গুনতে ইচ্ছা করে না। তার কাছে এখন চার হাজার টাকা! হঠাৎ নিজের ভাবনায়, লোভী প্রত্যাশায় সে চমকে ওঠে। দারিদ্রের ধাক্কায় এ কোথায় নেমে এসেছে সে! লজ্জায় উত্তপ্ত হয়ে যায় কান। তার ইচ্ছে করে, সমস্ত টাকাই সে উড়িয়ে দেয় জানালা দিয়ে। এই পৃথিবীতে অনাদৃত উপলখণ্ডের মতো ফেলে রাখে ভুঁয়ে। কিংবা ফিরিয়ে দিয়ে আসে সেই সব দাতা কর্ণদের।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না কিছুই। তার মনে পড়ে, এই সব টাকার অনুগ্রহ এখনও সে নিয়ে বসে আছে। ট্যাক্সিভাড়া দিতে হবে তাকে। অসহায়তায় কান্না পায় তার। কেন তাকে এতখানি অনুগ্রহ করা হল!

তাকে কি দেখলেই খুব দুঃস্থ লাগে এখন? দেখলেই কি মনে হয় সে মূল্যহীন! অক্ষম! সংসার প্রতিপালন করতে পারে না। এমনকী আত্মপালনেও দড় নয়। সে নিজের পোশাকের দিকে তাকায়। রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল বলে শার্ট ময়লা হয়ে আছে। কালই কাচা হয়েছিল বলে ইস্ত্রি না করেই পরে নিয়েছে প্যান্ট। বাড়িতে ইস্ত্রি নেই। রাস্তার মোড়ে ইস্ত্রিওয়ালার কাছে যেতে হয়। তার আর ইচ্ছে করেনি। চন্দ্রাবলীকে মনে পড়ে তার। সে বলত, নিজের আচরণে, অবয়বে নিজের দৈন্য প্রকাশ করতে নেই। দৈন্য প্রকাশ পেলে মানুষ হয় তাচ্ছিল্য করে, নয়তো করুণা করে। তাচ্ছিল্য ও করুণা দুই-ই মানুষকে করে দেয় মেরুদাঁড়াহীন।

সে কি তবে হয়ে যাবে মেরুদাঁড়াহীন, আর চেয়েচিন্তে, দয়া ও করুণার দ্বারা বেঁচে থাকবে আজীবন? ভয় করে, অসম্ভব ভয় করে তার। এই যে নগরের এত আলো, এই যে এত বড় শহরের এত প্রাণ, এত উল্লাস—কিছুই দেখে না সে। শুধু দেখে অন্ধকার। আপামর অন্ধকার। আদি-অন্তহীন। লয় নেই, ক্ষয় নেই এক দুর্মদ অন্ধকারে সে একা একা তলিয়ে যেতে থাকে। আর টের পায়, টের পেতে চায়, এই অন্ধকারের অন্য নাম জীবন। কালো, কুৎসিত, জিঘাংসায় পরিপূর্ণ জীবন। এর থেকে মুক্তির আকুলতায়, আলোয় আলোময় মৃত্যুকে আঁকড়ে নেবার আকুলতায় সে ছটফট করে। কেবলই ছটফট করে।

আর তার অন্যমনস্কতায় উরুর ভাঁজে রাখা খাম নীচে পড়ে যায়। সে তুলে নেয় খাম আর মনে পড়ে ছেলেটিকে। মৃত্যুর রূপোপাসনা ছেড়ে সে তখন ছেলেটিকে ভাবে। তার আশ্চর্য আচরণ ভাবে। মনে পড়ে যায় তার আঙুল সঞ্চালন। ছেলেটির মধ্যে কোথায় কিছু ব্যতিক্রমী ছিল। কী, সে বুঝতে পারে না। মেলাতেও পারে না কিছু। ছেলেটি অসুস্থ অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসক এনে তাকে পরীক্ষা করিয়েছিল। শুশ্রূষা করেছিল তাকে। ময়লা শার্ট খুলে পাঞ্জাবি পরিয়েছিল। ছেলেটির বিছানায় শুয়েছিল সে। এবং বিনিময়ে সে নামও জিজ্ঞেস করেনি। চরম অভদ্রতায় নামও জিজ্ঞেস করেনি।

তার সমস্ত ঘোর কেটে যেতে থাকে। মাথার জমাট মেঘ খুলে খুলে

যায়। ভেসে যায় অন্য গাঁয়ে। অন্য দেশে। আর সে সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। কারণের সন্ধানে রত থাকে। জনের অর্থপ্রদানের যুক্তিসম্মত কারণ বুঝতে পারে। কিন্তু ছেলেটির আচরণের থই পায় না। জীবনের গায়ে লেগে থাকা ব্যাখ্যাহীন সহস্র বিস্ময়ের সংশয় ক্লান্ত করে। সে এক সাদা-মাটা মানুষ, তুচ্ছতর মানুষ, হঠাৎ জীবন, একটি দিনের জন্য তার কাছে হয়ে যায় পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা। আর এফ এম বেতারের গান প্রতিহত করে তার মনে অনুরণিত হয় বহুদিন আগেকার সুর। কলেজ সময়কার সুর। কখনও সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে, ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা... সে রীতিমতো গুনগুন করে। বাইরের দিকে তাকিয়ে অপস্রিয়মাণ দোকান-বাজার-লোক আনমনে দেখতে দেখতে সুমনকে গায়—

কখনও সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে
ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা
অনেক দিনের পর মিলে যাবে অবসর
আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু'আনা।

একবার গায় সে। দু'বার গায়। এবং তৃতীয় বার গাইবার সময় মনে করতে পারে না পরের স্তবক। কী ছিল যেন! কী ছিল! কিছুতেই ধরা দেয় না শব্দগুলি।

সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান কত প্রিয় ছিল তখন। মুখস্থ হয়ে যেত একের পর এক। কী ভীষণ অনুপ্রাণিত হত তারা প্রত্যেকে। সব বন্ধুরা। টিউশ্যনের ঝক্কি গায়ে লাগত না। বাবার অসুখ, বোনের নীলাভ জীবন গায়ে লাগত না। সবসময় টগবগে, চনমনে ছুটতে থাকা এক। থিতিয়ে গেল কবে থেকে সব। বদলে গেল কত। চন্দ্রাবলীর নিরন্তর সান্নিধ্যে থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতে টান লেগে গেল তার। অতএব, যখন যতটুকু পারে, কিনে নেয় কিশোরী আমনকর, পদ্মা তলোয়ালকর, কিংবা উল্লাস কশলকর ও ভীমসেন যোশী। সে সবেও ধুলো পড়ে গেছে। শুচু শোনে না এসব। বিশ্বদীপও শোনে না। সে

কেবল একা একা এই সব এনেছিল ঘরে আর একা একা বিস্মৃত হয়েছে। নিজস্ব ভাল-লাগা প্রতিস্থাপন করেও সে ভুলে গেছে সমস্ত আকাশ। সুমনের গান। আর একটিও পুরোপুরি মনে নেই। রাগে-রাগিণীতে সে আর নোনাধরা জীবনকে ভরিয়ে রাখে না ভোরে। সে শুধু ভাবে। মৃত্যু সম্বল করে পাড়ি দেয় রোজকার পথ।

তবু আজ, জীবনের ভার অনেকটা নির্মল করে দেয় সুমনের মনে পড়া গান। ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা এই গোটা দিন চার হাজার টাকা হয়ে তার হাতে পোষা বেড়ালের মতো বসে থাকে। মিনি পুষিটির মতো সে টাকাদের গায়ে হাতও বুলিয়ে দেয়। তারপর সযত্নে ব্যাগে পুরে রাখে। গুনে গুনে একশো টাকার দুইখানি নোট তুলে জামার পকেটে রাখে। ট্যাক্সির ভাড়া হিসেবে। বাড়ি নিকটতর হয়। আর সে ভাবে। বুঁদ হয়ে ভাবে কী কী করবে এই টাকায়। থই পায় না। তার মনে হয় সমস্ত ছোট-ছোট চাহিদাগুলি পূর্ণ করা আছে। আর সমস্ত বড়-বড় চাহিদাগুলি চার হাজারে পূর্ণ হয় না। অতএব এই টাকা মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে টাকার কথা বলত চন্দ্রাবলী। অনেক টাকা পেলে কী কী করবে বলত। তার সেই দীর্ঘ তালিকায় শুভদীপের বাবা আর বোনকে বিদেশে না হোক, অন্তত ভেলোরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আনার কথাও বাদ যেত না।

আর তিন বছর বাদে বৃহস্পতির দশা আসছিল তার। সে স্থির করেছিল সেই সময় কোটি টাকার লটারি কিনবে। যদি লেগে যায়। বৃহস্পতির দশাই জীবনের সেরা সময়। তখন একটা লটারি লেগে যেতে পারে। ছোটখাটো প্রাপ্তি সে চায়নি। ধরা যাক, এক লাখ কি দু'লাখ সে চায়নি। সে চেয়েছিল—এমনই থেকে যাবে বরাবর। যেমন আছে। নিম্নবিত্ততায়। অথবা বৈভবের শিখরে থাকবে সে। কিছুটা পেল, যা সে খরচ করতেও পারল না প্রাণ খুলে, আবার যাকে রাখতেও বিবেকে বাঁধল—এমন কিছু সে চায়নি। শুভদীপ লোভী ভাবত চন্দ্রাবলীকে। টাকার স্বপ্নে বিভোর ভাবত। একদিন বলে ফেলেছিল,

এতই যখন টাকার চাহিদা তখন সে রবিদাকে ছেড়ে এল কেন!

চন্দ্রাবলী রাগ করেনি। কষ্ট পায়নি। শুধু চাপা স্বরে বলেছিল, সে কি জানে না, আত্মসম্মানের জন্য মানুষ সব করতে পারে! এক টানে ফেলে দেয় সব ইচ্ছা, সব স্বপ্ন, সব চাহিদা। জীবনে কখনও কখনও আসে এরকম প্রশ্ন। আত্মসম্মানের প্রশ্ন। আত্মসম্মানের বিনিময়ে সর্বস্ব খোয়াবার প্রশ্ন। সে কি জানে না? জানে না কি?

১১

দরজা খুলে দেয় শুচু। আর তার কপালে লিউকোপ্লাস্ট দেখে চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে সে। ট্যাক্সির ভাড়া একশো বিরাশি টাকা বাদ দিয়ে তিন হাজার আটশো আঠারো টাকা সে খরচ করবে শুচুর বিয়েতে।

শুচুর চিৎকারে মা ছুটে আসে দরজায়। ভাই আসে। আর দেবনন্দন। অসময়ে তাকে দেখে, কপালে লিউকোপ্লাস্ট দেখে আলোড়ন পড়ে যায়।

সে ঘরে আসে। বসে পড়ে বিছানায়। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার কথা, জ্ঞান হারাবার কথা গোপন করে যায়। শুধু লোহার দরজায় ধাক্কা লাগার কথা বলে। সকলকে বিচলিত হতে বারণ করে। মা চা করতে ছুটে যায়! ভাই গভীর চোখে জরিপ করে। শুচু চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। বারবার তাকে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করে। বাবা টিভি বন্ধ করে দেয়। আর দেবনন্দন লাজুক মুখে কাছে আসে। সে চিকিৎসকের কাছে যাবে কিনা জানতে চায়।

সে দেবনন্দনের হাত ধরে এবং যদিও তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল, তবু উঠোনে গিয়ে বসার প্রস্তাব দেয়। শুচু মোড়া পেতে দিতে যাচ্ছিল, সে তখন তাদের শতরঞ্চিখানা উঠোনে বিছিয়ে দিতে বলে। সে, দেবনন্দন এবং বিশ্বদীপ সেখানে বসে কথা বলতে পারবে তা হলে।

শুচু তার দিকে তাকায়। চোখে চোখে নীরব কথা বিনিময় হয়ে যায় তাদের, আর শুচুর মুখ চাপা হাসিতে ভরে ওঠে। সে মনের গভীরে ঢুকে পড়ে দেখতে পায়, বোনের সঙ্গে এই নিঃশব্দের ভাষা বিনিময়ে তার মন আলোয় ভরে যাচ্ছে। এ ভাষা একান্তভাবে তাদের। কারও এতে কোনও অধিকার নেই। এই বিশাল জগতের কোণে পড়ে থাকা তাদের নিঃস্বপ্রায় সংসারে আগলে রাখার মতো একান্ত নিজস্ব কিছু আছে এখনও। কত দিন, কত দুঃখ ও বেদনার স্মৃতি, কত উদ্বেগ, যন্ত্রণা ও কষ্টের উপলব্ধি তাদের তিন ভাইবোনকে একসঙ্গে বিষণ্ণ করেছে! একজন আরেকজনের সান্ত্বনা হয়েছে কতবার! যেন দুঃখের বিপুল বোঝা—তারা তিনটি ভাইবোন ভাগ করে নিয়েছে বলে হালকা হয়ে গেছে। আর শুধু দুঃখও তো নয়—কত যে উপকরণহীন মুখ, কত যে অকারণ হাসি— সব মিলে গড়েপিটে দিয়ে গেছে তাদের এ নিজস্ব ভাষা।

পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা দিনে আরও ভাল লাগা অতএব ঢুকে যায় প্রাণে। সে মার কাছে চিঁড়েভাজা আবদার করে বসে। কাঠখোলে ভাজা নয়। তেলে ভাজা। পেঁয়াজকুচি, কাঁচালংকা আর নুন দিয়ে ভাজা। মা-র কী যে হয়, আপত্তি করে না। শুভদীপের অন্তর নিঃসৃত ভাল-লাগা তারও অন্তর স্পর্শ করে বুঝি। এবং আহত ছেলের প্রতি মমত্ববোধে অনুভূতি কোমল হয়ে থাকে। অতএব সে বলে না, এতখানি চিঁড়ে নেই ঘরে, কিনে আনতে টাকা লাগবে। বলে না, তেলে টান পড়বে মাসান্তে। কোনও গোপন ভাণ্ডার থেকে টাকা নিয়ে সে বিশ্বদীপকে চিঁড়ে আনতে দোকানে পাঠায়। নিজে রান্নাঘরে বঁটি পেতে পেঁয়াজ কুটতে বসে। এইসব ছোটখাটো কাজের জন্য সে শুচুকে বলতে পারত। কিন্তু শুচু দেবনন্দনের কাছে-কাছে ঘুরছে। মায়ের ভাল লাগছে। তার মন বলছে শুভদীপ রাজি হবে। নিশ্চয়ই হবে। বড়ছেলের প্রতি বুক থেকে স্নেহ উপচে পড়ে তার। ছেলেটা ভাল। জানে সে। মনের গভীরে জানে। বড় শুদ্ধ ছেলে শুভ। বড়ই নরম। এবং একে-একে শুচু ও বিশ্বর প্রতিও স্নেহ ধাবিত হতে থাকে। সে মনে মনে বলে, তার সব সন্তানই ভাল। চমৎকার। অভাবে অভিযোগ

নেই, এতটুকু দাবি নেই, সারাক্ষণ হাসিমুখে আছে। শুধু বড়টাকে যেন গম্ভীর লাগে আজকাল। মনমরা। অন্যমনস্ক। মা কারণ বোঝে না। ভাবে, ছেলে বড় হলে বিয়ে দিতে হয়। কিন্তু অভাবের সংসারে বউ আনবে কি! শুতে দেবে কোথায়! নিয়মিত ডাল-ভাতও তো দিতে পারবে না। মা-র দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কী সুন্দর দেখতে তার ছেলেদের। চাঁদের কণারা সব। বাপের সমস্ত সৌন্দর্য খাঁজ কেটে বসানো। কিন্তু সংসারের হাল তো ফেরে না। মা-র চোখে জল আসে। মানুষটা কবে থেকে অসুস্থ। মেয়েটাও কী এক পোড়াকপাল নিয়ে জন্মাল! পেঁয়াজের ঝাঁঝে জল উপচে চোখ থেকে গালে নেমে আসে। কান্না আড়াল করে মা। পেঁয়াজের রস দিয়ে কান্নাকে আড়ালে রাখে। আর কপালে হাত ঠেকায়। যেন বিয়ে হয়ে যায় মেয়েটার। যেন শান্তিতে, সুখে থাকে তারা।

শুভদীপ পরিষ্কার হতে কলপারে যায়। তিনদিনের ছুটি নেবার সংকল্প করে সে। তার বিশ্রাম প্রয়োজন। কল থেকে মুখে জলের ঝাপটা দেবার জন্য কোমর ঝোঁকাতেই কপাল টনটন করে, মাথা ঘুরে যায়। কলের মাথাটি ধরে কোনও মতে সামলে নেয় সে।

বিশ্রাম চাই। তার বিশ্রাম চাই। বহু দিন ছুটি নেয়নি। সেই কবে, কত দিন আগে মাইথন গিয়েছিল ছুটি নিয়ে। সে আর চন্দ্রাবলী।

চোখে-মুখে ভাল করে জল দেয় সে। ঘাড়ে জল দেয়। পা ধোয়। তারপর ঘরে যায়। বিশ্বদীপ ফিরে আসে তখন। কিছু বাদামও এনেছে সে। নিজের টাকায়। মাকে পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর তখন মাদুরে বসে শুচু আর দেবনন্দন গাঢ় চোখে তাকাচ্ছে পরস্পর। তাদেরও তৈরি হয়েছে নিজস্ব নৈঃশব্দ্যের ভাষা, পৃথিবীতে এই ভাষাই সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং ভঙ্গুর।

শুভদীপ এসে মাদুরে শুয়ে পড়ে তখন। শুচু তার আদেশমতো বালিশ আর চাদর আনতে যায়। শীতের পোশাক কেউই চড়ায়নি গায়ে এখনও। তবু তার শীত-শীত করে। বিশ্বদীপ একধারে বসে সিগারেট ধরায়। আর শুভদীপ আচমকা দেবনন্দনকে মূর্খ সঙ্গমকারী বলে গালাগালি দিয়ে ওঠে। শুচুর প্রসঙ্গ দেবনন্দন তার কাছে এড়িয়ে

গিয়েছে বলে কৃত্রিম ক্ষোভে ফেটে পড়ে সে। দেবনন্দন লাজুক হাসে। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে অপারঙ্গমতা কবুল করে। ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করতে থাকে, অনেক বার বলবে বলে ভেবেছে। পারেনি। কেন পারেনি সে জানে না।

শুচু বালিশ ও চাদর নিয়ে আসে। শুভদীপ তাকে ঘরে যেতে নির্দেশ দেয়। শুচু দেবনন্দনের চোখে চোখ রেখে কোনও এক আকুতি অর্পণ করে চলে যায়। মা চিঁড়েভাজার বাটি সাজিয়ে নিয়ে আসে। তারা চা খাবে কি না জানতে চায়। সে মাকে চা নিয়ে এখানে বসতে অনুরোধ করে। সকলেই অনুমান করে অতঃপর কী হতে চলেছে। একটি উদ্বিগ্ন আবহ ঘুরপাক খেতে থাকে উঠোনে। বিশ্বদীপ হাওয়া হালকা করার জন্য নিজের চাকরির কথা পাড়ে। সম্ভাব্য চাকরির সুবিধা-অসুবিধা জানিয়ে দেবনন্দনের মতামত চায়। এর আগেও তাদের মধ্যে এই কথা হয়েছে। আজও হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তবু আবারও একই প্রসঙ্গে তারা কথা বলে। দেবনন্দনও তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুলে বলে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সে নিজের বাড়ির একতলায় একটি সাইবার কাফে খুলবে। বিশ্বদীপ তার ভাবনাকে সমর্থন জানায়। শুভদীপ চুপ করে থাকে। যা-যা বলতে হবে সব মনে মনে সাজিয়ে নেয়। তখন শুচু চা নিয়ে আসে। গ্যাসের কাছে যেতে দেওয়া হয় না তাকে। তাই সে বাহকমাত্র। শুভদীপ শুচুকে দেখতে দেখতে এ কথাও বলবে বলে ভাবে যে শুচু রান্না করতে পারবে না। হঠাৎই সে দেবনন্দনের প্রতি বন্ধুত্ব অনুভব করে না আর। অভিভাবকত্বের বোধ তাকে একটি পৃথক সত্তায় টেনে আশৈশবের বন্ধুত্বের থেকে আড়াল করে দেয়। সে টের পায়, এমনই কোনও আড়াল থাকায় দেবনন্দনও তাকে কিছু বলতে পারেনি। অনেকবারের মতো আরও একবার সে উপলব্ধি করে, যতই সচেতনভাবে অস্বীকার করা যাক, সমস্ত মানুষের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে সমাজ-সংসার। কিছু কিছু অস্বীকারের পর থাকে যোজনবিস্তৃত স্বীকারের দায়। নিজের অজান্তেই সেই সব স্বীকারের ভার কাঁধে নিয়ে পথ চলে মানুষ।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মা এসে বসে। শুচু চলে যায়। মা আসন্ন আলোচনার প্রাক্কালে বিষাদ অনুভব করে। যে-কাজ তার বড় ছেলে করতে যাচ্ছে এখন, সেই কাজ করার কথা ছিল যার, সে এখন অদ্ভুত অসুখে সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে টিভি দেখছে ঘরে। সে বড় বেদনায়, বড় বিচলনে বলে ফেলে বিশ্বদীপ, শুভদীপের বাবাকে একবার ডাকা হবে কি না। শুভদীপ কিছু বলার আগেই বিশ্বদীপ নাকচ করে দেয়। শুভদীপ নীরব সমর্থন করে। মা আর কথা বাড়ায় না। মনে মনে লজ্জিত হয়। এই আসরে স্বামীকে আনার কথা বলা কোনও প্রগলভতা হয়ে গেল কি না সে বুঝতে পারে না। জড়সড় হয়ে সে শুভদীপের মাথার কাছে বসে।

দেবনন্দন বিয়েটা কবে নাগাদ করতে চায়, এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করে শুভদীপ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জানায় দেবনন্দন। যদি তারা রাজি থাকে তবে সে কালই শুচুকে বিয়ে করে নিতে চায়। এই শীঘ্রতার কারণ সে নিজেই ব্যাখ্যা করে। শুচুর সময় কম সে জানে, সময় অনিশ্চিত তা-ও সে জানে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে শুচুকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায়। মা জিজ্ঞেস করে এ বিষয়ে দেবনন্দনের আত্মীয়দের মতামত আছে কি না। দেবনন্দন সরাসরি তাকায়। জানিয়ে দেয়, আত্মীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না সে। পরোয়াও করে না। তার বাবা-মা যখন চলে গেল পর পর, সে তখন একুশ পেরোয়নি, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল যেই, আত্মীয়রা পাততাড়ি গুটোল, এমনকী বছরে একবার খোঁজ নিত কি না সন্দেহ নেই। কারণও অবশ্য ছিল, বাবার রেখে যাওয়া টাকা ও বাড়ির বিষয়ে কাকা, মামা ও পিসিদের আগ্রহ দেখে সে শক্ত ব্যবহার করেছিল। সে একাই সামলাতে পারবে সব—এমন ঔদ্ধত্য অনায়াসে দেখিয়েছিল। সে মনে করিয়ে দেয়, তার যখন টাইফয়েড হয়েছিল, হাসপাতালে নিতে হয় তাকে, খবর দেওয়া সত্ত্বেও দেখতে আসেনি কেউ। তখন শুভদীপ ও শ্যামলিম তার দেখাশুনো করে। জলবসন্ত হল যেবার, সেবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মা মনে করতে পারে সবই। সেই সময় তারা এমনকী আলোচনাও

করেছিল নিজেদের মধ্যে যে দেবনন্দনের আত্মীয়রা ভাল নয়।

দেবনন্দন বলে যায়, বিয়ে হলে সে এমনকী জানাবেও না কারওকে। লৌকিকতা বলতে বন্ধুদের খাইয়ে দেবে একদিন। শুভদীপ অভিভাবকসুলভ গাম্ভীর্যে মনে করিয়ে দেয় তখন। শুচু কোনও ভারী কাজ করতে অক্ষম। এমনকী রান্নাও সে করতে পারবে না। সাধারণ দু'কাপ চা-ও না। উনুনের পারে থাকা নিষিদ্ধ তার পক্ষে। তাকে নিয়মিত নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। চিকিৎসকের কাছে। নিয়মিত দিতে হয় ওষুধ। তার প্রতি নজর রাখতে হয়, কখন বেড়ে ওঠে রোগ। আর বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে যায় সে। এখানে যেমন আছে শুচু, যতখানি যত্নে ও আদরে, ততখানি পারবে কি দিতে, দেবনন্দন, এমন প্রশ্নও করে বসে।

প্রত্যেকেই তার এই স্পষ্টভাষে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মনে মনে এই ভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না। দেবনন্দন মাথা নিচু করে থাকে। বহুক্ষণ। তারপর মুখ তোলে। আলোর আভায় করুণ দেখায় সেই মুখ। সে শান্তভাবে বলে, সে জানে, সমস্তই জানে। সে তো শুচুকে দেখে আসছে প্রায় তার বালিকাবেলা থেকেই। শুচুর অনাদর সে হতে দেবে না এতটুকু, এমন কথাও সে দিয়ে বসে। যেন অপরাধী হিসেবে শনাক্ত সে আর তাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়া হচ্ছে নানান প্রতিজ্ঞা।

মা তখন সান্ত্বনাবাক্য বলে। বলে যে তারা সবাই সম্পূর্ণ আস্থা রাখে দেবনন্দনের ওপর। তবু শুচুর দাদা হিসেবে এই কর্তব্য করে নিচ্ছে শুভদীপ। বন্ধুত্বের খাতিরে করে নিচ্ছে, আত্মীয়তার খাতিরে করে নিচ্ছে।

দেবনন্দন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিছু-বা অভিমানী দেখায় তার মুখ। মা তখন ঘোষণা করে আরও একটি কথা আছে তার। এবং দেবনন্দনের হাত জড়িয়ে ধরে মা। অনুনয় করে বলে, মেয়েকে তারা কিছুই দিতে পারবে না সাজিয়ে- গুছিয়ে। এমনকী একটি খাটও নয়। অতি সামান্য যা সঙ্গতি আছে তা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আগলে রাখতে হবে। দেবনন্দন মাথা নিচু করে রাখে। কোনও কথা বলে না। হ্যাঁ-না বলে না।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এ বারে কথা বলে বিশ্বদীপ। প্রতিবাদের সুরে বলে—কেন এত কথা! দেবনন্দন তাদের চিরকালের চেনা। এত দিন ধরে আসছে-যাচ্ছে, তাদের কোন কথাটা জানে না দেবনন্দন। তা হলে নতুন করে এই সমস্ত নাটকের মহড়া কেন!

আবারও এক স্তব্ধতা নেমে আসে। বিশ্বদীপ মাকে তারিখ ঠিক করে ফেলার নির্দেশ দেয়। মা শুভদীপের দিকে তাকায়। শুভদীপ উঠে বসে। দেবনন্দনকে জড়িয়ে ধরে। শুচু চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে—এ ভাবনা তাকে আবেগপ্রবণ করে দেয়। চোখের জল উপচে দু'-এক ফোঁটা দেবনন্দনের পোশাকে পড়ে যায়। সে মুখ তুলতে চায় না তৎক্ষণাৎ। আবেগপ্রবণতা প্রকাশ করতে চায় না। দেবনন্দন বন্ধুর বিহ্বলতা টের পায়। এবং তারা কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ, পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে চুপ করে থাকে।

অতঃপর উঠে আসে শুভদীপ। হাসে। শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হাসি। মাকে সেও দিন ঠিক করতে বলে দেয়। উজ্জ্বলতম দেখায় মায়ের মুখ। আকর্ণবিস্তার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে যায় অভিব্যক্তি। এবং এক-একটি মুক্তোবিন্দু চোখ থেকে ঝরে পড়ে। একই সঙ্গে হাসিতে কাঁদে আর কান্নায় হাসতে থাকে মা। এবং উঠে দাঁড়ায়। আঁচলে জল মোছে। শুভদীপ-বিশ্বদীপের বাবাকে খবরটা দিতে হবে বলে ঘরের দিকে পা বাড়ায় আর যেতে যেতে শুচুকে নির্দেশ দেয় কাপ ও চিঁড়েভাজা-খাওয়া বাটিগুলো তুলে নিতে।

তারা তখন আলোচনা করে। বিবাহের দিন ও উত্তরপর্ব নিয়ে আলোচনা করে। শুভদীপ জানতে চায়, এই তিনদিনের মধ্যেই বিয়েটা সম্পন্ন করা যায় কিনা, কারণ সে ছুটি নেবে। সবটাই নির্ভর করছে মায়ের ওপর। বিশ্বদীপ বলে। কারণ শুভ দিনক্ষণ দেখতে চাইবে মা। তখনি মা এসে পড়ে। বাবা সব শুনে অত্যন্ত খুশি— এ সংবাদ পরিবেশন করে যায়। পাশের বাড়ির জ্ঞাতি জ্যাঠাইমার কাছ থেকে পঞ্জিকা আনতে ছোটে। আলিবাবার বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় শুভদীপের। প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে জঙ্গল থেকে আলিবাবা ফিরে এলে পর বউ যেমন কাশেমের বাড়ি কুনকে আনতে ছুটেছিল!

ব্যয়বাহুল্যে তাদের বাড়ির সমস্ত পালাপার্বণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কবেই। পঞ্জিকাও লাগে না তাই। শুভদীপের ভয় হয়, মা হয়তো আনন্দে বলে বসতে পারে, শুচুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের সব ঠিকঠাক, বিয়ের সম্বন্ধ দেখা চলছে, বিয়ের বাজার করতে যেতে হবে, বিয়ের জোগাড়— এই সব কাজে মেয়েদের ক্লান্তি নেই। উৎসাহ আকাশপ্রমাণ। মা যদি বলে দেয়, তবে লৌকিকতার দাবি উঠতে পারে। সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী হয়তো তখন নতুন মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করতে এল। সে এত বড় খরচ সামলাতে পারবে না। আশীর্বাদ করতে এলে তাকেও তো অন্তত মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

দেবনন্দন কথা বলে তখন। বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করতে চায়। শুভদীপ দৃঢ়স্বরে না বলে। বিয়ের দিনের খরচ সমস্তই তার। দেবনন্দন জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। শুভদীপ জানতে চায় দেবনন্দন অগ্নিসাক্ষী করতে চায় কিনা। দেবনন্দন অসম্মতি জ্ঞাপন করে। বিয়ে নিবন্ধীকরণ করবে সে। তারা আলোচনা করে তখন। তিনজনের আলোচনায় স্থির হয়, যে দিনই ঠিক হোক— দেবনন্দন সকালবেলা চলে আসবে এ বাড়ি। শুচুকে নিয়ে তারা চলে যাবে শিবানী মায়ের মন্দিরে। সেখানে শুচুকে সিন্দূর দেবে দেবনন্দন। বিকেলে যাবে বিবাহ নিবন্ধকারের কাছে। রাতে সকলে বাইরে খেয়ে ফিরবে।

মা তখন পঞ্জিকা নিয়ে আসে। জেঠিমা ছিল না বাড়িতে। তাই কেউ কিছু জিজ্ঞেস করারও ছিল না। মা চোখে চশমা এঁটে ঘরে বসে পঞ্জিকা দেখে কিছুক্ষণ। তিনদিন পর একটি শুভদিন পাওয়া যায়। এটা অগ্রহায়ণ মাস। শুচু এ মাসে জন্মায়নি। মা দেবনন্দনের জন্মমাস জানতে চায়। সে জানায় তার শ্রাবণ। অতএব তিনদিনের পরের দিনটি স্থির হয়ে থাকে। শুভদীপ স্থির করে, তিনদিন নয়, সে চারদিন ছুটি নেবে।

১২

কত অগ্রহায়ণ পার করে এসেছে তারা। কত শীত ঋতু। কিন্তু এ রকম সকাল তাদের উঠোনে, তাদের ঘরে, পরিবারে আসেনি কখনও। কী আশ্চর্য প্রসন্ন এ সকাল! কী সুন্দর! ঘুম থেকে উঠে উঠোনে দাঁড়াতেই তার মনে হল—আজকের রোদ্দুর খুব খুশি। পাঁচিলের পলেস্তারা খসে যাওয়া ইট থেকে যেন আভা বেরোচ্ছে। কলতলাটা কী আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন। যেন এক বালতি সুখ এসে ধারাস্নান রচনা করছে কলের তলায়। আকাশ কী রকম আনন্দ-আনন্দ! পাখিরা কীরকম আনন্দ-আনন্দ। সুবল রোজকার মতোই বলছে, হরে-হরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, বলছে তাকে ছোলা দেওয়া হোক, লংকা দেওয়া হোক, উঠোনের কোণে শালিক-চড়ুই কিচকিচ করছে, এধার থেকে ওধারে উড়ে যাচ্ছে কাক। সবই হুবহু রোজকার মতো কিন্তু যেন রোজকার মতো নয়। সুবলের এই ডাকের মধ্যে জীবনের এক গাঢ় ইঙ্গিত যেন আছে। কাক-শালিক-চড়ুইয়ের আনাগোনা আর ডাকাডাকির মধ্যে যেন আছে প্রাণের আশ্চর্য ব্যাখ্যা।

তাদের ঘরগুলিতে তোরঙ্গ থেকে ভাল বিছানার চাদর, টেবিল-ঢাকনা বার করে পেতে দেওয়া হয়েছে। ফুলদানিতে বড় বড় রজনীগন্ধার ছড়া। জিনিসে ঠাসা ঘর তাদের, সেজে উঠেছে নতুন সাজে। কী সুন্দর লাগে একটু সাজালে-গোছালে! যেন অগ্রহায়ণের সাজ-পরা রোদ্দুরই আধখানা ঢুকে পড়েছে ঘরে। ফুলদানি থেকে রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাকে যেন খুঁজে ফিরছে একা একা। বিশ্বদীপ সানাইয়ের ক্যাসেট চালিয়ে দিল আর তক্ষুনি সারা বাড়ি ভরে গেল হুলুধ্বনিতে। আর রজনীগন্ধার গন্ধ মিশে গেল সুরে। তার একাকীত্ব ঘুচল। যেন এতক্ষণ সুরেরই আরাধনা করছিল সে।

তাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেবার জন্য তাড়া লাগাল মা। বাজার করতে হবে। ন'টা নাগাদ এসে পড়বে দেবনন্দন। তারা শিবানী মায়ের মন্দিরে যাবে।

সকাল-সকাল স্নান সেরে নিয়েছে মা। কপালে সিঁদুরের টিপ

দিয়েছে বড় করে। চুল খুলে দিয়েছে। সেই চুল ঠাকুরের চুলের মতো ছড়িয়ে আছে পিঠময়। লাল পাড় সাদা খোল সুতির শাড়ি পরেছে মা। সন্ধেবেলায় পরবে কোরা রঙের ওপর লালপাড় ধনেখালির তাঁত।

মা জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, কত টাকা সে খরচ করতে পারবে। সে না ভেবেই বলেছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা। সঠিকভাবে ধরলে তিন হাজার আটশো আঠারো টাকা। মা অবাক তাকিয়েছিল। আর তার হাত উঠে গিয়েছিল কপালে। সে মনে মনে সেই দুই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিয়েছিল আবার। হয়তো তাঁদের সঙ্গে কোনও দিনই আর দেখা হবে না তার।

মা একটু ভেবেছিল তখন, সংসারের হিসেব রাখতে রাখতে মা এখন পাকা হিসেবি। মনে মনে দ্রুত যোগ-বিয়োগ করে নিতে পারে। ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্টে মাত্র দু'হাজার পড়ে আছে। তার থেকে এক হাজার তুলে ফেলতে চায় মা। শুচুর জন্য একটা ভাল রেশমি শাড়ি কিনে দিতে বলে।

সে আর বিশ্বদীপ মিলে কিনে এনেছে শাড়ি। হলুদ জমি। লালের ওপর সোনালি জরির কাজ করা পাড়। এ ছাড়া ফুলিয়ার তাঁতও নিয়েছে একখানা। লালজমি। সোনালি চওড়া পাড়। তারা দু'জন কতখানি শাড়ি পছন্দ করতে পারত তার ঠিক ছিল না। শুচুই পরামর্শ দেয় মিঠুকে সঙ্গে নেবার জন্য। মা জানে না মিঠুর কথা। অতএব মিঠু বাইরে থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এবং মিঠুরই পরামর্শে তারা কিনে নেয় শাড়ির সঙ্গে রং মেলানো ব্লাউজ ও শায়া ইত্যাদি। আজ বিকেলেও সঙ্গে যাবে মিঠু। কারণ বাবাকে আগলানোর জন্য মা থাকবে বাড়িতে। মা যাবে না। দেবনন্দনের সহচর হিসেবে সঙ্গে যাবে শ্যামলিম আর প্রণয়।

দেবনন্দনের জন্য পাজামা-পাঞ্জাবি কিনেছে সে। সঙ্গে ভাই আর বাবার জন্য। আর মায়ের শাড়িখানা। সব কিনতে তার বেরিয়ে গেছে বারোশো টাকা। মিঠু সঙ্গে ছিল বলে তারা একটু খাওয়া-দাওয়াও করেছে বাইরে। সব মিলিয়ে আরও গিয়েছে দেড়শো। তার জন্যও একটি পাঞ্জাবি পছন্দ করে জোর করছিল মিঠু। তার ভাল পাঞ্জাবি

আছে। আকাশি রং। গলায় কাঁথার কাজ করা। চন্দ্রাবলী দিয়েছিল তাকে। জিনসের ওপর পাঞ্জাবি চন্দ্রাবলীর প্রিয় পোশাক ছিল। আজ সেই পোশাকই পরে যাবে সে। যদিও আরও বেশি শীত পড়লে সে জিনস পরবে না স্থির করেছিল কিন্তু আজকের দিন ব্যতিক্রম। আজ সে সমস্ত সুন্দরের মধ্যে দিয়ে যাবে। আজ সে জীবনকে মৃত্যুর থেকে আলাদা করে ভাববে না। একটি বিশেষ দিনের জন্য নিজেকে এমন আলাদা করে নেওয়া আপাদমস্তক— এর মধ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে সে দেখতে পাচ্ছে কোনও এক অনির্বচনীয়কে। কেন, সে তা জানে না, কীভাবে, তা-ও জানে না সে। বিবাহ— তা সে যারই হোক, যেমনই হোক— তার মধ্যে থেকে কি বিচ্ছুরিত হয় এক সপ্রাণ রশ্মি যা মানুষকে পুলকিত করে?

সে বাজার যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তাকের ওপর তোলা ঠাকুরের পটের কাছে দাঁড়িয়ে ফুল সাজাচ্ছিল মা। আজ একটু বেশি ফুল পড়েছে। মায়ের পায়ের কাছে বসে চন্দন ঘষছিল শুচু। ঠাকুরের জন্য। শাড়ি পরেছে শুচু আজ। তারও পিঠময় ছড়ানো কালো চুল। ভেজা। টিপ পরেছে কপালে। নতুন করে শ্রী লেগেছে তার মুখে। নতুন করে লাবণ্যময়। তার চোখ দুটি বড় বড় লাগছে। থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ছে সে। চন্দন ঘষার পরিশ্রম সহ্য করতে পারছে না। বিশ্বদীপ শুচুকে সরিয়ে নিজে চন্দন ঘষতে বসে যাচ্ছে তখন। আর মা হাঁ-হাঁ করছে। গেল-গেল করছে। বিশ্বদীপ স্নান করেনি। আর বিশ্বদীপ হাসছে। হাসতে হাসতে গঙ্গাজল এক গণ্ডূষ হরলিকসের বোতল থেকে ছিটিয়ে নিচ্ছে মাথায়। আর মা শান্ত হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাজলে সব পবিত্র হয়ে যায়।

শুচুর দিকে তাকিয়ে তীব্র কষ্ট হল তার। নিজেদের অক্ষমতা যন্ত্রণার হতে থাকল। বেনারসি শাড়ি নেই, গয়না নেই, আলোকসজ্জা নেই, একশো লোকের নিমন্ত্রণ নেই— তাদের বোনের বিয়ে হচ্ছে। একটিমাত্র বোন তাদের— ন্যাড়া করে বিদায় দিচ্ছে তারা।

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে সে। ব্যাগ নিয়ে, টাকা নিয়ে

বাজারে বেরিয়ে যায়। মা তার পিছু ডাকে এবং একটি ফর্দ ধরিয়ে দেয়। তারা ছাড়াও আজ অতিরিক্ত তিনজন। দেবনন্দন, শ্যামলিম, প্রণয়। সকলেই চেনা। সকলেই এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। তবু আজ তারা বিশেষ অতিথি। বাবা আজ স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছে পাশের ঘরে। ছোট ঘরে। দেবনন্দনের বাড়িতে আজ রান্না-বান্না নেই। তাই সে, মায়ের সাহায্যের জন্য নদামাসিকে পাঠিয়ে দিয়েছে এ বাড়ি। টাকা বাঁচাবার জন্য মা কোনও ঠিকে-ঝি পর্যন্ত রাখেনি। সমস্তটাই নিজে করে। একা সামলায়।

বাজারের পথে যেতে যেতে শুচুর কথা সে ভাবতে থাকে আবার। শুচুকে কিছুই দিতে পারল না তারা। একজোড়া নতুন চটি পর্যন্ত না।

একটি পাথরে হোঁচট খায় সে। আর তার মধ্যে দেখা যায় স্ববিরোধ। বিদায়-ই কি! শুচু তো থাকবে এ পাড়াতেই। তারই প্রিয় বন্ধুর বাড়ি। শুচু চাইলেই এ বাড়িতে চলে আসবে। তারাও যেতে পারবে ইচ্ছে করলেই। আর বিয়ে তো একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। যৌনতার আইনগত স্বীকৃতি। তার সঙ্গে এত জিনিসপত্র, দ্রব্যাদি জড়িয়ে দেওয়া কেন!

নিজেকে শাসন করে সে। প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী— এমনই সে মনে করত নিজেকে। অথচ ইদানীং, প্রতিদিনই সে আবিষ্কার করছে, সে নিজে গতানুগতিক ধ্যানধারণার বাইরে নয়। চিরাচরিত রীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারও আবেগ এবং অস্তিত্ব। কেন দিতে হবে বেনারসি? কেন দিতে হবে গয়না? কেন দিতে হবে খাট-পালঙ্ক?

তবু, এইসব ভাবনা ছাপিয়ে আবার অন্য ভাবনা এসে পড়ে। দিন ফিরলে সে শুচুকে অনেক কিছু গড়িয়ে দেবে এমন সংকল্প এসে যায়। আর চারদিন বাদে কাজে যোগ দেবে বিশ্বদীপ। হয়তো সে দাঁড়ালে তাদের দিন ফিরবে। নিজের গভীরে সে উপলব্ধি করে, শুচুকে উপহারে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে তার। এবং উপহারের মধ্যে নিহিত থাকে হৃদয়ের কোনও বার্তা তা-ও যেন একটু একটু করে বোধগম্য হচ্ছে।

তাকে অনেক উপহার দিত চন্দ্রাবলী। আর মহুলি কিছুই দিত না।

শুধু তাকে জিজ্ঞেস করত সে কোন রং পছন্দ করে। কোন রং চায়। সে বলত। পরদিন মহুলি সেজে আসত সেই সব রঙে। টিপ থেকে শুরু করে, চুলের ক্লিপ, ব্যাগ, সালোয়ার-কামিজ, জুতো— সব এক রঙের। তার চোখ ধাঁধিয়ে যেত। সে মুগ্ধ চোখে তাকাত মহুলির দিকে। মহুলি তাকে আহ্বান করত। সে একটা অদ্ভুত আবেগে ছটফট করত তখন। দিশেহারা লাগত তার। মহুলির বুকে মুখ ঘষত সে। কামিজের ওপর দিয়ে কামড়ে ধরত স্তন। মহুলি চুল খামচে ধরত তার। তার হাত যোনি স্পর্শ করতে চাইত। ঠিক সেই মুহূর্তে মহুলি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত তাকে। কেউ এসে যেতে পারে বলে ভয় দেখাত। সে তখন কাতর, বড় কাতর হয়ে তাকিয়ে থাকত মহুলির দিকে। সুন্দরী মহুলি সৌন্দর্যে অপার্থিব হয়ে উঠত তখন। আর সে, জানে না কেন, মনে মনে চন্দ্রাবলীকে বকে উঠত। যেন চন্দ্রাবলীর দোষেই সে মহুলিকে পেতে পারছে না পুরোপুরি। এবং যেহেতু মহুলি উপহার দেয় না তাকে, কিন্তু চন্দ্রাবলী দেয়, সেহেতু উপহার না দেওয়াকেই সে মনে করত ন্যায্য এবং এক-একদিন টানা এক ঘণ্টা চন্দ্রাবলীকে উপহার নিয়ে বকাবকি করত।

চন্দ্রাবলীর মুখে ছায়া পড়ত তখন। অন্ধকার মুখ হয়ে উঠত গাঢ় অন্ধকার। সহ্য করতে-করতে একসময় ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠত সে, উপহার আসলে অভিব্যক্তি। ভালবাসার অভিব্যক্তি। ভালবাসার মধ্যে পাবার জন্য কাঙালপনা যতখানি আছে, তার দ্বিগুণ আছে দেবার আর্তি।

প্রেম-ভালবাসার ভাবনায় বড্ড বেশি ডুবে থাকত কালো-কদাকার মেয়েটা।

মাছের বাজারের হাঁক-ডাক কানে এল তার। আর, এতদিনের মধ্যে, এই প্রথম, বড় মাছ কিনবে বলে সে মাছের বাজারে এসে দাঁড়াল বুক ফুলিয়ে।

চুলে খোঁপা করে রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে দিয়েছে নদামাসি। শীর্ণ হাতগুলিতে মা পরিয়ে দিচ্ছে শাঁখা-পলা-নোয়া। তুলিতে আলতা চুবোচ্ছে নদামাসি, এখন শুচুকে পরিয়ে দেবে। ফোলানো-ফাঁপানো লাল জরিপাড় তাঁতের শাড়িতে সমস্ত শীর্ণতা ঢেকে গিয়েছে শুচুর।

পান মুখে পুরে, স্নান সেরে, পাড়হীন গরদের শাড়ি পরে বড় জেঠিমা এলেন পাশের বাড়ি থেকে। মা-ই ডেকে এনেছে। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে একটুও না জানালে হয়? বড় জ্যাঠামশাই মরে গিয়ে, জেঠিমাই এখন সকলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। শুচুর কপালে চুমু খেলেন তিনি। শুচু প্রণাম করল। একজোড়া ঝোলানো কানের দুল তিনি পরিয়ে দিলেন শুচুকে। ওতে অনেকখানি সোনা আছে জানাতেও ভুললেন না।

জেঠিমাকে বসতে বলে মা তখন খাটের তলা থেকে টেনে আনল ট্রাঙ্ক। চাবি দিয়ে তালা খুলল। একবার তাকাল নদামাসির দিকে। নদামাসি শুচুকে আলতা পরাচ্ছে তখন। মা তাড়া লাগাল। মাছ পড়ে আছে। ধুতে হবে। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা পড়ে আছে। আসলে মায়ের একান্ত সম্ভার নদামাসির সামনে খুলতে পারছে না মা। যদিও দেবনন্দনের শৈশব থেকেই রয়ে গিয়েছে নদামাসি, আর দেবনন্দনের সংসার সামলাবার সমস্ত ভার তারই ওপর, তবু মা নদামাসিকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

নদামাসি এই জটিল ইঙ্গিত ধরতে পারে না। সে সরল ভাবেই মাকে ধমকে দেয়। আলতা অর্ধেক পরিয়ে উঠে গেলে এয়োস্ত্রীর অকল্যাণ হয়— সে মনে করিয়ে দেয় মাকে। মা বসে থাকে। কখন নদামাসি চলে যাবে তার জন্য অপেক্ষা করে। জেঠিমা উদাস মুখে পান চিবোন। মায়ের এই আচরণ সমর্থন করছেন কিনা বোঝা যায় না।

আলতা পরানো শেষ হলে নদামাসি উঠে চলে যায়। আর একটু পরেই একজোড়া রুপোর মল এনে পরিয়ে দেয় শুচুর পায়ে। দেবনন্দনের বউকে তার আশীর্বাদ। শুচু নেমে প্রণাম করে

নদামাসিকে। আর নদামাসি হইহই করে ওঠে। প্রবল আপত্তি জানায়। মলজোড়া দেখে মায়ের মুখ নরম হয়ে যায়। মা তখন শুচুকে সমর্থন করে। নদামাসিকে প্রণাম করাই যে শুচুর কর্তব্য এমন বলে। একজোড়া রুপোর মল নদামাসিকে মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় এবং বিশ্বাসভাজন করে তুলেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অত্যন্ত সহজ ভাবে এই পটপরিবর্তন ঘটে আর নদামাসি শুচুর কপালে চুম্বন করে সুখের প্রার্থনা জানাতে জানাতে চলে যায়।

ট্রাঙ্ক থেকে একটি নীল ভেলভেটের বাক্স বার করে মা তখন। জেঠিমা স্মৃতি হাতড়ে গড় গড় করে বলে যান কী কী গয়না ছিল মায়ের। প্রশ্ন করেন, সব আছে কি না। মা মাথা নাড়ে। আছে। হাজার অসুবিধাতেও মা গয়নায় হাত দেয়নি। আগলে রেখে দিয়েছে। দুই ছেলের বউ আর শুচুর জন্য। শুচুর বিয়ের জন্য।

এই সব দেখতে-দেখতে শুনতে-শুনতে শুভদীপ আশ্চর্য হয়ে যায়। মা কি তবে ভাবত, স্বপ্ন দেখত, শুচুর বিয়ে হবে!

মা তখন একটি বিছেহার বার করে এবং শুচুর গলায় পরিয়ে দেয়। একজোড়া কাঁকন ও সরু সরু চারগাছা চুড়ি বার করে পরিয়ে দেয় শুচুর হাতে। একটি লাল পাথর বসানো আংটি শুচুর অনামিকায় পরাতে চায়, হয় না। মধ্যমায় পরাতে চায়, হয় না। অবশেষে মায়ের অনামিকার আংটি শুচুর তর্জনীতে থিতু হয়। মা শুচুর চিবুক তুলে ধরে। শুচু মায়ের চোখের দিকে তাকায়। মা ও মেয়ের দৃষ্টিতে দৃষ্টি লেগে থাকে দীর্ঘক্ষণ। দু'জনেরই মুখ থেকে আস্তে আস্তে খুশি মুছে গিয়ে কারুণ্য আসে। দু'জনেরই চোখ জলে ভরে যায়। একবার মা ডেকে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুচু। মা তাকে বুকে সাপটে নেয়। দু'জনেই নিরুদ্ধ 'আবেগে, কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে। শুভদীপ দেখে, চোখে হাত-চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল বিশ্বদীপ। আর জেঠিমারও চোখ ভরে এসেছে জলে। চশমা খুলে ফেললেন তিনি। এক হাত শুচুর পিঠে রাখলেন। শুচু ছোট ছিল যখন, কত ভালবাসত জেঠিমাকে, আর বিনুনি বাঁধার ছলে জেঠিমার রাশিকৃত চুলে জট পাকিয়ে ফেলত— বলতে থাকেন তিনি। আর বলতে বলতে তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে

আসে। কত শরিকি ঝামেলা, কত ছোটখাটো স্বার্থের হানাহানি, কত নিন্দে ও মন কষাকষি—তার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। জেঠিমার মনের মধ্যে শুচুর জন্য এতখানি ভালবাসা ছিল—শুভদীপ ভাবতেও পারে না।

তখন নদামাসি এসে দাঁড়ায় দুয়ারে। তারও গাল ভিজে যাচ্ছে চোখের জলে। শুভদীপ স্থির হয়ে বসে থাকে। ভাবে। কান্না সংক্রামক। শুনেছে সে। কিন্তু এত কান্না কেন! বিয়ে হলেই এত কান্না কেন! হয়তো, যে চলে যাচ্ছে শুধু তার জন্য কান্না নয়। কান্না নিজেরও জন্য। যারা কাঁদে, তাদের প্রত্যেকেরই, জন্ম থেকে চারিয়ে যাওয়া শিকড় উপড়ে, ছিন্ন করে নিয়ে আসার পুরনো, থিতিয়ে যাওয়া বেদনা নতুন করে মনে পড়ে। তখন, বর্তমানের বেদনা অতীতের কষ্টের সঙ্গে মিশে থৈ-থৈ হয়ে যায়। চকিতে মালবিকা নামে মেয়েটিকে তার মনে পড়ে যায়। মালবিকাদের বিয়ে হবে না কখনও। তারা শুধু ছিন্ন নয়, উৎপাটিত এবং ছুড়ে ফেলে দেওয়া।

কান্নার দমক সামলে মা তখন শুচুকে সব বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে আসার জন্য নির্দেশ দেয়। শুচু বড় জেঠিমাকে প্রণাম করে, মাকে প্রণাম করে এবং শুভদীপ কিছু বোঝার আগেই তাকেও প্রণাম করে বসে।

এই প্রথম। এই প্রথম তার বোন তাকে প্রণাম করছে। সে উঠে দাঁড়ায়। নিজের মধ্যেকার শত যুক্তি, শত আলোচনা সত্ত্বেও তার মনে হয়, দাদা হিসেবে বোনকে কিছু দেওয়া উচিত ছিল তার। সে শুচুর দু'কাঁধে হাত রাখে। নতুন নকশা নেই, পালিশ করা নেই, পুরনো গয়না, তবু তারই আঁচে শুচু যেন বহুগুণ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। ওই নীলচে, শীর্ণ, ক্ষয়াটে শরীরেও যে এত সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকতে পারে ধারণা ছিল না তার। সে শুচুর গালে হাত রাখে এবং চোখের জল মুছিয়ে দেয়। আর হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, তার নিজের চোখ থেকেই আশ্চর্য অশ্রু নেমে আসে। গভীর আবেগে শুচুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু কেঁদে ফেলে শুভদীপ। এবং মুহূর্তে সামলে নেয়। কারণ তার কান্না শুচুকে আরও বেশি অস্থির করে তুলেছে। এত কান্না ওর

স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ হতে পারে। সে চোখ মুছে শুচুকে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়। সকালের ওষুধগুলো খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে। চোখ মুছতে মুছতে আদুরে বালিকার মতো ঘাড় নাড়ে শুচু। সে তখন বাবাকে প্রণাম করে আসার নির্দেশ দেয় শুচুকে। শুচু চলে গেলে সানাই বন্ধ করে অনেক দিন পর সে উল্লাস কশলকরের ভৈরববাহার চালিয়ে দেয়। আর শুনতে পায় মা আর জেঠিমা সংসারের আলোচনা করছে। ট্রাঙ্ক থেকে ভারী ভারী কাঁসার থালা-বাটি-গ্লাস বার করছে। মেয়ে-জামাইকে দুপুরবেলা খেতে দেবে। জেঠিমা মাকে চন্দ্রহারের বিষয়ে জিজ্ঞেস করছেন। মা উত্তর দিচ্ছে, সেটি বড়ছেলের বউ পাবে। আর তা হলে জড়োয়ার সেটটা ছোটছেলের বউ পাচ্ছে। উপসংহারে পৌঁছচ্ছেন জেঠিমা। তার পরেই প্রশ্ন করছেন, আজ দুপুরে কী কী রান্না হবে। তিনি শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে পরে রান্নায় যোগ দেবেন কিনা। কোথাও আবেগের এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই। কষ্টের এতটুকু রেশমাত্র নেই। তোলা গয়নার মতো আবেগও ট্রাঙ্কে তুলে রেখে দুই মহিলা সহজ স্বাভাবিক সংসারের কাজে ঢুকে পড়ে।

দেবনন্দনের আসার সময় হয়ে গিয়েছে। শুভদীপ একবার রাস্তার কাছে দাঁড়ায়। উল্লাস কশলকরের স্বর ভেসে আসছে এ পর্যন্ত। দেবনন্দন সারাদিনের জন্য একটি বড় গাড়ি ভাড়া করেছে। টাটা সুমো। অনেক জন ধরে যাবে। বিশ্বদীপ নিয়ে আসবে তাদের। শুভদীপের চন্দ্রাবলীকে মনে পড়ে যায়। বিয়ে করবার কী অসম্ভব ইচ্ছা যে ছিল তার। আজ যদি চন্দ্রাবলী থাকত, থাকা সম্ভব নয়, তবু যদি থাকত, হৈ-চৈ করে একাই মাতিয়ে রাখত সারা বাড়ি।

একদিন, তারা বসে ছিল জল থেকে চাঁদ উঠে আসা সেই উদ্যানে। জোড়া জোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে ঠিক তাদের কাছেই এসে বসল দু'জন। মেয়েটিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল চন্দ্রাবলী। তার চেনা। তার বহু পুরনো বান্ধবী। কল-কল করে উঠেছিল দু'জনেই। চন্দ্রাবলী শুভদীপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বান্ধবীর। গভীর আবেগে ডুবে, ফেনিল উচ্ছ্বাসে ভেসে বান্ধবীর হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে বলেছিল, এক বছরের মধ্যেই তারা বিয়ে করবে। পুরনো সম্পর্কের

থেকে আইনগত বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই। বিচ্ছেদের আবেদন তখন করা হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাবলীর, বোঝাপড়ার বিচ্ছেদ। বান্ধবীটি এবং তার সহচর অভিনন্দন জানিয়েছিল তাদের। সে হেসেছিল বিনিময়ে এবং ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়েছিল। নিজেদের জায়গায় ফিরে আসতেই সে চাপা গলায়, কড়াভাবে চন্দ্রাবলীকে বিয়ের স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করে দেয়। নিষেধ করে দেয়, যখন-তখন যাকে-তাকে এইভাবে বিয়ের কথা বলে বেড়াতে। চন্দ্রাবলী সরল ভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিল তখন, মহুলি বিবাহিত। যেন মহুলি বিবাহিত বলেই শুভদীপের চন্দ্রাবলীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকতে পারে না। শুভদীপ তখন ক্রোধের চরমে। দাঁতে দাঁত পিষে আরও একবার সাবধান করেছিল। চাঁদের বিম্বিত মুখ জলের তলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল তখন। জ্যোৎস্নাকে লাগছিল ভাঙা ভাঙা।

ঠিক তখনই বান্ধবীটি তার প্রেমিককে নিয়ে তাদের মুখোমুখি এসে বসেছিল। চন্দ্রাবলীকে একটি গান শোনাতে অনুরোধ করেছিল সে। কারণ তার প্রেমিককে সে অনেকবার গল্প করেছে কত ভাল গায় চন্দ্রাবলী। শুভদীপ মেয়েটিকে দেখতে দেখতে, তার হাসি, প্রাণ, উচ্ছ্বাস দেখতে দেখতে ভাবছিল চন্দ্রাবলীর মতো এ-ও বিবাহবিচ্ছিন্না কি না। কেন-না এত বয়সেও এই মেয়েটিকে দেখায় অবিবাহিতা— যা স্বাভাবিক নয়। তার মনের মধ্যম মান হদিশ চাইছিল প্রাণপণ।

চন্দ্রাবলী উদাস হয়ে জলের দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর গান ধরেছিল। ভেজা গলায়।

চলি ম্যায় খোজ মেঁ পিয়াকি।
মিটি নহি সোচ রহ জিয়কি ॥
রহ নিত পাস হি মেরে।
ন পাউ যারকো হেরে ॥

—প্রিয়কে খুঁজে চলেছি। কী করে তাঁকে পাব এ ভাবনা আর গেল না। সে আমার নিত্য সহচর। তবু তাকে চোখে দেখতে পাই না।

বিকল বহুঁ ওরকো ধাঁউ।
তব হুঁ নাহ কন্তকো পাঁউ ॥
ধরোঁ কহি ভাঁতিসোঁ ধীরা।
গয়ৌ গির হাঁথসে হীরা ॥

—বিহ্বল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি কেবল। তবু তাকে পাচ্ছি না কোথাও। আর যে ধৈর্য থাকে না। আমার হীরা পড়ে গেল হাত থেকে।

কটি যব নৈনকি ঝাঁঈঁ।
লখৌ অব গগনমে সাঈঁ ॥
কবীর শব্দ কহি ত্রাসা।
নয়নমে যার কো বাসা ॥

—চোখের পর্দা সরে গেল যেইদিন, দেখি প্রভু রয়েছেন আকাশে, সহস্রারে। কবীর বলে, আমার নয়নেই তাঁর বাস। একথা উচ্চারণ করতেও ভয় হয়।

১৪

এই জায়গাটা আলাদা করে ঘেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ সেনা মারা গিয়েছিল, তার কয়েকজন এখানে শুয়ে আছে।

ঘুরে ঘুরে দেখছিল সে। এ পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে এখানে। এখানে কারও প্রবেশানুমতি লাগে না।

বিরাট জায়গা জুড়ে এই সমাধিক্ষেত্র। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে মৃত্যুকে বড় পবিত্র মনে হয়। মনে হয়, এই যে ধবধবে সাদা সমাধিগুলি, এখানেই প্রকৃত শান্তি আছে। সমাধির তলায়। ওইখানে, সমাধির মধ্যে শুয়ে অনন্ত ঘুমে মানুষ অনন্তকাল সুস্বপ্ন দেখে। কারও কোথাও ছুটে যাবার নেই। কেউ কারওকে ছেড়ে

যায় না। কেউ আর কষ্ট পায় না কারও জন্য। মৃতেরা কষ্ট পায় না। দেহান্তর্গত কষ্ট শুধু জীবিতের জন্য।

সে তো জীবন ছেড়ে মৃত্যুর কাছে চলে যাবে, স্থির করেছিল কবেই, কিন্তু যেতে পারছে না কেন!

সে দূর অবধি দেখে। সাদা সমাধিগুলোয় নানা ধরনের ফলক। ক্রুশ বেশির ভাগ। এ ছাড়াও আছে পরি। আছে বই অথবা ছোট্ট ঘরের আদল। তার ওপর কালো দিয়ে সমাধিস্তোত্র লেখা।

অসামান্য পরিষ্কার, একটি বাড়তি পাতাও যেন পড়ে থাকছে না কোথাও। মালিরা কাজ করছেন আর সাদা-কালোর ফাঁকে, ঘাসের অফুরন্ত সবুজের ফাঁকে, তাঁদের হাতে ফুটে উঠছে অজস্র রঙিন ফুল।

মৃত্যুর জন্য এখানে কোথাও চিৎকৃত শোক নেই। শোক এখানে সংহত। সমাহিত। বিষাদের কালো রং শুধু সমাধিস্তোত্রে ফুটে উঠে মিলিয়ে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে ঘাসে আর ফুলেদের ছোট ছোট গাছে।

বড় গাছ অল্পই এখানে। বৃক্ষ দু'-একটা। তাই শোক ও বিষণ্ণতার গাঢ় ঘোর ঘনতর ছায়া হয়ে লুটিয়ে পড়েনি। স্তব্ধতা ভেঙে পাখিদের ডাক বেহিসাবি প্রায়। সব মিলিয়ে এখানে শোক ও বিষাদকে জয় করার শক্তি মূর্ত আছে। আর আছে বৈরাগ্য।

তবু সে নিজের ভেতর বিষাদ টের পায়। এই সমাধিগুলির উজ্জ্বলতার ভিতর, শান্তি প্রতিজ্ঞার ভিতর সে বিষণ্ণতা মেলে দিয়ে মৃত্যুলিপি পাঠ করতে থাকে।

তার কোনও গভীর শোক নেই। তার কোনও গভীর সন্তাপ নেই। তার কোনও গভীর যন্ত্রণা নেই। যে-জীবন সে যাপন করে তেমন এই দেশ ভারতবর্ষে হাজার মানুষের জীবন। লক্ষ কোটি মানুষের জীবন। অতএব এই দরিদ্র দিনযাপনের জন্য তার কোনও গভীর লজ্জাও নেই। তবু, সব মিলে, তার শোক-সন্তাপ, তার লজ্জা-যন্ত্রণা আকাশপ্রমাণ। সে বড় কাতর। বড় দুঃখী। এই যে উদ্ভাসিত বৈরাগ্য—এর ভাগীদার সে হতে চায়, পারে না। সে তার শোক-তাপ নিয়ে একেবারে শেষ হয়ে যেতে চায়। সে মৃত্যু চায়। মৃত্যু! প্রিয়

পবিত্র মৃত্যু। সে সুন্দরী মৃত্যুর কোলে মাথা রাখবে একদিন। শীঘ্র। অতি শীঘ্র। আর জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে।

যে-জায়গায় সে এসে দাঁড়িয়েছে এখন, আলাদা করে ঘিরে দেওয়া, এখানে ঘুমিয়ে আছে সৈনিকেরা। সার সার অজস্র ফলক। সমান উচ্চতার, অভিন্ন আকৃতির। এখানেও পাখিরা নিরন্তর গান শোনায় সৈনিকদের। আঠারো থেকে চল্লিশ—নানা বয়সের, নানা স্তরের সৈনিক। কে জানে, তাদের দেহ সম্পূর্ণ ফিরেছিল কি না। কে জানে, তাদের একটি মাত্র অঙ্গই হয়তো পেয়েছিল প্রিয়জনেরা আর সমাধিস্থ করেছিল। কে জানে, হয়তো বোমা পড়ে ছিন্নভিন্ন তালগোল দেহটিই পৌঁছেছিল যা কেউ দেখতেও সাহস করেনি।

বীর সৈনিকেরা সব। সে তো মরতে পারছে না মৃত্যুকেই একমাত্র সৎ ও শান্তিময়ী মনে করবার পরও।

ফুল এসে জড়িয়ে রেখেছে, ছোট ছোট ডালপালা আগলে রেখেছে সমাধিগুলি। সে ঘুরে ঘুরে দেখছে। ফাল্গুনের হাওয়া হাহাকার নিয়ে আছড়ে পড়ছে গায়ে। তার চুল উড়ছে। বসন্তে বড় কষ্ট হয়। বড় কষ্ট হয়। বসন্তে তারা গিয়েছিল মাইথন।

4753356 (Private) in Middleton,
York and Lancashire Regiment
Died on June 1945. Age 30.

Its heart to picture your face in
hiding and to think. We could not say Good Bye.

—হৃদয়ে আঁকা ছিল তোমার মুখ। তোমাকে ভেবেছিল সেই হৃদয়। আমরা তাই কোনও বিদায় বলতে পারিনি।

সে একবার থমকায়। তার ও মাইথনের মাঝখানে এখন এই সমাধিফলক। এবং তাকে ঘিরে আছে আরও আরও সমাধিফলক। সে

প্রস্তরীভূত থাকে এবং তার দেহ জুড়ে ফুটে ওঠে কাহিনী অনেক। কথা অনেক।

এই বসন্তে, এই ঘোর বসন্তে তারা গিয়েছিল মাইথন। সে যেমন ভেবেছিল, তেমন ছিল না সে-জায়গা। রুখু শহর আসানসোলের ওপর দিয়ে, রুখু ও এবড়ো-খেবড়ো পথের নির্মমতা সয়ে তারা যে নির্জনের প্রার্থনায় চলেছিল— তার দেখা মেলেনি। যেতে-ফিরতে পথে পড়ে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। যাবার সময় কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে থেমে পুজো দিয়েছিল চন্দ্রাবলী। বলেছিল, এই মন্দিরে মানত করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সিঁদুরের টানা টিপ পরেছিল সে। আর শুভদীপ সেই সিঁদুর মুছে ফেলতে আদেশ করেছিল। তার মনে হয়েছিল, অতিথিশালায় এ-এক ভণ্ডামি হবে। সবাই মনে করবে তারা স্বামী-স্ত্রী।

সে এমনকী ভুল করেও কারওকে মনে করাতে চায়নি যে তারা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু সে, ওইটুকু সময়, শুধু সিঁদুর পরার মধ্যে যে স্বামী-স্ত্রী হয়ে ওঠা—সেটুকু আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল। শুভদীপকে স্মরণ করেই সে এই সিঁদুর পরেছে। অতএব সে মুছতে চায়নি। শুভদীপ নিজে তার মনের আড়ালে রাখা অনিচ্ছার স্বার্থে রুমাল দিয়ে সিঁদুর মুছে দেয়। চন্দ্রাবলী কথা বলেনি তারপর অনেকক্ষণ। বড় উদাসী দেখাচ্ছিল তাকে। বড় দুঃখী। আর এই উদাস থাকাকে, দুঃখী থাকাকে সে সহ্য করতে পারছিল না। তার ক্রোধ জন্মাচ্ছিল। তখন, সেই বসন্তের সকালে রুক্ষ লালাভ মাটির ওপর শুয়ে থাকা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে, বসন্তের লীলায়িত বায়ুতে সে কামগন্ধ পাচ্ছিল। প্রকৃতির কাম ধীরে ধীরে তারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তখন সে ক্রোধাগ্নির সঙ্গে কামাগ্নির সংঘর্ষ ঘটিয়ে ফেলে—এবং এ-কাজ অত্যন্ত সহজ কারণ কামের পরেই ক্রোধের স্থান, অতএব সম্মিলিত আগুনে, কাম ও ক্রোধের সম্মিলিত অগ্নিস্রোতে উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া হাত সে রাখে চন্দ্রাবলীর হাতে। চন্দ্রাবলী হাত সরিয়ে নেয় না। কিন্তু ঔদাস্য থেকে ফিরে আসে না কিছুতে। তখনও দুঃখের আবরণে ঢেকে রাখে মুখ।

যে প্রকৃতি জীবিতবৎ কামগন্ধী হয়ে তাকে উত্তেজিত করেছিল সেই প্রকৃতিকেই তার লাগে জড়পদার্থ এবং বস্তুতই প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে অসীম শক্তিধর জড়বস্তু এবং এই জড়বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে থাকা স্তব্ধ চন্দ্রাবলীকে সে ঘৃণা করে তখন, তাকে লাগে সহ্যাতীত এবং এই ঘৃণার ও অসহিষ্ণুতার প্ররোচনায় সে চন্দ্রাবলীকে যন্ত্রণা দিতে চায়। যন্ত্রণায় বিদ্ধ করতে চায় এবং মহুলির কথা শুরু

Francis Cameron
Sergent. Royal Engineer
Died on 13th August 1940. Age 40.

Have mercy upon me O God!
According to thy loving kindness.

—আমাকে দয়া করো হে ঈশ্বর! তোমার প্রেমময় অসীম করুণায়।

পাখিটা শিস দিতে দিতে তার মাথা স্পর্শ করে উড়ে যায়। নরম করবীর ডালে বসে দোল খায়। দুপুরের রোদ্দুর আলতো করে নেমে যাচ্ছে বিকেলের দিকে। বৃদ্ধ মানুষেরা হেঁটে আসছেন কবরের পর কবর পার হয়ে। ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে ছুটে আসছে। কেউ একটিও গাছের পাতা ছিঁড়ছে না। ফুল ছিঁড়ছে না। কবরে বসে হুটোপাটি লাগিয়ে দিচ্ছে না। সকলের মুখে কী আশ্চর্য প্রশান্তি। কী আশ্চর্য আনন্দ। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করছে না। মালিরাও কাজ করে যাচ্ছে একমনে। এত বড় বাগান, তারা কাজ করবে সন্ধে পর্যন্ত।

তখন তার সামনে এসে দাঁড়ান এক স্মিত নীরব পুরুষ। রক্তাভ-গৌর তাঁর বর্ণ। সুগঠিত দেহকাঠামো তাঁকে করেছে সজীব। এক নৈঃশব্দ্যের সজীবতা। কারণ শুভদীপের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও তিনি দৃষ্টি রাখেন সুদূরে এবং কথা বিনিময় করেন না। শুভদীপও ইচ্ছা

বোঝে না কথার। কারণ সে কবরের পর কবরে, ফলকের পর ফলকে— মৃত্যু খোঁজে এবং মৃত্যু ভুলে অতীতের অতলে ডোবে। ডুবতে ডুবতে এক আধবার দম নিয়ে এ জগতের এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে জুড়ে দেয়। যেমন সে ভাবে কবরের ফ্রান্সিস ক্যামেরন এই মানুষটির মতো অবিকল। কেন ভাবে সে জানে না।

পাখিটা শিস দিয়ে যায়। চন্দ্রাবলী সুর মেলাত এই শিসের সঙ্গে। স্বর মেলাত। চন্দ্রাবলী চন্দ্রাবলী। সে ভাবে—চন্দ্রাবলী চন্দ্রাবলী। সে চন্দ্রাবলীকে যন্ত্রণা দেবার জন্য মহুলির কথা তুলেছিল।

মহুলির প্রসঙ্গ এলেই চন্দ্রাবলী ক্লিষ্ট হয়ে যায়। তার সারা মুখ কষ্টে ভরে ওঠে। কিন্তু সে শুনতে আপত্তি করে না। করেনি কোনও দিন। কারণ সে উপযাচক হয়ে গিয়েছিল। উপযাচক হয়ে কবুল করেছিল শুভদীপকে ছাড়া বাঁচবে না বলে সে মহুলিকেও মেনে নেবে। যাচ্ঞা করার দায় প্রায় সত্যপালনের দায়ের মতো কঠোর, নির্মম।

অতএব মহুলিকে সে সারাক্ষণ মেনে নেয়। সারাক্ষণ মহুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঁচে। আর শুভদীপ জানে বলেই, মহুলির দ্বারা চন্দ্রাবলী যন্ত্রণা পায় জানে বলেই, তার প্রসঙ্গ তোলে। চন্দ্রাবলীর কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রেমের আলাপের মতো বলে যায়—কিছু দিন আগে মহুলির আহ্বানে সে মহুলির বাড়িতে গিয়েছিল। সন্ধ্যায়। মহুলি একাই ছিল সেদিন। তার স্বামী গিয়েছিল বাণিজ্যিক ভ্রমণে। এবং একাকীত্বের কারণে মহুলির মন ভাল ছিল না। এবং মন ভাল করার জন্য শুভদীপকে বুকে টেনে নেয় সে। আস্তে আস্তে পোশাক খুলে স্তনে মুখ রাখতে দেয়। ওই নির্জনতায় শুভদীপ তখন অধিকতর চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে তখন মহুলির ঢোলা ম্যাক্সি পায়ের দিক থেকে তুলে দেয় ওপরের দিকে এবং আবিষ্কার করে, অভিভূত হয়ে আবিষ্কার করে—

T. S. Scale
Royal Air Force
Died on 14th August 1945. Age 29.

Life is all the sweeter that he lived
All he loved more sacred for his sake.

—যে-জীবন সে যাপন করেছে, সুন্দর সে-জীবন। যা কিছু সে ভালবেসেছিল, তারই জন্য সব পুণ্যময়।

তার মৃত্যুর পর তারও জীবনের কোনও সুন্দরকে পৃথিবীতে রেখে যাবে না সে। তার কোনও ভাল নেই, সুন্দর নেই, পুণ্য নেই। সে এই অমৃত-অক্ষরগুলির তুলনায় বড়ই মূল্যহীন। ভাবে সে। স্মৃতির গায়ে গায়ে বসিয়ে দেয় ভাবনাসমূহ মখমলের গায়ে চুমকির মতো। ভাবে আর দেখতে পায় স্নেহশীলা, মমতাময়ী, বয়স্কা মহিলারাও একে একে এসে পড়ছেন এবার। এই বসন্তের বিকেলে চমৎকার সাজ-পোশাক তাঁদের। কোনও ব্যস্ততা নেই। সংসারের সকল কাজ সেরে তারা এসেছেন বৈকালিক বাতাস গায়ে মেখে নিতে।

আর শুভদীপ গন্ধ পাচ্ছে তখন। সেই আশ্চর্য গন্ধ। সুগন্ধ নয়। দুর্গন্ধও নয়। নয় মাদকতাময়। গভীর এই ঘ্রাণ।

সে দেখে। চারিদিক অবলোকন করে এবং তরুণ রমণীদের ইতস্তত দেখতে পায়। কেউ কারও সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছেন না। যে-যার নিজের মতো সমাধির পর সমাধি পেরিয়ে হেঁটে চলেছেন।

কত অসামান্য মানুষ সব, আর কী বিশাল এই সমাধিক্ষেত্র। এই সব নারী—তাঁরা প্রত্যেকেই সারাদিনের কাজের পর বসন্তের বাস মেখেছেন গায়ে। এই অসামান্য গন্ধ—যা সে পেয়েছে আগেও—সে নিশ্চিত হয়—এ-কোনও নারীরই গন্ধ বলে। এমনকী মৃত্যু যে নারী, হতে পারে সেই নির্লোভ, নিরপেক্ষ, শান্ত নারীর এ গন্ধ। কিন্তু এখন সে বিশ্বাস করতে চায় এ গন্ধ এই সব রক্তময় মাংসবতী দেহ থেকে আগত। এবং তখন, এই সব অপার্থিব গন্ধ ছাপিয়ে তার নাকে লাগে মহুলির গায়ের গন্ধ। ম্যাক্সি তুলতেই ঝাপটা লেগেছিল নাকে আর...আর...সে সবিস্ময় আবিষ্কার করেছিল কোনও অন্তর্বাস নেই। মহুলির কোনও অন্তর্বাস নেই।

সে তখন উন্মত্তের মতো কামড়ে ধরেছিল উরু আর হাত রেখেছিল যোনিতে। আর মহুলি তার মাথা চেপে ধরেছিল।

শুনতে শুনতে, এইসব শুনতে শুনতে চন্দ্রাবলী গাড়ির দেওয়ালে মাথা রেখেছিল। দৃষ্টি বাইরে। উদাস। গালের প্রতিটি রেখা যন্ত্রণাময়। চোখের প্রতিটি কাঁপন কষ্টে ভারী। সে, শুভদীপ, তখন উল্লসিত হচ্ছিল মনে মনে এবং অগ্রসরমাণ।

মহুলি তার মাথা চেপে ধরেছিল আর সে তখন চূড়ান্ত, সে তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন, মহুলিকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, শুইয়ে দেয় আর নিজেকে মুক্ত করে এবং... এবং মহুলি তাকে নিরস্ত করে। হাঁপাতে হাঁপাতে, উত্তেজিত থাকতে থাকতে নিরস্ত করে এই বলে যে সে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ নেই।

নিরস্ত। নিরস্ত বলেছিল সে চন্দ্রাবলীকে। প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত নয়, বরং নিষেধ। কর্কশ নিষেধ। আচমকাই উঠে বসে তাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলেছিল মহুলি, আর সে, যেমন করে মানুষ গায়ে পড়া টিকটিকিকে ছিটকে ফেলে দেয়, তেমনি চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। টিকটিকির মতো তারও সাদা পেট উন্মুক্ত ছিল। মুহূর্তে তার সমস্ত কাম জল হয়ে যায়। লজ্জায় শিশ্ন নুয়ে পড়ে।

এই সব বলেনি সে। বলেনি। কেবল বলেছিল নিরস্ত। যেন মহুলির কাছে সে সেদিন হয়ে উঠেছিল চির আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক। পুতুল নয়, খেলনা নয়, আদ্যন্ত প্রেমিক। যেন মহুলি তাকে শরীরের অভ্যন্তরে নিতে না পেরে স্বয়ং বিষণ্ণ হয়ে যায়।

এমন সব ভাবই সে নিজের কথায় ফুটিয়ে তুলেছিল। বলেছিল চূড়ান্ত হতাশায় মহুলি সেদিন মদ্যপান করতে চায়। আর সেদিন ছিল এক বৃহস্পতিবার। সুরা বিপণি বন্ধ থাকবার দিন। তখন মহুলি দ্রুত পোশাক পরে নেয়, এবং তাকে নিয়ে যায় অপরিচিত অন্ধকারে। নিজে আলোয় দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ঠেলে দেয় তর্জনী তুলে এক নিবিষ্ট অন্ধকারে, যেখানে, বেআইনি মদ বিক্রি হয়।

14762720 (Private)
A. Right
Royal Army Service Corps
Died on 11th July 1945. Age 22.

In memory of a dear son.
He heard the voice of Jesus say;
Come on to me and rest.

—আমাদের ছেলে। যিশু ওকে ডেকেছেন। বলছেন: এসো, আমার কাছে এসো, বিশ্রাম নাও।

বাইশ বছরের ছেলেটির সমাধি তাকে ব্যথিত করে মুহূর্তের জন্য। মানুষের যুদ্ধের প্রবণতাকে সে একবার ধিক্কার দেয় মনে মনে। চারপাশে চোখ তুলে ছেলেটির আদল খোঁজে সে একবার এবং টের পায় বিকেল গড়িয়ে হলুদ আলোয় ধুয়ে দিচ্ছে পৃথিবী। বায়ুর সঙ্গে উড়ে আসছে ধুলোর গন্ধ এবং সেই আশ্চর্য গন্ধের রেশ। এত লোক অথচ কোনও শব্দ নেই। পাখিরাও সব শিস মেরে গেছে। যেন আজকের মতো সব শিস প্রকাশিত হয়ে যাবার পর শেষ হয়ে গেছে শিসের পাত্র। সে পাখিদের খোঁজে ওপরের দিকে তাকায় এবং চোখ নামিয়ে শিশুদের ক্রীড়ারত দেখে। কোনও শিশুকে এত নিঃশব্দে খেলা করতে দেখেনি সে। কোনও বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের দেখেনি একটিও কথা বিনিময় না করে ভ্রমণ করতে এতক্ষণ। তরুণীরা এত উদাস— যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না তাদের। এই সমাধিস্থলের সম্মানে প্রত্যেকেই নীরব। নিরুৎসুক। একা-একা বায়ু বয়ে যায় আর গাছের পাতারা শুধু কাঁপে। মালিরা কাটা ঘাসের ঝুড়ি বোঝাই করে কোণের দিকে চলে যায়। আর সে, এতক্ষণ পর, কবরগুলির মধ্যে বিষণ্ণতা দেখতে পায়। নিজের বিষণ্ণতার সঙ্গে ওই সমস্ত সমাধির বিষণ্ণতাকে মিশিয়ে সে সামনের দিকে হেঁটে যায় অতি ধীরে। তার জুতোয় ঘাসের ওপর শব্দ ওঠে মশ্-মশ্। একটি ছোট্ট লাল ফুল তার পায়ের

কাছে ঝরে পড়ে। সে মাড়িয়ে দেয় না, বরং তুলে পকেটে রেখে দেয়। এবং আবার তার নাকে সেই আশ্চর্য গন্ধের ঝাপট এসে লাগে। তার সব জট পাকিয়ে যায়। মদের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, মহুলির গন্ধ।

সে অতএব চন্দ্রাবলীকে বলে যায়— সেদিনের কথা বলে যায়, যেদিন সে জীবনে প্রথম খরিদ করে মদ এবং বেআইনি ভাবে।

চন্দ্রাবলী প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। এবং মন্তব্য করেছিল। মন্তব্য করেছিল যে সে ঠিক কাজ করেনি। তার উচিত হয়নি বেআইনি ভাবে মদ কেনা। সে হেসেছিল। হেসে চন্দ্রাবলীর মন্তব্য জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। উড়িয়ে দিয়েছিল এবং চুপ করে গেছিল পুরোপুরি। কী হল বলেনি। তারপর কী হল বলেনি। চন্দ্রাবলীও চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। তার আপাত ঔদাস্যের অন্তরালে তীব্র ঔৎসুক্য পাক খাচ্ছিল। এবং একসময় সে জানতে চেয়েছিল। এরপর কী হল জানত চেয়েছিল।

548366 Corporal
Royal Air Force
Died on 29th June 1945. Age 27.

Passing time only depends on fondest memories in God's keeping.

এইবার আসে সমর্থ পুরুষেরা। তরুণ, যুবক। অধিকাংশের পরিধান সৈনিকের পোশাক। সে আশ্চর্য হয়ে দেখে। সমাধিগুলি দেখে এবং সৈনিকদের। কাছাকাছি রয়েছে কোনও সৈনিকের আবাসন— এমনই ধারণা করে সে। বাচ্চারা কেউ কেউ তখন ছুটে গিয়েছে তরুণী মায়ের কাছে। কেউ ধরেছে দাদু-দিদিমার হাত। কোনও তরুণ পিতার কোমর ধরে ঝুলে পড়ল কেউ। সে নিশ্চিত হয় তখন। বৈকালিক ভ্রমণে আসে গোটা পরিবার। এবং এখানে, এই পবিত্র, শান্তিময় সমাধিক্ষেত্রে, নিঃশব্দে রচিত হয় মিলনক্ষেত্র। এমনকী বাচ্চারাও প্রকাশ করে না উচ্ছ্বাস, শিষ্টতায়, যখন তারা বাবা-মায়ের সংলগ্ন।

এমনকী তারা যখন দৌড়য়, লঘুপক্ষ হয়ে প্রায় ভাসতে ভাসতে চলে যায়। তাদের পা যেন স্পর্শ করে না ভূমি।

রোদ্দুর এখন আলো হয়ে বিছিয়ে আছে শুধু। শুধু, সোনালি নরম আলো। দিবসাবসান সাদা সমাধিগুলির ওপর এঁকে দিচ্ছে সামান্য রঙের আলপনা। বড় যত্নে। বড় মমতায়। টুঁই-ট্রিট, টুঁই-ট্রিট শব্দে ডেকে যাচ্ছে পাখি। সমস্ত ক্লান্ত পাখিরবের কিচির-মিচির ছাপিয়ে সেই শব্দ মিষ্টি, করুণ এবং একটানা। সে পাখিটিকে খোঁজে। দেখতে পায় না। বুকের মধ্যে কী যেন এক ছটফটায়। তার মধ্যে এক নৈমিষ আনন্দ জাগে। পাখিরা শিস বন্ধ করেনি। ডাক বন্ধ করেনি। যেন তার মৃত্যুর চূড়ান্ত মুহূর্তেও চাই পাখির নরম ডাক। ঘাসের ওপর বসে পড়ে সে। বহুক্ষণ ধরে ঘুরেছে। দাঁড়িয়ে আছে এত সময় মনে পড়েনি। সে যেমন একদিন অন্য এক সমাধিক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছিল আর নিঃশব্দ সেই ঘন গাছে ঘেরা শান্তিস্থলের বাঁধানো পুকুরপারে শুয়ে পড়েছিল, এখানে তেমনটা সম্ভব হয় না। পুকুর নেই বলেই নয়। এই যে বিস্তীর্ণ সমান সবুজ ঘাস— তার ওপর শয়ন সম্ভব। কিন্তু সম্ভবও নয়। শান্তির সঙ্গে, সুন্দরের সঙ্গে, আভিজাত্যের জটিল দূরত্ব এখানে রচিত আছে। এ জায়গা মানুষকে দিয়ে শিষ্ট, পরিশীলিত আচরণ করিয়ে নেয় নিজেই। এই তফাত হল দেশ-গাঁয়ের বাড়ির সঙ্গে শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির তফাত। সেখানে কাদা-পায়ে ঢুকে পড়া যায়, মাথায় তেল দিয়ে পুকুরে ডুবে সেরে ফেলা যায় স্নান। গামছায় পিঠ রগড়ে তুলে ফেলা যায় গায়ের ময়লা, কোনও কিছুই চোখে লাগে না, কোনও কিছু বেমানান ও অশিষ্ট বলে মনে হয় না। কিন্তু শহরের ফ্ল্যাটে জুতোজোড়া আড়ালে রাখতে হয়। ধুলো ঢাকা পড়ে কার্পেটে। সহবৎ ও শিষ্টাচারের পরীক্ষা পদে পদে। সে ঘাসের গায়ে হাত বুলোয়। সমান করে ছাঁটা ঘাস।

চন্দ্রাবলী চেয়েছিল শহরের বৃহৎ ময়দানের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাবে একদিন। চেয়েছিল বড় বড় স্মৃতিসৌধের পাশের পথ দিয়ে এক্কাগাড়ি চেপে ঘুরবে সমস্ত সন্ধ্যা। দেখতে চেয়েছিল সে, খোলা মঞ্চে বসে ভীমসেন যোশী মিঞা-কি-মল্লার গাইছেন আর

কালো মেঘে ভরে গিয়েছে আকাশ, আর ভীমসেন যোশী ভিজতে ভিজতে, তামাম দর্শককে ভিজিয়ে দিতে দিতে গাইছেন— ছোটি ছোটি বুন্দন বরসে মেহা। আর মধ্যরাত্রি পূর্ণ হচ্ছে তখন। অন্ধকার আকাশ মেঘে মেঘে আরও আরও অন্ধকার হয়ে নেমে আসছে কোলের কাছে।

আর মহুলি কী চেয়েছিল, মহুলি? তার মনে নেই, মহুলির কোনও চাওয়া মনে নেই।

একদিন সকালে, যে-সময় তাদের দু'জনের ছিল শুধু, মহুলির ও তার, সে সময় এক যুবক এসে যায়। বিভ্রান্ত। আরক্ত চোখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চুলে চিরুনি পড়েনি। আলুথালু বেশবাস। পরিকল্পনাহীন ঝোড়ো বাতাসের মতো সে ঢুকে পড়ে ঘরে এবং তার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে মহুলির হাত চেপে অনুনয় করতে থাকে। কাতর অনুনয় করে যে মহুলি তাকে ছেড়ে চলে না যায়। মহুলির এতটুকু প্রেম সে ভিক্ষা করে তখন। মহুলির দয়া ভিক্ষা করে। আর মহুলি নির্মম অতি নির্মম তাকে চলে যেতে বলে তৎক্ষণাৎ। যুবকটি প্রলাপের মতো বলে যায় সব। তাদের সোনালি সময়ের কথা। রক্তকরবীর মতো ফুটে থাকা প্রেম— সে বলে যায়। আর মহুলি শুভদীপকে দেখিয়ে দেয় তখন। বলে, সে আর কিছুক্ষণ বসার চেষ্টা করলেই শুভদীপ তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। কথার মতো, আচরণের মতো, মহুলির চোখমুখ তখন কার্কশ্যে কুঞ্চিত। ছেলেটির প্রতি কোনও প্রেম তার কদাপি জন্মায়নি মনে— এমনই সে-মুখ। স্বীকার অনিবায ছিল বলেই, সম্ভবত, তাকে গড়ে তুলতে হয়েছিল এক এমন কর্কশ অস্বীকার। শুভদীপ সেই সময় যুবকটির মুখে নিজেরও মুখ অবিকল দেখে। কাঁপে। কেঁপে ওঠে বারংবার। যেহেতু ইতিমধ্যে সে জানে প্রত্যাখ্যান কত সহজ। কত নির্মম। যুবকটি তখন যতটুকু প্রাণশক্তি ছিল তাই নিয়ে উঠে পড়ে। টলতে টলতে উঠে পড়ে। আর শুভদীপ অসহায় দেখতে থাকে তার ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া। নিজের অজান্তে, অজ্ঞাতে ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া। সে তখন কৈফিয়ত চায় এবং মহুলি চন্দ্রাবলী তোলে। ওই মোটা বেঁটে কালো কুচ্ছিত মেয়েটাকে তাদের

সম্পর্কের মাঝখানে এক ধাক্কায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তাকে পরিত্যাগ করুক শুভদীপ— এমন দাবি তোলে।

সে জানে না, কেন— জানে না কখন, এই প্রস্তাব, এই দাবি চূড়ান্ত অসম্ভব মূর্তি নিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। সে চন্দ্রাবলীকে যেমন বলেছিল, ভালবাসে মহুলিকে, তেমনি মহুলিকেও বলেছিল চন্দ্রাবলী সম্পর্কে কতখানি নির্মোহ সে, কতখানি নিষ্প্রেম। শরীর বলেনি। শুধু দায়বদ্ধতা। বাবা-মা নেই। স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে। একা, অসহায় এই দায়বদ্ধতা। মহুলি কি বিশ্বাস করেনি? সে বিনিময়ে স্বর চড়িয়েছিল। শুভদীপ কত বুদ্ধিহীন, কত রুচিহীন, একটি চুরেইল মহিলা তাকে হাত করে নিয়েছে কেমন— এই বর্ণনাই করেছিল বারংবার।

সে তখন নারাজ হয়ে যায়। চন্দ্রাবলীর প্রতি টানে হয়তো নয়। হয়তো আহত অহং-এ। এবং মহুলি সম্পর্ক অস্বীকার করে। ভালবাসা অস্বীকার করে। যদি চন্দ্রাবলী থাকে তবে সে নেই, জানিয়ে দেয় সাফ। প্রেমিকের কাছে সে দাবি করে ঠান্ডা পানীয়ের বোতলটির মতো একনিষ্ঠ প্রেম।

চন্দ্রাবলী পেরেছিল। মহুলি পারেনি। চন্দ্রাবলী নিয়েছিল। মহুলি নেয়নি। কেন নেবে। নেবার তো কথা নয়। কথা হল, মহুলির হাজার প্রেমিক ছিল। চন্দ্রাবলীর সে-ই ছিল শুধু।

তার কোনও তত্ত্বদর্শন নেই। সে তত্ত্বদর্শী নয়। একাধিক প্রেমিক থাকা ভাল কি মন্দ জানে না সে। শুধু আশ্চর্যের সহস্র উপকরণ মহুলিকে হারিয়ে তাকে দুঃখিত হতে দেয় না। সে বরং মহুলিকে প্রবঞ্চক ভাবে এবং মালবিকা সিনহার পাশে জুড়ে দেয়।

এই সব বলেনি সে। চন্দ্রাবলীকে বলেনি। শুধু বলেছিল অন্য সব। সব। বলেছিল, সেদিন থাকবার কথা ছিল মহুলির বাড়ি। থাকেনি সে। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য ছিল না এ বিবৃতি। সত্য এইটুকু যে সেদিন রাতে মহুলির বাড়িতে তার থাকবার কথা ছিল। কিন্তু মহুলি তাকে রাত্রি

এগারোটায় রাস্তায় বার করে দেয়। বার করে দেয় কারণ তার চিত্তে একা-একা থাকবার বেগ পেয়েছিল। দু'পাত্র হুইস্কি খেয়ে তার দুঃখ-কষ্টে তোলপাড় হৃদয় একা হতে চেয়েছিল অপূর্ব হিসেবে। আর শুভদীপ রাত্রি এগারোটায় পথে নেমেছিল। কী করবে, কোথায়, কী ভাবে যাবে! সে তখন ট্রামে চড়ে বসে। চেষ্টা করলে যেতে পারত বাড়ি। কিন্তু যায় না। ট্রামে চেপে চলে যায় শহরের বড় ইস্টিশন। আর বসে বসে কাটিয়ে দেয় সারা রাত। আর ভোর ফুটলে তার ইচ্ছে করে প্রথমেই মহুলির কাছে যেতে। কেন-না আশঙ্কা করে সে। ভয় পায়। মদ্যপান করে, দুঃখের অভিঘাতে মহুলি কিছু ঘটিয়ে ফেলবে না তো! সে ভয় পায় আর স্বেদবিন্দু ফোঁটা ফোঁটা নামে কাঁধ বেয়ে। সে, ক্লান্ত, নিদ্রাহীন মহুলির বাড়িতে চলে যায়। দেখে, মহুলি ঘুমিয়েছিল রাতে, আর ঘুমনোর আগে মশারি টাঙিয়েছিল।

Captain C.W. War
Royal Engineers
Died on 11th July 1945. Age 36.

He gave his today for our tomorrow.

—আমাদের আগামী সকাল, আজ তার মৃত্যু বিনিময়ে।

This Hindu soldier of the Indian Army is honoured here.
Om Vagabate Namah
Chinia Gudappa
Indian Pioneer Corps
Died on 16th August 1945. Age 19.

হিন্দু সৈনিক। খ্রিস্টীয়দের মধ্যে সমাধিস্থ একজন হিন্দু সৈনিকের দেহ। হিন্দু শব্দটি তার মস্তিষ্কে আঘাত করে। সে হাঁটু মুড়ে বসে

সমাধির সামনে। স্পর্শ করে ফলক। এবং উনিশ বছরের তাজা কিশোরটি এসে দাঁড়ায় সামনে। তার বুলেটবিদ্ধ বুক হতে রক্ত ঝরে অবিরল। আর মৃত্যুর কাছে যাবার আগেকার এই যন্ত্রণাময় দেহাতিপাত শুভদীপের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়। সে কিশোরের ক্ষত নিরাময় ইচ্ছায় আঙুল বুলিয়ে দেয়। সমস্ত রক্ত বায়বীয় হয়ে মিলিয়ে যায় বাতাসে। সব ক্ষতমুখ ঢেকে যায় নির্মল ত্বকে। মৃত্যুর শুভাশিস লাগে জীবনের গায়ে। চিনিয়া গুডাপ্পা ফলক সরিয়ে মাটির গভীরে চলে যায়। সমস্তই স্বাভাবিক এবং নৈমিত্তিক— এমনই এই পরিবেশে। শুভদীপ ভাবে কিছুক্ষণ। হিন্দু হিন্দু খ্রিস্টান। খ্রিস্টান হিন্দু খ্রিস্টান। সে ভাবে এবং ভাবনার প্রসার ঘটাতে চায়। বৈকালিক ভ্রমণে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কি সকলেই খ্রিস্টীয়? যদিও পোশাক দেখে চেনা যায় না কারওকেই। খ্রিস্টীয় পোশাকের ধাঁচ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে বসে আছে।

সে চারপাশে তাকায়। কারওকেই দেখতে পায় না আর। সন্ধ্যা এখনও নামেনি। তবু প্রত্যেকেই ঘরে ফিরে গেছেন। এমনকী বাচ্চারাও। সে ভাবে, এখন বাচ্চাদের খেলার সময় কম। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হয়। সে উঠে দাঁড়ায়। এই জায়গা ছেড়ে যেতে মন চায় না। কেউ কি তাকে চলে যেতে বলবে? সে প্রতীক্ষা করে। মালিরা কাজ করছে এখনও। সে ঘুরতে থাকে আবার। টুঁই-ট্রিট, টুঁই-ট্রিট পাখিটি ডেকে চলেছে এখনও। অন্য পাখিরাও ঘরে ফিরবে এ বার। ঘরে ফেরার আগে পাখিরা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। দিনের আলো থাকতে থাকতে সব কাজ গুছিয়ে নিতে চায়।

সে, দিনের পর দিন ধরে বিয়ের বিরোধী থেকে গেলে এবং ঘর বাঁধার ইচ্ছা প্রাচীনধর্মী ও প্রগতির পরিপন্থী—ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিলে একদিন চন্দ্রাবলী পাখিদের কথা বলেছিল। পশুদের কথা, এমনকী কীটপতঙ্গের কথাও। বলেছিল, ঘর বাঁধার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবণতা। সমস্ত প্রাণীর সহজাত প্রবণতা। সংঘবদ্ধ বসবাস মানুষ কামনা করে ভিতরকার তাগিদে। অন্তঃস্থ জিনবাহিত প্রেরণায়। সে বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করেনি কারণ তলিয়ে দেখেনি। অথবা বিশ্বাস করেনি, বিশ্বাস করতে চায়নি বলেই।

5688369 (Private) Jhon Swither
Royal Army Service Corps
Died on 11th July 1945. Age 20.

We think of you in silence
No eyes can see us weep
For deep within our hearts
Your memory we keep

—নীরবে স্মরণ করি তোকে। তোর জন্য কখনও কাঁদিনি। বুকের গভীরতর ঘরে—সারাক্ষণ-সারাক্ষণ তুই।

শোকের কী আশ্চর্য সংহত প্রকাশ! কী অপরূপ সহন। শুভদীপ অভিভূত হয়ে যায়। নেশাগ্রস্তের মতো পড়তে থাকে একের পর এক।

পড়ে আর ভাবে। যারা এসেছিল সমাধিস্থ করার সময়, যারা ভেবে ভেবে স্তোত্র লিখিয়েছিল, তরল অশ্রুসমূহ ঘনতর করে, করে বিন্দুবৎ, এই সব শব্দাবলি ভরে তুলেছিল— কত অসামান্য শক্তিমান তারা, কেন তারা করেছিল এত? মৃতের সমাধি থেকে শোক নিয়ে কেন ফিরে গিয়েছিল ঘরে? সে কি জীবনেরই টানে, নাকি সেই অমোঘ মৃত্যুর ডাক? মৃত্যুর কাছ থেকে মানুষ কি জীবনের দিকে ফেরে? ফেরা যায়? নাকি সব মৃত্যুময়। জন্ম মৃত্যুময়। এমনকী জন্মের আগে এক জন্মপ্রস্তাব—সেও মৃত্যুময় ঘোর। মৃত্যু-মৃত্যু-মৃত্যুময়! এ জগতে যা-কিছু সমস্ত মৃত্যুমুখে ধায়। মৃত্যুই তৃপ্তিময়। মৃত্যুই মহান।

সে তখন মৃত্যু খোঁজে। মৃত্যু হাতড়ায়। সন্ধে রাত্রিমুখে আপতিত হওয়ার আগেই সে ফলকে ফলকে খোঁজে মৃত্যুর পূর্ণ নামগান। তখন দুই হাতে দুইখানি সমাধিফলক—চন্দ্রাবলী সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। ফলকে স্তোত্র লেখা শুধু। নাম নেই। কোনও নাম নেই। সে পড়ে নেয়। দ্রুত পড়ে নেয়।

His life is beautiful memory
His absence is silent grief

—সে ছিল, সুন্দর হয়ে ছিল। চলে গেছে। নিঃশব্দ কষ্ট একা একা।

Keep on beloved and take thy rest
Lay down thy head upon thy Saviour's breast

—ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো তুমি। তোমার মুখ বুকের মধ্যে নিক। পরম কারুণিক।

সে ঈশ্বরকে মানে না, বলতে যায় এমন আর জলের ধারে নৌকা এসে লাগে। পিঠের কাছে এসে দাঁড়ায় পাহাড়। পাহাড়ে বৃক্ষ সব। বসন্তে হাওয়ার দোলায় মাতাল গাছপালা। তার গায়ের ওপর পাতা খসে পড়ে টুপটাপ। সে নৌকার দিকে দেখে। চন্দ্রাবলী উদাস বসে আছে। তার চুল উড়ছে, দোপাট্টা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। তরুণ মাঝি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে দেখছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট বননিবাস। বাসস্থান তাদের। আর নৌকার নীচে জল। নৌকা ঘিরে জল। সবুজ জল। কী সুন্দর। মাইথনের বিপুল বিশাল জলাধার। এমন সবুজ কেন? গাছপালা তার সবুজ খানিক ঢেলে দিয়েছে জলে।

সে নৌকায় উঠে পড়ে। ডাঙায় বড় লোক। এই বসন্তের উৎসব কালে শীতের চড়ুইভাতি। বাস, ট্রাক, জিপ। জিপ, ট্রাক, ম্যাটাডর। আর গান। চড়া সুরের কান ফাটানো জগঝম্প গান। তারা দু'জন তাই নৌকা করে চলে যাচ্ছে দূরে। জলাধার কী বিশাল! মাঝে মাঝে ফুটে ওঠা নানান আকারের দ্বীপ। দ্বীপের ওপর কোথাও কোথাও টিলা। সবুজ গাছে ঢাকা। এদিকে তাকালে, যেমন ভেবেছিল তেমনই এই জায়গা। উল্টোদিকেই বেদনার মতো হুলোড়। উল্লাস আর শান্তি। উত্তরে ও দক্ষিণে। সুখ আর আনন্দ। উত্তরে ও দক্ষিণে।

তরুণ মাঝি কথা বলছে। বর্ষায় কত জল হয় বলতে থাকছে। ডুবে

যায় ওই দ্বীপ। দেখিয়ে দিচ্ছে সে। দূরে পাহাড়ের গায়ে চাঁদমারি। এন সি সি'র চাঁদমারি আর তাঁবু। চন্দ্রাবলী কথা বলছে না। বননিবাসে ঢুকে সে চন্দ্রাবলীকে আঁকড়ে ধরেছিল। যৌনতায় আঁকড়ে ধরেছিল। চন্দ্রাবলী তখন সমস্ত যৌনতাই রাতের জন্য তুলে রাখতে চায়। তাকে নতুন অবকাশ আর না দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

আসার পথে যে ক্রোধ, কিছুটা প্রশমিত হয় চন্দ্রাবলীকে যন্ত্রণা দিয়ে। সেই প্রশমন ভেঙে আবার উত্থিত হয় ক্রোধ তখন। কেন-না এই তুলে রাখা, স্থগিত রাখা আসলে এক প্রত্যাখ্যান। সাময়িক হলেও। না বলা চন্দ্রাবলীকে সাজে না। সে বরং চন্দ্রাবলীকে রমণ করে করুণা প্রকাশ করছে—এমনই তার মনে হয়। মহুলি তাকে দয়া দিত, সে চন্দ্রাবলীকে দয়া দেয়।

মহুলি তাদের সংস্থা ছেড়ে চলে গিয়েছে অন্য কোথাও। বলে যায়নি তাকে। সেদিন যদি সে চন্দ্রাবলীকে ত্যাগ করত, কিছুই হত না। হয়তো চন্দ্রাবলী আরও একবার ছুটে আসত ভোরবেলা। যেমন এসেছিল যুবকটি। মহুলির কাছে। আর ফেরত গিয়েছিল। সেও ফেরত দিয়ে দিত চন্দ্রাবলীকে। ফেরত। কার কাছে দিত? তার কাছে তো চন্দ্রাবলীকে প্রত্যর্পণ করেনি কেউ, চন্দ্রাবলী স্বয়মাগতা। কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না তার। তবুও পারল না সে। পারল না। মানুষ ভালবাসে পরস্পর, নিকটতম হয়, কোনও কিছুই আড়াল করে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে এক থালায় ভাত খায়, একই গ্লাসে জল, তবুও, মনের বিচিত্র গতি কোন অলক্ষ্যে প্ররোচিত করে তাদের। কোনও মুহূর্তে বিরুদ্ধ ভাবে ফুঁসে উঠে পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। উভয়েই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে কারণ ততক্ষণে জয়-পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আত্মসম্মান।

সেদিন মহুলির বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল সে। মহত্ত্ব দিয়ে জয়ী হয়েছিল। পিতৃমাতৃহীন, স্বামীপরিত্যক্তা চন্দ্রাবলীকে ত্যাগ করতে না চাওয়ার মধ্যে তার মহত্ত্ব ছিল আকাশ পরিমাণ।

হঠাৎ তখন কথা বলেছিল চন্দ্রাবলী। পার থেকে নৌকা তখন অনেকখানি দূরে। ছোট্ট ডিঙি জল কেটে কেটে চলেছিল, চন্দ্রাবলী

তরুণ মাঝিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল। দূরে একটি ছোট্ট দ্বীপ। সেইখানে সে যেতে চায়। মাঝি সেই দিকে নৌকা বাইছিল। আর গভীর সবুজ জলের মধ্যে, খোলা আকাশের নীচে অপার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে চলতে চলতে শুভদীপের সমস্ত কাম, সমস্ত ক্রোধ আপনা হতে প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রাবলী তখন একটি জীবনবিমার কথা বলে। সে সম্প্রতি বিমা করিয়েছে জীবন। এবং বিমা করিয়েছে তার গানের ইস্কুল। কেন-না ইস্কুলে আছে ভাল কিছু হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা। আছে এস্রাজ ও সরোদ। সব তার বাবার করা। সব সে বিমা করিয়েছে এবং জীবনবিমার উত্তরাধিকার সে দিয়েছে শুভদীপকে। যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায় তার, যদি জলে পড়ে যায় হঠাৎ আর ডুবে যায়...শুভদীপ মুখ ফিরিয়ে নেয়। থামিয়ে দেয় চন্দ্রাবলীকে। এই গভীর প্রকৃতির মাঝে তার জীবনবিমা ভাল লাগে না। চন্দ্রাবলী কথা বন্ধ করে না। যদিও শুভদীপকে সে যথাসাধ্য মান্য করে। কিন্তু আজ সে ব্যতিক্রম। শুভদীপের বারণ সত্ত্বেও সে কথা বলে যায়। পরের দিন দোলপূর্ণিমা, মনে করে দেয়। তাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি।

তখন ঝাঁকুনি লাগে নৌকায়। নৌকা পারে ভিড়েছে।

J. C. Leegwood
Royal Army Service Corps
Died on 17th August 1945. Age 31.

The Call was short
The shock severe
To part with one
We love so dear

—শেষের আহ্বান। শোকে নিমজ্জন। তার বিচ্ছেদ সইছে না। যাকে তীব্র ভালবাসি।

বুদ্বুদের মতো ভেসে ওঠা ছোট্ট একখানি দ্বীপ। বুনো কুল ও শেয়ালকাঁটার ঝোপ। গোলাকৃতি। মাঝবরাবর কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু।

তরুণ মাঝি একটি বুনোকুলের গাছের সঙ্গে নৌকা বেঁধে নেয়। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে তখন। সূর্য দিগন্তগামী। লাল রং গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। তাদের দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে আধঘণ্টা থাকতে পারার আশ্বাস দেয় সে। চন্দ্রাবলী একটি নির্ভার, লঘু বালিকার মতো লাফিয়ে নামে দ্বীপে এবং মন্তব্য করে, আয়তনে তার গানের ইস্কুলের সমান। শুভদীপ চারপাশ সন্তর্পণে দেখে নেয়। সাপ থাকতে পারে। থাকতে পারে বিছে। পোকা। বিষাক্ত প্রাণী। চন্দ্রাবলী পরোয়া করে না। সহজেই ভারী দেহ নিয়ে সে দ্বীপ আরোহণ করে।

জল আর জল, দ্বীপ আর দ্বীপ। অনেক দূরে পার। ঢালু জমি বেয়ে ওপরে ওঠে তারা। শেয়ালকাঁটায় হাত ছড়ে যায়। মাকড়সার জাল লেগে যায় মুখে। কুলগাছের কাঁটায় চন্দ্রাবলীর দোপাট্টা আটকে যায়। তারা সাপ, বিছে, পোকা-মাকড়ের ভয় ডিঙিয়ে যে-দিকে মাঝি আর নৌকা আছে, তার উল্টোদিকে চলে যায়। জল ছুঁয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। সূর্যও টকটকে লাল বেশ ধরে জল ছুঁয়ে ঠিক তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের গায়ে বসন্তের সূর্যাস্তরাগ মাখামাখি হয়ে যায়। চন্দ্রাবলী শুভদীপের দিকে অপলক তাকায়। শুভদীপকে তার লাগে অপরূপ। অগ্নিবর্ণ। রূপ ঠিকরোনো পুরুষ। শুভদীপও চন্দ্রাবলীতে চোখ রাখে। চন্দ্রাবলীকে তার মনে হয় উঁচু খোল থেকে বের হয়ে আসা একখণ্ড মাংসল শামুক।

আর শামুক তখন রূপ ঠিকরোনো পুরুষের বুকে মাথা রাখে। সূর্য অল্প ডুব দেয়। আরও লাল হয়ে ওঠে। সেই লালের আভায় পুরুষটিকে আঠালো ভাবে জড়িয়ে ধরে শামুক আর মুখ তোলে। হাত বাড়িয়ে পুরুষের মুখ টেনে নেয় মুখে। সূর্য তরতর করে অনেকখানি ডুবে যায়। লাল রঙে লালের ছোপ বাড়ে।

জিভের সঙ্গে জিভ জড়িয়ে যায়, শরীর জড়ায় শরীরে। বুনো কুল ও শেয়ালকাঁটার ঝোপে আঁধার লাগে। দূরবর্তী দ্বীপগুলির মাথায়

গাছে গাছে তমসাবৃতা। সূর্য এখন রক্তের মতো লাল। নাক অবধি ডুবিয়ে, শুধু চোখ চেয়ে আছে সে। তার একফালি আলো এসে পড়েছে চন্দ্রাবলীর মুখে। সেখানে প্রেম, বিহ্বলতা, সমর্পণ, কামনা এবং প্রার্থনা টুকরো টুকরো হয়ে লেগে আছে জড়োয়া গয়নায় মণিমুক্তোর মতো। রোদ্দুরের শেষ ফালিটুকু পড়ে ঝলমল করে উঠছে সেই সব। আর চন্দ্রাবলী বলছে, এই যে এই নির্জনতম দ্বীপ, তাদের একার দ্বীপ, তালসারির সমুদ্রপারের মতো একার—এই যে সূর্যকে সাক্ষী রেখে ঘনিষ্ঠতা, চুম্বন, জড়িয়ে থাকা, একেই কি বিবাহ বলে না? সমাজের অনুষ্ঠানের মূল্য কি এর চেয়েও বেশি? আজ থেকেই কি তারা বিবাহিত হয়ে রইল না?

শুনতে শুনতে সূর্য ডুবে যায়।

১৫

অবশেষে, সূর্যালোক নিভে গেলে একজন আলোকবর্তিকা হাতে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সাধারণ পোশাকের সাধারণ লোক। শুধু চোখ দুটি করুণাময়। মুখে প্রসন্নতা কিন্তু দৃষ্টি ব্যথাতুর। যেন প্রত্যেকের যন্ত্রণা আহরণ করে দিনান্তে কাঁদবেন তিনি।

সময় হয়েছে, এইবার যেতে হবে। শুভদীপকে তিনি মনে করিয়ে দেন। শুভদীপ অন্যমনস্কতা থেকে বাস্তবে ফেরে। যেতে হবে। যেতে হয়। সময় হলেই চলে যেতে হয়। এই স্থান এখন গাঢ়তর অন্ধকার। সে আলোকবর্তিকা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় সমাধিস্তোত্র পড়তে পড়তে যায়। ধীরে হাঁটেন তিনি। সেও হাঁটে ধীরে। তিনি কথা বলতে বলতে পাশাপাশি। লক্ষ, যেন আঘাত না লাগে তার। সে দেখে আর শোনে। দেখে অধিকাংশ সমাধির গায়ে লেখা—**Rest in Peace**। ঘুমোও। শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকো।

সে দেখে। দেখতে দেখতে যায়।

Though you left us, we will meet

again in the land where worries are at rest.

—তুমি চলে গেছ। পুনর্বার দেখা হবে দুঃখের কষ্টের শেষে। তোমাদের আমাদের সবাকার দেশে।

সে ভাবে। ভাবে আর চিনচিনে কষ্টের ব্যথা তার বুক বেয়ে পিঠ বেয়ে শরীরময় ছড়িয়ে যায়। মৃত্যু-মৃত্যু। মৃত্যু মানে চিরঘুম। চিরশান্তি। এমনই ভাবেন ওঁরা। চিরঘুম —এই ভাবনার মধ্যে— সে যে কোথাও নেই, কোথাও রইল না, এই ভাবনাকে অস্বীকার করা গেল । চিরঘুম। মানে সে আছে, সে আছে, অস্তি অস্তি। জীবন কি এতই বিরাট? বিশাল? জীবনই কি চায় চিরঘুম, পুনর্জন্ম এবং আত্মার অস্তিত্ব?

তার ভাবনা ভেঙে ফেলে কথা বলেন বাতি হাতে ধরা মানুষ। সে শোনে। শুনতে শুনতে পা ফেলে।

এসে যাবে মহাদিন। প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে নভস্তল। পৃথিবী বিলীন হবে অগ্নিতে। হবে এক নতুন পৃথিবী। ধর্মের, সততার, প্রেমময় পবিত্র পৃথিবী। ধর্মের সমস্ত নির্দেশ পালনীয় তাই। পাপাচার পালনীয় নয়। ঈশ্বরপ্রেমই সেই শেষ কথা যেখানে পাপ আর পুণ্য এসে মেশে। ঈশ্বরই সেই সত্য যেখানে অন্ধকার চলে যায়, আলো জাগে। যে তরুণ অসৎকে জয় করে সে-ই শক্তিমান কারণ ঈশ্বরের বাণী তাদের অন্তরে জাগ্রত রয়েছে।

সে শোনে। শুনতে শুনতে পা ফেলে। সে দেখে। দেখতে দেখতে যায়।

And in Gods house for evermore my dwelling place shall be.
—ঈশ্বরের চিরকালের গৃহে, তখন হবে আমার পদার্পণ।

সে দেখে। এক ঝলকে দেখে নেয় স্তোত্রলিপি। কিন্তু চলে যেতে

যেতে সংখ্যা পড়তে পারে না। নামের থেকে চোখ পিছলে স্তোত্রে নেমে যায়। অতএব সে দেখে আর শোনে। দেখতে দেখতে যায়। শুনতে শুনতে পা ফেলে।

সংসারে নয় । বরং ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ধর্মহীন সংসার নিম্নতর স্বভাব উদ্বুদ্ধ করে। কামনা জাগায়। তার চোখের লালসা জাগায়। অন্তরে ঐশ্বর্যের অহঙ্কার জাগায়। জিঘাংসায় ভরিয়ে দেয় মন। এই সংসার, এই অধার্মিক সংসার ধ্বংস হবেই একদিন। তখন শুধু বেঁচে থাকবে ধার্মিকেরা। নিষ্পাপ ঈশ্বরের অনুগামীরা।

সে ধ্বংস আর লালসা, লালসা আর জিঘাংসা শুনতে শুনতে বোধ করে এমন যেন তার দু'পাশে এক্ষুনি কঙ্কালের নৃত্য শুরু হবে। তাদের একহাত লম্বা জিভ ঝুলঝুল করছে। নখের ডগায় লেগে আছে জীবন্ত মানুষের মাংস। চোখে কামনার আগুন ধক ধক করছে যেন জ্বলন্ত ধুনুচি। দ্রুত পা চালায় সে আর সামনে দেখতে পায় বহির্দ্বার। সেই দ্বার পেরুলেই পথ। শুনশান পথে পা রাখে সে আর ধন্যবাদ দেবার জন্য ঘুরে তাকাতেই সেই মানুষটি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। তার ঘোর-ঘোর লাগে। কেমন ঘোর-ঘোর লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ছিল যে-মানুষ, সে এই ছিল, এই নেই। যেন জীবন মৃত্যুর মধ্যে বিলীয়মান হয়ে গেল এক লহমায়। কিছু ক্লান্তিও অনুভব করে সে। দু'পকেটে অকারণ হাত ঢোকায়। চেনা রাস্তা, চেনা পথ। নিজের জন্য আলো লাগে না তার। সে তখন নিজের মতো এগোয়। সে কি পাপী? সে ভাবতে থাকে। সে কি অধার্মিক? সংসারে আসক্ত ও লালসায় পরিপূর্ণ তার মন? যদি হয় তো হোক, সে বেঁচে থাকতে চায় না। সে বরং চায় সেই প্রচণ্ড ধ্বংস—যখন সেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে সমাধিক্ষেত্রের প্রাচীরের দিকে তাকায়। এখানে জীবনের জয়গান নেই কোথাও, বরং আছে মৃত্যুর পূর্ণ আরাধনা। সে আরও একবার এইখানে আসবে বলে ভাবে। আর তক্ষুনি চন্দ্রাবলী হেঁটে যাচ্ছে দেখতে পায়।

তার অল্প আগে, দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে চন্দ্রাবলী। বেঁটে, মোটা, গোল, কালো চন্দ্রাবলী। বিশাল নিতম্বে আলোড়ন তুলে হেঁটে যাচ্ছে। ঘাড়ের ওপর বিশাল খোঁপা এলিয়ে পড়া। সেও, পা চালায় দ্রুত। চন্দ্রাবলীর কাছাকাছি পৌঁছে যায় প্রায়। চন্দ্রাবলী তখন গতি বাড়ায় আরও। প্রায় ছুটতে থাকে। সে-ও দিগ্বিদিক ভুলে, ন্যায়-অন্যায় ভুলে ছুটতে থাকে। আর দোদুল্যমান নিতম্ব দেখে বিবমিষা আসে তার। চন্দ্রাবলী স্মরণে ঘৃণা উপচে ওঠে। ঘৃণার সঙ্গে মিলিত হয় রাগ। আর সব নিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা শুনশান পথ ছাড়িয়ে আলোকময় জনবহুলতায় পৌঁছয়। পৌঁছয় আর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে তাকায় চন্দ্রাবলী। সেও দাঁড়ায় মুখোমুখি। হাঁপায় না তেমন। এবং হতাশ হয়ে দেখে চন্দ্রাবলী নয়। মেয়েটি কিছুতেই চন্দ্রাবলী নয়।

কিন্তু তার কী রকম ধাঁধা লেগে যায়। অসামান্য মোহটান আটকে ফেলে তাকে। মনে হয়, অন্যদিকে দৃষ্টি নিয়ে আবার এই মেয়েটির দিকে তাকালেই সে দেখতে পাবে চন্দ্রাবলী। নিশ্চিতই চন্দ্রাবলী। কিন্তু ঘটে না তেমন। বরং মেয়েটি বাঁকা চোখে জরিপ করে তাকে। তার বড় ইচ্ছে হয় ওই বিভ্রমে ডুবে থাকতে আরও কিছুক্ষণ। কথা বলতে ইচ্ছে করে। সে কী করবে ভেবে পায় না। মনের মধ্যে সমাধিস্তোত্র ঘুরপাক খায়।

The Call was short
The shock severe
To part with one
We love so dear

মেয়েটি অতর্কিতে এগিয়ে আসে কাছে। ফিসফিস করে কথা বলে। তার স্বর গাড়ির শব্দে হারিয়ে যায়। আর শুভদীপ সেই আশ্চর্য গন্ধ পায় আবার। ভালও নয়, মন্দও নয়, এমন গন্ধ। কটুও নয়, তীব্রও নয় এমন গন্ধ। মোহমাদকতাহীন অদ্ভুত নির্বিকার ঘ্রাণ।

পুরুষ তো কম ঘাঁটল না সে, সেই তেরো বছর বয়সের থেকে আজ পূর্ণ তেত্রিশ। ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুরুষের আদ্যোপান্ত ঠিকে নিয়েছে সে। তবু বুঝি কিছু বাকি ছিল। নইলে এই ছেলেটিকে দেখে তার মন মায়ার্দ্র হবে কেন!

পঞ্চাশ টাকায় রাজি হয়ে গেছে সে। ফুঃ। পঞ্চাশ টাকা। তার হাতের ময়লা এখন। চা বানাতে বানাতে সে ভাবে, টাকাটা যাবার সময় ফেরত দিয়ে দেবে।

বস্তুত, দরদস্তুরি করার সময় হাসিই পাচ্ছিল তার। সে হেঁকেছিল পাঁচশো। ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে থেমে-থেমে বলেছিল পঞ্চাশ, শুধুমাত্র পঞ্চাশই সে দিতে পারে। এবং শরীর নয়, শরীরের কিছু চাহিদা নয়, সে শুধু চায় কথা বলতে। বেশিক্ষণ নেবে না সে। পঞ্চাশ টাকায় যতটা সময় পাওয়া যায়। কীরকম অনুনয় ছিল ছেলেটির কথায়। কথা বলার জন্য, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লোক তো কতই আসে। এন জি ও থেকে, সাহিত্য বা ফিল্মের দুনিয়া থেকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে। কিন্তু তাদের কথায় এরকম নুয়ে পড়া ভাব থাকে না। তার মনে হয়, এই ছেলেটার এমনকী হতে পারে মাথা খারাপ।

সে জানে ছেলেটা সত্যি বলছে। কোমরের ঘুনসিতে হাজার হাজার টাকা ঢুকিয়ে পকেটে রাখা তিনখানা ময়লা একশো টাকার পাত্তি ঠেকানোর মানুষ এ নয়। ছেলেটাকে ঘরে বসিয়ে রান্নাঘরে এসেছে সে। চায়ের জল ফুটছে। সে পাতা দিল। একটু বেশি করে দুধ-চিনি দিয়ে চা করবে আজ। বেশি করে বিস্কুট দেবে। আহা রে! ছেলেটার মুখটা কেমন শুগনো শুগনো। চোখ কেমন ভেবলু মেরে আছে। ইচ্ছে করে তার, আঁচল দিয়ে মুখ পুছিয়ে দেয়।

ফুটন্ত জল কীরকম ঘন খয়েরি হয়ে যাচ্ছে। যেন ঠাকুরমার পানের ডাবরে খয়েরগোলা। দুধ দিলেই কীরকম বুজবুড়ি কেটে উপচোবে সে দেখার মতো।

ছেলের কথা মনে পড়ে তার। বছর দুই বাদে গোঁফ-টোফ ভাল

করে গজালে এরই মতো দেখতে হবে ছেলেকে। কেন-না এরই মতো ফিটফরসা ছেলে তার। এরই মতো উঁচা লম্বা। এই পরিবেশ থেকে দূরে রাখবে বলে একেবারে বাচ্চাবেলায় হস্টেলে দিয়ে দিয়েছে সে ছেলেকে। বলতে নেই, শুধু দেখনদারিতে নয়, ছেলে তার পড়াশোনায়ও ভাল। তার নিজের বিদ্যে ক্লাস এইট। পরে অবশ্য দায়ে মাথা ঠুকে বইপত্তর কিছু পড়েছে। সংগঠন করতে গেলে পড়তে হয়। দেশ-বিদেশের খবর না রাখলে চলবে কেন!

মাঝে মাঝে হস্টেলে গিয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলে যখন, টের পায়, ছেলে অনেক জানে। খবর রাখে অনেক বেশি। সারা দিন পড়ে কত। সেই ফাস্টসকালে ইস্কুল। খুব মন পড়ায়। তার ইচ্ছে করে ছেলের মুখ বুকে জড়িয়ে ঘুমোয়। চুলে বিলি কেটে দেয়।

কে জানে, কোন বীজ এসে গর্ভে ঢুকেছে! গায়ে-গতরে চেকনাই ছিল তখন, এমন মুটিয়ে যায়নি, এক বাবু তো আদর করে নামই দিয়ে ফেলল কৃষ্ণকলি। প্রায়ই আসত আর আদর করে ডাক দিত কৃষ্ণকলি! সে-ও দিব্যি উঁ, যাই, আসি বলে জবাব দিত। কী গেছে সেই সব দিন। খুব কামিয়েছে। দিনে পাঁচজন খদ্দের পাওয়া ব্যাপারই ছিল না। তারই মধ্যে কারও একটা লেগে গিয়েছিল।

প্লেটে বিস্কুট সাজায় সে। চায়ের কাপের চিনি গোলে। একবার উঁকি মেরে দেখেও নেয় ছেলেটাকে। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। আর কোনও দিকে নজর নেই। উশখুশ করা নেই। মঙ্গিনিসের দোকান থেকে একটু খাবার আনিয়ে দিলে হত।

দুর্ দুর্! নিজেকেই সে শাসন করে। অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। ভাল মানুষই লাগছে বটে কিন্তু একেবারে গলে পড়ার কী দরকার। আয়ও তো দিচ্ছে না! যে আয় দেয় না তার জন্য ব্যয় করা তার নীতি নয়। যে-দিন থেকেই এই লালসা ও স্বার্থপরতার দুনিয়ার সে অংশীদার— সেদিন থেকেই সে আপন বোঝে।

তবে এটাও ঠিক, চা নিয়ে যেতে যেতে সে ভাবে যে এটাও ঠিক, শয়ে শয়ে পুরুষমানুষ এসেছে, গেছে কিন্তু কেউ চাড্ডি কথা বলার জন্য এমন কাতরায়নি।

ছেলেটার সামনে চায়ের কাপ ও বিস্কুটের প্লেট রাখে সে। তারও চা আছে কিনা, বিস্কুট আছে কিনা জানতে চায় ছেলেটা, সে তখন নিজের কাপ আনতে যায়। ট্রে আছে, তাতে চড়িয়ে একবারে নিয়ে গেলেই হত। কেতাকানুন সম্পূর্ণ রপ্ত করার খুব চেষ্টা করে সে। কিন্তু পেরে ওঠে না। ভুল হয়ে যায়। জীবনটাকে ভাঙা ভাঙা খেলনার মতো মোচড়াতে মোচড়াতে এমন হয়েছে যে সুষ্ঠু হতে হতে, সুন্দর হতে হতেও শেষ অবধি পূর্ণ হয় না তার কাজের ধারা। সে চায়, সাজিয়ে রাখে সব উপকরণ, তবু হয় না।

চায়ের কাপ হাতে সে ছেলেটার মুখোমুখি এসে বসে। ছেলেটা তার দিকে চায়। আবার চায়ও না। সে বুঝতে পারে। তার দেহ এখানে আছে, মন নেই। এই ব্যাপারটা সে খুব ভাল বুঝতে পারে। কারণ তার কাছে, এই গোটা বেশ্যাপাড়ায় যারা আসে তারা কেউ মন আনে না। চৌকাঠে খুলে রাখা জুতোর মতো মন রেখে আসে বাইরে। শুধু শরীর আনে। সে নিজে বা তার মতো অনেকেই মন-টনের ঝামেলা পোয়াতে চায় না। তারাও যে রাস্তার ধারে সেজে-গুজে বসে বসে থাকে, বুকের ড্যালা বের করে, ঠোঁটে রং মেখে—সেও তো শরীরটাই পসরা করে বলে। সেখানে মনের নামগন্ধও থাকে না। মন এক অদ্ভুত বস্তু। বশ হয়, কিন্তু বিক্রি হয় না কখনও।

শূন্য কাপ-প্লেট নিয়ে উঠে আসে সে। ধোয়, তার তাড়া নেই। ছেলেটা আড় হয়ে আছে, বরং একটু সময় দেওয়া যাক।

চিন্তার সূত্র ধরে সে। মন নিয়ে বেশ্যাবাড়ি ঢুকে পড়া কোনও দিনই হয়নি এমন নয়। হয়েছে কালে কালেই। এখনও হয়, লাইনের মেয়ে ক্লায়েন্টের প্রেমে হাবুডুবু খায়। ক্লায়েন্টও তখন জগৎ সংসার ভুলে সেই মেয়ের পোঁদে-পোঁদে ঘোরে। পয়সা থাকলে বাবু তখন মাগি রাখে। পয়সা না থাকলে ভেড়ুয়া বনে যায়। খানকি সারাদিন রোজগার করে যখন যেটুকু সময় দেয় তাই নিয়েই খুশি। স্বামীর মর্যাদা পায় না, বাবুর প্রভুত্ব পায় না, প্রেমিকের ভালবাসাও পায় না।

বিয়েও হয় মাঝে মাঝে। খুব কম। বেশির ভাগই চিরকালের প্রতিশ্রুতি হয়ে থাকে। এবং, বিয়ে হলেই সে-বিয়ে টিকে যায় না।

ক'দিন বাদেই দেখা যায় লাইনের মেয়ে লাইনে ফিরে আসে।

আবার রেন্ডির মনে প্রেমের ভাব জমলে খুব রেগে যায় ঢেমনা খচ্চর মালকিনগুলো। তাদের তখন হেভি লস। মেয়েটা সারাদিন নাগরের সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করবে। আর কোনও বাবু বসাতে চাইবে না। হঠাৎ সিঁদুর-মিদুর পরা শুরু করে বিধবার গোবরজল হয়ে থাকবে। শাঁসালো ক্লায়েন্ট এলেও ঢঙ করে বলবে সে লাইন ছেড়ে দিয়েছে। হুঁঃ। লাইন ছাড়া যেন শায়া খোলার মতো। অত সোজা! একবার খাতায় নাম উঠলে আর মোছে নাকি! যতই চ্যাচানো হোক, যতই অধিকার-অধিকার করে দেশে-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো যাক, কিছু সুবিধা আদায় হয় ঠিকই, কিন্তু শালার বেশ্যা বেশ্যাই থাকে। মানুষ হয় না। নারী হয় না। মহিলা হয় না। এমনকী মেয়েছেলেও হয় না। পুরুষ বেবুশ্যেগুলোর অবস্থা তো আরও খারাপ। খানকিরাই ওদের থোকে। সেঁগোমারানির দল। গাঁড় মেরে আর ধন চুষেই শালাদের জীবন গেল।

কেউ প্রেমে পড়লে কুটনি মাসিগুলোর খুব রাগ। কামাই হয় না যে। অনর্গল রাঁঢ়ে ছেলেটার গুষ্টির তুষ্টি করে। সারাজীবন মাগি গতর খাটায়, তারপর বুড়ি হলেই ঘর-টর কিনে মালকিন সেজে বসে। আদরের মাসি। কুটনি মাগি।

তার জীবনে অবশ্য আসেনি এসব কিছু। এই প্রেম-ভালবাসা। এই মাগি রাখা বাবু। তার জীবনে সব এসেছে আর গেছে। যত দিন সুন্দর ছিল, মুটিয়ে যায়নি, তখন লোকে ঘুরে-ফিরে আসত। ব্যস ওইটুকুই।

অবশ্য বাঁধা বাবু পেলে সে নিত কিনা সন্দেহ। কারণ বউ নয় কিন্তু বউয়ের মতো দাসি-বাঁদি হয়ে থাকা তার পোষাবে না। বাবু এসে যখন খুশি মারাবে, রাজি নেই অরাজি নেই, গায়ে-গতরের অসুখ-বিসুখ ভাল-মন্দ নেই, জানালা দিয়ে তাকাতে অব্দি পারবে না, ইচ্ছে হলেও অন্য বাবু ডাকতে পারবে না, বেগড়বাঁই বেশি করলে বাবু এমনকী লাঠিপেটাও করতে পারেন। পোষাবে না। পোষাবে না তার। পুরুষমানুষ মানেই ত্যাঁদড়। যত ভালমানুষই হোক না কেন, ধন থাকলেই ত্যাঁদড়ামি থাকে। কোনও পুরুষের সঙ্গেই সে পাকাপাকি

থাকতে পারবে না। এমনকী নিজের ছেলের সঙ্গেও না।

রেন্ডিগুলো বউ সেজে যে কী আনন্দ পায় কে জানে! সে এসবের থই পায় না। ভালবাসা না থাকলে, ইচ্ছার দাম না থাকলে কী-ই বা তফাত গৃহবধূর সঙ্গে বারবধূর? ওরা দেয় শরীর আর মন, বিনিময়ে পালন-পোষণ পায়। তারা দেয় শুধু শরীর। বিনিময় প্রায় একই। পালন-পোষণ কিংবা অর্থ। মনই বা ক'টা বউ সত্যিকারের দেয় তার স্বামীকে? দিতে পারে ক'টা বউ! দেয় না। দিতে পারে না। দেওয়ার ভান করে মাত্র। অতএব এই দুনিয়া জুড়ে শুধুই শরীর-শরীর খেলা। আরে কে বেশ্যা, কে বধূ ঠিক করে দিল কারা? সমাজের গোটা ক'জন ধরে-বেঁধে বলে দিল এই মেয়েটা এই ছেলেটার সঙ্গে শোবে। ব্যস হয়ে গেল বর-বউ। আর বহু পুরুষ চড়ালেই সব বেশ্যা! সব বেশ্যা! অ্যাক্ থুঃ। সমাজের চাঁদমুখে সে মুতে দেয়। এবং যত বার 'সমাজ' শব্দটা সে ভাবে, তত বার, সে জানে না কেন, তার চোখে ভাসে অসংখ্য পুরুষের শক্ত, রাগত, নির্মম মুখ। এবং একটি বিশাল, দৃঢ় প্রায় কলাগাছের মতো মোটা বাঁড়া। এই সমাজ, মেয়েদের কোণঠাসা করে রাখা এই সমাজ আসলেই এক প্রকাণ্ড পুং-দণ্ড।

ছেলেটির মুখোমুখি এসে সে বসে আবার। দু'হাত মাথার পেছনে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে সে। ভাল-জৌড়-ডিমের। ছেলেটা লাগাতে আসেনি। কথা বলতে এসেছে। এসে মুখে কুলুপ এঁটেছে। আশ্চর্য! ছেলেটাকে বাঁড়া-খেঁচা বা ধ্বজভঙ্গ বলেও তো মনে হচ্ছে না। ধ্বজভঙ্গদের অবশ্য বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। তবে বাঁড়া-খেঁচাগুলোর মুখ দেখলেই সে টের পায়। কত রকমই না জুটেছে তার। একবার এক ধ্বজভঙ্গের কী কান্না! পারবে না বলে কী আফসোস। ওফ্! শেষে সারাক্ষণ আঙুলি করে গেল। কী অস্বস্তি! পরে ওই লোক চাইলেও সে আর নেয়নি। উপভোগ করুক বা না করুক, শরীর সম্পূর্ণ না হলে তার গা ঘিন ঘিন করে। খেয়ালি আর বদমেজাজি রেন্ডি বলে এ পাড়ায় বদনাম আছে তার।

থাক বদনাম। সে জানে তার সংকল্পগুলো ভাল। কালীর মন্দিরে সে যখন পুজো দিতে যায়, তখন বুড়ো পুজারীর সঙ্গে কথা বলে। যত

ইচ্ছার কথা, যত সমস্যার কথা। জ্ঞানী এবং ধৈর্যশীল পূজারী মন্দিরেই থাকেন সারাক্ষণ। খুব দামি কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন, ধর্মের পথ সদাই খোলা। সেই পথে হাঁটার ইচ্ছেটুকুই শুধু প্রয়োজন। তার সে ইচ্ছে আছে। পূজারীর সঙ্গে কথা বলে কাঙালিভোজন করিয়ে আশীর্বাদ কুড়োতে কুড়োতে ফেরে সে। যত দিন গতর দেয়, কামিয়ে নেবে। তারপর ঘরবাড়ি কিনবে। কিনে মাসিও হবে না। এই এলাকা থেকে চলেও যাবে না। খানকির ছেলেগুলো পেট থেকে পড়েই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে। এই সব বন্ধ করবে সে। বেশ্যার ছেলেকে দালাল হতে দেবে না আর। খানকির মেয়েকে নতুন করে রেন্ডি বানাবে না। সে একটা ইস্কুল করবে। অনাথদের জন্য হোম। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানা আছে তার। কথাও বলেছে সে কয়েকটির সঙ্গে। টাকার অভাব হবে না। শুধু মনের জোর চাই। আর ইচ্ছা। তার কাজে উৎসাহ দেবার জন্য অনেক লোক থাকবে। বাধা দেবার লোকও কম পড়বে না। সে লড়বে। যেমন লড়ছে এতকাল।

১৭

জীবনের কথা ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারে সে। সে তো তত্ত্বজ্ঞানী নয়। নয় কোনও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। নয় লেখক বা গবেষক। সে এমনকী কোনও বুদ্ধিমতী সুনায়রী নয় যে কথা বলে মুগ্ধ করে দেবে। সে জানে একমাত্র জীবন, জীবনের অন্ধগলি যা সে মাড়িয়ে এসেছে এতকাল। অবহেলায়। অনিচ্ছায়। ঠিক যেমন বাচ্চারা আনমনে মাড়িয়ে যায় পথের আবর্জনা।

সে আর কী বলবে এই সব ছাড়া। সে কেবল জীবনের স্থূল ও নীরস চাহিদাকে জানে। সে জানে বাঁচতে হয়। কেন হয়, কেন বাঁচতে হয়, এ প্রশ্ন তার মনে কখনও আসেনি। এমনকী না বাঁচে যদি কেউ, যদি আত্মহত্যা করে, তবে তারা ভাবে বোকা! কী বোকা! বাঁচল না! কত কষ্ট করে পাওয়া এ জীবন, এই প্রাণ! বাঁচল না!

বাঁচা। এক পরমতম স্পৃহা। বাঁচা!

এই সরু গলি, পথে পড়ে থাকে আবর্জনা, এখানে মাকড়সার ডিমের মতো জন্মায় শিশু আর সঙ্গম, যৌনতা দেখতে দেখতে বাড়ে, পাকা বটফল খসানোর মতো গর্ভপাত হয় এখানে। এখানে ভাষা বায়সের কণ্ঠের মতো কর্কশ। গা ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলিতে শ্বাস নেবার বায়ু অকুলান পড়ে। নিরালোক, ক্ষুদ্র, দমচাপা ঘরে চড়াইও বাসা বাঁধে না। একটি সুন্দর শাড়ির জন্য মিথ্যাচার বা গিল্টি করা গয়নার জন্য কলহ করে, কিংবা বেনারসি শাড়ি কপালে সিঁদুর আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কেটে যায় যৎসামান্য অবসর। জীবন এখানে যোনিমুখ থেকে শুরু হয়, শেষ হয় পায়ুছিদ্রে।

তবু পৃথিবীকে সুন্দর লাগে সকলের। জীবনকে লাগে অপরূপ। আকর্ষণীয়। এ সুন্দর ভুবন মৃতের উপযোগী নয় বলে মনে করে তারা এবং গঙ্গাস্নান করে কালীমন্দিরে যায়।

সে-ও এইরকমই একজন। জীবনের মানে সে বোঝে এই বেঁচে থাকা। দাঁতে প্রাণ আঁকড়ে পড়ে থাকা। মরে তো গেল না। বেঁচে তো গেল। এইটুকুই জয়! আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও নিরাপত্তা—সভ্যতার ক্রমোন্নয়ন তার কাছে এই মাত্র বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এ ছাড়া, সে আর কী বলবে! সে যখন বক্তৃতা করে, তখনও এইটুকুই বলে। কোনও গবেষক সাক্ষাৎকার নেয় যখন, তখনও বলে এইটুকুই। কোনও লেখকও তার এইটুকুই লেখে। কোনও পরিচালকও তার চলচ্চিত্রে এটুকুর বেশি আঁকতে পারে না।

বারবার সে লিখিত হয়। বারবার মুদ্রিত হয়, বারবার প্রদর্শিত। কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনই থাকে। আর থাকতে থাকতে তার মনে হয় সে এটুকুই। তার বেশি নয়। এর বেশি তার আর কিছুটি নেই।

আবার, একই কথা বলতে বসে তার একটি পৃথক ভাব হচ্ছে। যেমন আরও অনেক আছে তার, সেইটি যে ঠিক কী, সে ধরতে পারছে না। শুধু এক অস্তির উপলব্ধি তাকে প্রাণিত করছে। পুরনো কথা নতুন প্রেরণায় বলতে থাকছে সে।

আট ভাইবোন। সাত দাদা আর সে। পাড়ার লোকে বলত সাতভাই

চম্পা। মাও নাম রেখেছিল চম্পা। চম্পাকলি। খুব আদরের সেই কয়েকটা দিন। সেই তেরো বছর। অভাবের সংসার ছিল। কিন্তু সমস্ত অভাব পুষিয়ে দিত আদর।

সে যখন জন্মায়, তার বড়দাদার বয়স আঠারো। গম্ভীর বড়দাদাকে সে ভালবাসত, ভয়ও পেত খুব। সত্যি বলতে, একমাত্র বড়দাকেই মান্য করত সে। বাকি সময় সে পাখির মতো উড়ন্ত আর স্বাধীন।

বড়দার একটা রেডিও ছিল। ছোট্ট রেডিও। খুব প্রিয় সেই রেডিওতে কারওকে হাত লাগাতে দিত না। তাকেও না। আর ওই নিষেধ ছিল বলেই রেডিওটার প্রতি তার ছিল অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। সে চাইত অবশ্য মাঝে মাঝে। একটু দেখবে হাতে নিয়ে। বড়দা দিত তখন। একমাত্র তাকেই দিত। এমন করে দিত যেন সাতদিনের বাচ্চাকে অচেনা কারও হাতে তুলে দিচ্ছে অনিচ্ছুক মা। আর দিয়েই ফিরিয়ে নিত। কোথাও যাবার সময় রেডিওটা উঁচু আলমারির মাথায় তুলে রাখত।

একদিন বড়দা তুলে রাখতে ভুলে গেল আর সে হাতে পেয়ে গেল রেডিও। এবং তাড়াহুড়ো করে নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে দেখতে গিয়ে হাত থেকে মেঝেয় ফেলে দিল। কথা বলছিল রেডিও। স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

দারুণ ভয় পেয়ে গেল সে। বড়দাদা এসে দেখতে পেলে রাগে অন্ধ হয়ে যাবে। মেরে ছাল তুলে নেবে তার। হাড় ফাটিয়ে দেবে। সে তখন কারওকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং ঘুরতে ঘুরতে ইস্টিশানে এসে পড়ে। শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে সে রেলগাড়িতে চেপে বসে।

আগে কখনও রেলগাড়িতে চাপেনি সে। গতি আর নতুনত্বের প্রাবল্যে অপূর্ব প্রসন্নতায় বুঁদ হয়ে ছিল সারাক্ষণ। ভয় করেনি। কষ্ট পায়নি বাড়ির জন্য। একের পর এক ইস্টিশান পেরুতে লাগল গাড়ি। কোথাও থামল। কোথাও থামল না। এইরকম করতে করতে যেখানে এসে একেবারেই থেমে গেল, সেই বিরাট বড় ইস্টিশানের নাম সে পরে জেনেছিল হাওড়া।

চমকে উঠল ছেলেটি। বাইরে দারুণ চিৎকার। দুটি পুরুষের ক্রুদ্ধ গলা। মেয়েদের সমবেত রব। একজন আরেক জনকে খানকিপুত্র বলে সম্বোধন করল। অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে অপর জনের মাকে চোদন করবে বলে শাসাল। গেল-গেল। ধর্-ধর্। পড়্-পড়্। ছেলেটি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল দেখে হেসে ফেলল সে। আশ্বাস দিল, এখানে এরকম প্রায়ই হয়। রোজকার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই সব। পারিশ্রমিক নিয়ে মারামারি। লভ্যাংশ নিয়ে হাতাহাতি। এ ছাড়া আছে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস। খদ্দেরের সঙ্গেও লেগে যায় কখনও কখনও। অনেকে মাতাল হয়ে হইচই করে। আসলে সবটাই জটিল, সবাই অসহিষ্ণু, শুধু শরীর ক্রয় ও রিপু চরিতার্থতার এই পরিমণ্ডলে মারামারি আর খুন-জখমই মানানসই। বন্য ক্রোধই এখানে সবচেয়ে বেশি সজীব।

পুলিশ থাকে কিনা প্রশ্ন করে ছেলেটি। সে উঠে পড়ে। কিছু কাগজপত্র ছেলেটির হাতে দেয়। তথ্য। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি পড়তে দিয়েছে তাকে। এগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বলে সে দরজার দিকে যায়। ছোটখাটো ঝামেলা সে-ও মিটিয়ে দিতে পারে। পুলিশ লাগে না। পুলিশ শুধু পাপের মূল্য নিতে আসে।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে সে বেরিয়ে যায়। ছেলেটি ইংরাজি ভাষা পড়তে পারবে নিশ্চয়ই। যদিও সে পড়েছে বাংলা তর্জমা।

মারামারি চলছে তখনও। দু'জনকেই সে চেনে। এ পাড়ারই সন্তান। এখন কাস্টমার ধরে আনে। একজন বার করেছে ছোট ছুরি। অন্যজনের সঙ্গে কিছু নেই। তবুও সে পিছু হঠছে না। সে দু'জনের মাঝখানে এসে পড়ে। দু'জনকেই দু'হাতে ধরে সমিতির দিকে নিয়ে যায়। সমিতিতে সারাক্ষণ তাদের দু'জন থাকে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দু'জন, অসুখ-বিসুখ থেকে মারামারি—সব রকমের ঝামেলা সামলায়। তবুও খুন হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তবুও গোপন রোগে আত্মহত্যা করে বা মুখ বুজে সহ্য করতে করতে মরে যায় কত মেয়ে।

সমিতির কাজ এখনও সম্পূর্ণ সফল নয় সে জানে। এ পাড়ায় রাত-দিনের তফাত নেই। কিন্তু সমিতি রাত্রি এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়,

খোলে আবার সকাল এগারোটায়। এর মাঝখানে অনেক কিছু ঘটে। তার রেশ থাকে দিনের পর দিন।

সমিতিকে চালু রাখতে গেলে মেয়েদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তারা এড়িয়ে যায়। ভয়ে এড়িয়ে যায়। বাড়িওয়ালিরা ভয় দেখায় তাদের। মৃত্যুভয়। শাস্তিভয়। গুণ্ডা লাগিয়ে জান নিয়ে নেবার ভয়ে, পুলিশের হাতে বন্দি থাকার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সব।

সমিতি থাকলে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা পুলিশের। কারণ ঝঞ্ঝাট হলে মিটিয়ে নেবার ছলনায় তারা অর্থ নিষ্কাশন করতে পারে না। মেয়েরাও একটা নির্ভরযোগ্য জায়গা পেয়ে গেলে ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়ে হয়ে উঠতে পারে অনেক বেশি সচেতন। তখন পুলিশের নৈমিত্তিক প্রাপ্তির ঘরে টান পড়ে।

অতএব, পুলিশ চায় না সমিতি থাক। পুলিশকে খুশি করতে গিয়ে বাড়িওয়ালিরা চায় না সমিতি থাক। মেয়েরা সচেতন হলে মুশকিল তাদেরও বাড়ছে বৈ কমছে না। আর মেয়েরা কোনটা ভাল সঠিক বুঝতে না পেরে গতানুগতিক প্রক্রিয়াকেই আঁকড়ে থাকে।

সে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে সমিতির দিকে যাচ্ছে দেখে কয়েকজন সঙ্গ নিল। কিন্তু সমিতির ঘরে পৌঁছে সে আর দাঁড়াল না। ঘরে ক্লায়েন্ট আছে বলে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

ছেলেটির মুখ মনে পড়ল তার। করুণ। উদাস। আর সুন্দর। ভারী সুন্দর। কিন্তু ওই অদ্ভুত জায়গায় ছেলেটি গিয়েছিল কেন বুঝতে পারছে না সে। পারতপক্ষে তারা ওই পথ দিয়ে সন্ধ্যাবেলা যায় না। অনেকে দুপুরেও ভয় পেয়েছে ওখানে। তার নিজের খুব ভয়-ডর নেই। রাস্তা সংক্ষেপ করতে সাহস করে ওই পথ ধরেছিল। কিন্তু আজ পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সে ভয় পেয়েছিল এমন যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

দরজা খুলে ঘরে আসে সে। দেখে ছেলেটি কাগজগুলোর ওপর উপুড় হয়ে আছে। এত মন দিয়ে পড়ছে যে তার আগমন টের পায়নি। আগেকার মতো গুছিয়ে বসে সে। বোতল থেকে জল খায়।

> "আজকের যুব সম্প্রদায়ের নাম দেওয়া যেতে পারে এডস প্রজন্ম। এই রোগে এরই মধ্যে মারা গিয়েছে লক্ষাধিক মানুষ। গত কুড়ি বছরে এইচ আই ভি দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ। অধিকাংশের সংক্রমণ ঘটেছে পনেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে।"

ছেলেটি মুখ তোলে। সে আবার কথা শুরু করে। ছেলেটি শুনতে আগ্রহী কিনা পুনর্বার জানতে চায় না। কথাগুলি অবিরল তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সে হাওড়া ইস্টিশানের কথা বলে। রেলগাড়ি থেকে নেমে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অত লোক, অত গাড়ি, অত হাঁক-ডাক কোলাহল সব মিলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। অসম্ভব একা এবং অসহায় লাগছিল তার। কী করবে বুঝতে না পেরে একজন টিকিট পরীক্ষকের কাছে গ্রামের নাম বলে গাড়ির হদিশ জানতে চেয়েছিল সে। সেদিন আর গাড়ি ছিল না। তিনি জানান গাড়ি পাওয়া যাবে পরের দিন সকালে। বলতে বলতে কিছু সন্দেহ হয় তাঁর। তার সঙ্গে আর কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন তিনি। কী যে হয়ে যায় তার, একা আছে বললে যদি কিছু হয়, সে মিথ্যে করে বলে দিয়েছিল সঙ্গে তার বাবা আছে। তখন একজন মধ্যবয়সি লোক তার কাঁধে হাত রেখেছিল।

> "The eminent French Jurist Renee Bridet, said of prostituted children that "Even if they are alive, they are dying within.'' It is a sad commentary on the social values of modern society that we can permit more than one million children in prostitution on Asia alone to remain in a form of slavery which is akin to a living death, said Ron O'Grady of End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT)."

সে ফিরে তাকিয়েছিল। লোকটি হেসেছিল এমন যেন কোথাও কোনও সমস্যা নেই। জানতে চেয়েছিল কী হয়েছে, নির্ভয়ে তাকে সব বলতে বলেছিল। এবং সেও ভয়তরাসে বলে দিয়েছিল সব। বলে দিয়েছিল সে একা। বলে দিয়েছিল কালকের আগে আর গাড়ি নেই ফিরে যাবার।

লোকটি তাকে অভয় দেয়। তাকে নিয়ে মামির বাড়ি যেতে থাকে। ভাল মামি, সুন্দর মামি, কাছে রেখে দেবে তাকে এক রাত। সে বিশ্বাস করে। পরম সারল্যে বিশ্বাস করে। এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। একটিই তো রাত। সে লোকটির সঙ্গে এ রাস্তা ও রাস্তা করে, দু'পাশের ঝলক দেখতে দেখতে একসময় সেখানে পৌঁছে যায়।

মামি সমাদরে গ্রহণ করে তাকে। আর অন্য মেয়েদের হাতে তাকে তুলে দেয়। গোলগাল মধ্যবয়সি মামি, গালে মেচেতার দাগ, তাকে মামি বলেই বিশ্বাস করেছিল সে। আরও বেশি বিশ্বাস জেগেছিল যখন তাকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে, রাতে শোবার ব্যবস্থা করে দেবার আদেশ দেয় সেই মামি।

ঘরে নিয়ে গিয়ে মেয়েরা তার পোশাক খুলে তাকে নগ্ন করে দেয়, সে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেলে বলে, সকলেই তো মেয়ে, তার লজ্জার কিছু নেই, সে স্নান করে নিলেই আবার তাকে পোশাক-আশাক ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সে তখন ভয় পেতে থাকে একটু কিন্তু স্নান করে নেয়। আর স্নান হয়ে গেলে, জামা-কাপড় ফেরত চাইলে, সেই মেয়েরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নগ্ন অবস্থায় নিয়ে যেতে থাকে।

চিৎকার করেছিল সে তখন। তাকে ছেড়ে দেবার, জামা-কাপড় ফিরিয়ে দেবার আকুতিও জানিয়েছিল। কেউ শোনেনি। কেউ তাকে দয়া করেনি। সে তখন একজনের বাহুতে কামড় বসিয়ে দেয় আর খায় একটি সপাট চড়।

সে তখন কাঁদতে থাকে। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। মা-র কথা তার মনে পড়ে। বাবার কথা। দাদাদের কথা। কী আর শাস্তি দিত বড়দাদা! না হয় বকত একটু। মারত। কিন্তু এই সব তো হত না।

তখন সে নগ্ন ভাবে নীত হয় সেই মামির কাছে। মামি খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে তার শরীর দেখে। সারা শরীর দেখে। স্তন অপুষ্ট বলে মন্তব্য করে। কিন্তু সে যে ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে খুবই আকর্ষণীয় একটি 'মাল'— তাও সে শুনতে পায়।

খুঁজেছিল সে তখন। সেই লোকটিকে খুঁজেছিল। হিংস্র দাঁত বার করেছিল মামি। বলেছিল, তাকে বিক্রি করে দিয়ে সেই লোকটি ঘরে ফিরে গেছে।

> "এইচ আই ভি এডস বহু লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে অনাথ শিশুর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় পনেরো লক্ষ শিশু, এক থেকে পনেরো যাদের বয়সসীমা, এডস রোগের প্রকোপে হারিয়েছে হয় মাকে, নয় বাবাকে, নয়তো দু'জনকেই। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য অসুখের কবলে সারা পৃথিবীতে মাত্র দুই শতাংশ শিশু অনাথ হয়। আর শুধু এডসের জন্য দেশে-দেশান্তরে অনাথ শিশুর সংখ্যা শতকরা নয় থেকে পঁয়ত্রিশ। এদের মধ্যে অনেকেই এইচ আই ভি সংক্রামিত।"

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে টের পায়, সে কড়া প্রহরায় আছে। রাত্রে সে বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠেই আবার তার বাড়ির জন্য কান্না পায়। সে কাঁদতে থাকে আর দু'টি মেয়ে সারাক্ষণ তাকে বোঝায়। ব্যাখ্যা করে। বোঝায় যে এখানে যা করতে হবে সেসব না করে তার উপায় নেই। মেয়েমানুষ একবার ঘরের বাইরে পা রাখলে আর এ পাড়ায় রাত্রিবাস করলে ঘর আর তাকে ফেরত নেয় না।

সে শোনে। শুনে যায় কেবল। কিছু বোঝে। কিছু বোঝে না। কাঁদে। কেঁদে চলে ক্রমাগত এই দুনিয়ার কাছে অর্থহীন, মূল্যহীন কান্না।

পরদিন থেকে সর্বাংশে প্রস্তুতি শুরু হয়। যেহেতু ওই তেরো বছর বয়সে তার দেহ সম্পূর্ণ মুকুলিত হয়নি, স্তন ছিল অপরিপূর্ণ, যোনিমুখ

শক্ত ও ক্ষুদ্র— সেহেতু তাকে নগ্ন শুইয়ে দেওয়া হয় বিছানায়। হাত-পা বেঁধে ফেলা হয় শক্ত করে। মুখে গুঁজে দেওয়া হয় কাপড়। নড়তে পারেনি সে, চিৎকার করে যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারেনি যখন প্রায় টানা পাঁচ-ছ'ঘণ্টা তাকে এভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছিল এবং যোনিপথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল বড় লম্বা মোমবাতি।

পাগল হয়ে যায়নি সে, মরে যায়নি যন্ত্রণায়। এমনকী অজ্ঞানও হয়ে যায়নি। সে যখন নগ্ন হয়ে শুয়ে ছিল আর মুখে কাপড়, যোনিমুখে মোমবাতি, তখন এক বৃদ্ধা ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে তার পাশে বসে। না। তার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেয় না স্নেহভরে। বরং এক কটুগন্ধি তেল হাতে মেখে সে তার স্তন মুঠোয় ধরে টানে। বার বার টানে। গোরুর ওলান থেকে দুধ দুইবার মতো ভঙ্গি। টেনে যায় এবং ঢুলতে থাকে, ঠোঁট বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। থামে না, যতক্ষণ না সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে যায়।

এবং এ রকমই চলতে থাকে দিনের পর দিন। পাঁচ দিন হয়তো। অথবা সাত দিন। এখন আর মনে নেই তেমন। শুধু মনে আছে, সে প্রাণপণে পালাতে চাইছিল। ওই নরক থেকে পালাতে চাইছিল। এক দুপুরে সে সুযোগ পেয়ে যায়।

> "The very basis of the child sex industry--designating of a child as a commodity for sale and purchase—demeans and dehumanises the child. It also serves the sexual drive of sexually immature men who seek emotional release by exploiting a completely powerless slave child.
>
> The sexual exploitation of children does not occur in a vaccum but involves a more widespread exploitation, sexual or otherwise. Poverty and ignorance are the underlying causes of this world-wide phenomenon."

ইতস্তত ঘুরছিল সে রাস্তায়। সহায়সম্বলহীন। ভীত। সন্ত্রস্ত। এক পুলিশ তাকে দেখতে পায় এবং প্রশ্ন করে। কী বলেছিল তার মনে নেই। সেই আরক্ষাকর্মীটি তাকে থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে সে প্রেরিত হয় সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রে।

পুনর্বাসন কেন্দ্র। সে হাসে। উঠে দাঁড়ায়। পায়চারি করে। চুপ করে ভাবে কিছুক্ষণ। ছেলেটি অপলক তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করতে ভুলে যায়। সে এসে ছেলেটির মুখোমুখি বসে আবার। ফাল্গুনের হাওয়া ঘরের দুয়ারে মাথা কুটে ফিরে যায়। সে কথা বলে আবার। ঘোর লাগা গলায় কথা বলে।

পুনর্বাসন কেন্দ্র। সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র। হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের রক্ষাকল্পে নির্মিত। আর সেখানেই এক রাত্রে তার শরীর থেকে পোশাক খুলে নেয় তাদের দেখাশুনোয় নিয়োজিত রাধামাসি। জোর করে একটি ফাঁকা ঘরে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয়।

কিছুক্ষণ পর এক বিশালাকার মাতাল পুরুষ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘরে ঢোকে। তার উত্থিত মোটা লিঙ্গ যেন মহাষণ্ডের পেট ফুঁড়ে নেমে আসা— দেখে ত্রাসে সে থর থর কাঁপতে থাকে। আর তার কাঁপন দেখে লোকটি হা-হা শব্দে হাসে। দুই হাত মেলে তাকে ধরার জন্য এগোয়। সে একটি ভীত আরশোলার মতো প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে থাকে এ-কোণ থেকে ওই-কোণ। বেশিক্ষণ পারে না। দু'হাতে কলবন্দি ইঁদুরের মতো তাকে টিপে ধরে লোকটা। এবং ধর্ষণ করে।

> "ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সমীক্ষায় পাওয়া গেছে, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষ অনেক বেশি মাত্রায় এডসের শিকার। অনেক দেশেই জীবনধারণের অন্য কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে তরুণী ও যুবতী মেয়েরা দেহব্যবসা শুরু করে। নিরাপত্তার সুব্যবস্থা না থাকায় এইচ আই ভি দ্বারা আক্রান্ত হয়। টানজানিয়ার কথা ধরা যাক। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র আক্রান্ত সমাজে মেয়েদের প্রথাগত উপায়ে বিয়ে

হওয়া কঠিন। সুতরাং যুবতী মেয়েদের মধ্যে বুড়ো বর বাগানোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যুবাপুরুষদের চেয়ে বুড়োতেই তাদের বেশি টান একমাত্র এ কারণে যে বুড়োরা অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত। দেখা গেছে বুড়োদের থেকে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি।"

যোনিপথ ছিঁড়ে-খুড়ে গিয়েছিল তার। সারা শরীর আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি সে। মোমবাতি দ্বারা, বুড়ির আঙুল দ্বারা যা যা সহজ করতে চেয়েছিল সেই মামি— তার সবটাই আরও নির্মম ভাবে করে দেয় সেই লোক। জগৎ সংসারে যা কিছু পরিবর্তন এর মধ্যে ঘটেছিল তার মধ্যে এও ছিল যে সেই দানব-সদৃশ লোকটি পুলিশের পোশাক পরে আরক্ষাকর্মী হয়ে যায় এবং সে লোকটিকে নগ্ন ও মাতাল অবস্থার পর সরাসরি সুস্থ পুলিশ হিসেবে দেখে।

প্রতি রাতে একজন-দু'জন করে সেই পুনর্বাসন কেন্দ্রের সমস্ত পুরুষকর্মী তাকে ধর্ষণ করেছিল। ভয় দেখিয়েছিল যদি সে ওপরতলায় নালিশ করে দেয় তবে খুন করে ফেলবে। পেট ভরে খেতে দেয়নি। কেন্দ্র থেকে দেওয়া পোশাকও তারা আত্মসাৎ করেছিল। সে স্বীকার করে, আজও স্বীকার করে, সেই মামির বাড়িতে সে পেট-ভরা খাবার অন্তত পেয়েছিল।

একদিন, আরও দু'জন মেয়ের সঙ্গে পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে সে পলায়ন করে। আবার তারা একটি দালালের কবলে পড়ে এবং আবার সেই মামির পাড়ায় গিয়ে ঠেকে।

সেই থেকেই এখানে। সেই থেকেই চলছে দেহব্যবসা। বহুদিন পর বাবা-মাকে চিঠি লিখেছিল সে। তারা দেখতে এসেছিল তাকে। কিন্তু গ্রামে ফিরে যেতে বারণ করেছিল। তার এই পেশার কথা জানাজানি হলে গ্রামে থাকা মুশকিল হবে সকলের।

মেনে নিয়েছিল সে। মা-বাবা আসত মাঝে মাঝে। বেঁচে ছিল যত দিন। সে-ও টাকা পাঠাত নিয়মিত। দাদারা আসেনি কোনও দিন।

ডাকেনি। সে-ও যায়নি। শুনেছে, বড়দাদা এখন টিভি কিনেছে। রেডিও শোনে না। মা-বাবা মরে যাবার পর গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে।

> "Twelve out of 49 children of prostitutes were motherless. 40 said that they have or had illiterate mothers.
>
> Young girls are raped, beaten and starved and thus pressurised into receiving customers.
>
> From the ancient temples of Delphi to the modern Hindu temples of India, the regular sexual abuse of young girls as temple prostitutes has been a way of obtaining religious merit."

কেউ কারওকে স্পর্শ করেনি। শুধু চোখে চোখ রেখে বসে আছে। ছেলেটির মুখ বেদনায় বিবর্ণ। তার মুখ করুণ হয়তো-বা। সে অস্ফুটে কথা বলে। এ পাড়ায় শত শত মেয়ের এ রকম কাহিনী আছে। করুণতর কাহিনী। তারা যখন সম্মেলনে যোগ দেয়, বহু জায়গার বহু যৌনকর্মীর সঙ্গে সুখ-দুঃখ, অভিজ্ঞতা, সুবিধা-অসুবিধা আদান-প্রদান সম্ভব করে তখন জানতে পারে আরও করুণ, বীভৎস সব কাহিনী। সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে এ কাহিনীর সূচনা। শুধু অধর্মেই নয়, ধর্মেও জড়িয়ে গেছে বেশ্যাবৃত্তি।

মুম্বইয়ের একটি মেয়ের অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর। পর পর তিন দিন অকথ্য অত্যাচার করেও তাকে রাজি করানো যায়নি যখন, তার সুগঠিত দেহের জন্য চড়া মূল্য হাঁকা পুরুষেরা হতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগল যখন, তখন একটি ছোট ঘরে নগ্ন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাকে। সেই ঘরে সে ছাড়া ছিল মাত্র আর একজন। একটি কালকেউটে সাপ।

টানা দু'দিন সে অনড় হয়ে বসেছিল সেই ঘরে। দু'চোখের পাতা এক করেনি। একবিন্দু জল পর্যন্ত খায়নি। তৃতীয় দিন সে ভেঙে পড়ে

এবং শয়তানের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়।

ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়। জল চায় এক গ্লাস। সে জলের বোতল এগিয়ে না দিয়ে কুঁজো থেকে ঠান্ডা জল ঢেলে এনে দেয়। খায় ছেলেটি। গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। আলতো হাত রাখে তার গালে। দু'চোখ দিয়ে কী যেন খুঁজে বেড়ায়। বিড়বিড় করে। ব্যাগ টেনে নিয়ে রওনা দেয় দরজার দিকে।

সে ডাকে। এবং পিছু ডাকল বলে আরও একবার বসে যেতে অনুরোধ করে। ছেলেটি ব্যাগ কাঁধে নিয়েই বসে পড়ে তার কথামতো। সে তখন পঞ্চাশ টাকা এগিয়ে দেয়। ছেলেটি নিতে অস্বীকার করে উঠে দাঁড়ায় আবার। সে তখন হাত টেনে টাকা গুঁজে দেয়। কবে, কোন তেরো বছর বয়সে হারিয়ে ফেলা আবেগ এত দিন পর আবার তাকে ক্ষণিকের জন্য অধিকার করে। সে বলে বসে, দিদি হয়ে ভাইকে এটুকু তো দিতেই পারে সে।

ছেলেটি প্রতিবাদ করে না। টাকা পকেটে গুঁজে বেরিয়ে চলে যায়।

সে তখন খানিক দূরত্ব রেখে ছেলেটিকে অনুসরণ করে। রাত হয়েছে। জায়গা ভাল নয়। বড় রাস্তা পর্যন্ত সে সঙ্গে যাবে।

ছেলেটি থমকে দাঁড়ায় একবার। কী যেন দেখে। তারপর বড় বড় পদক্ষেপে চলে যেতে থাকে।

১৮

এক-একটি দিন বড় তীব্র অভিঘাতে মানুষের ঘুম কেড়ে নেয়। উত্তেজিত স্নায়ুসমূহ বিশ্রাম নিতে চায় না। সে কেবলই জেগে থাকে আর পাশে ঘুমন্ত বিশ্বদীপের ভারী নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পায়।

আগে তারা দু'জন অনেক রাত অবধি জেগে জেগে কথা বলত। বিশ্বদীপ কাজে যোগ দেবার পর থেকে কথা থেমে গেছে। কথা বলত বিশ্বদীপই বেশি। বিশ্বদীপ শুনত। এখন বিশ্বদীপ অত্যন্ত ক্লান্ত

হয়ে থাকে। খেতে খেতেই কথা জড়িয়ে আসে। ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে চোখ। বিছানায় শোয়া মাত্রই সে তলিয়ে যায়।

ছুটছে বিশ্বদীপ। লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করার জন্য ছুটছে। হাঁপিয়ে পড়াকে পরোয়া করছে না। শীর্ণতর হয়ে ওঠাকে তোয়াক্কা করছে না। তার সামনে সুদূরতম নক্ষত্রের মতো ঝুলে ছিল চাকরি। এই তিন মাসে সেই নক্ষত্রকে একটু একটু করে বড় করেছে সে। বাকি তিন মাস টিকে থাকলেই আর ভাবনা নেই। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ সে হাতে পেয়ে যাবে। চাকরি। ভাল বেতনের চাকরি আর প্রচুর সুবিধা।

গত তিন মাস ধরে সে সফল থাকতে পেরেছে। চোখের তলায় অসম্ভব পরিশ্রমের ছাপ। কিন্তু ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টিময়। এ ভাবেই সে সাফল্যের সংবাদ প্রতি মাসে পরিবেশন করেছে শুভদীপকে। এবং সহাস্যে জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল যারা, তার মধ্যে টিকে আছে অল্পই। সুবেশ পোশাক ম্লান করে চকচকে মুখে ক্লান্তি ফুটিয়ে ঘরের ছেলে সব ঘরে ফিরে গেছে। পারছে না, এই পরিশ্রম পারছে না আলুভাতে খাওয়া বাঙালির ছেলে।

বলার সময় আত্মগর্বে তার মুখ টসটসে। সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও। শুনতে শুনতে একটি চমকদার চাকরি এবং একটি সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন মাকেও অধিকার করে বসে আছে।

আর সব সুসংবাদের শেষে একটি আশ্চর্য কথা বলেছে বিশ্বদীপ। এই সব সংস্থা, পণ্যবিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত হলে যা হয়, তার থেকে বাড়িয়ে রাখে সব সময়। যদি লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত হয় তেরো, তারা দেবে তেইশ। কারণ তারা চায় তাদের পণ্য বিক্রয় হোক, কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হোক চায় না।

এর দু'রকম ব্যাখ্যা আছে। সে সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল। এই কৃত্রিম লক্ষ্যমাত্রার দার্শনিক দিকটি সহজ। কোন লক্ষের চূড়ান্ত কী, তা কে বলে দেবে! চূড়ান্ত বস্তুটি কেবলই সরে সরে যায়। ধরতে গেলেই পিছলে যায় পারদ কণিকার মতো।

বলতে বলতে হাসছিল সে, যেমন তার স্বভাব, হাসির দমকে

কঠিনকে সহজ করে তোলে, আর হাসতে হাসতে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার কথা বলেছিল।

গাধার সামনে গাজর ঝুলিয়ে ছুটিয়ে নেবার মতো খুড়োর কলে ফেলে দেওয়া হবে ছেলেমেয়েদের। চাকরির টোপ নিয়ে তারা ছুটবে। লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করার জন্য চূড়ান্ত অভিনিবেশে চূড়ান্ত পরিশ্রম করবে এবং পৌঁছবে সেখানেই যেটা প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা। কিন্তু.. এই কিন্তুটাই সব। কৃত্রিম লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছল না কেউ, তাই চাকরিও দিতে হল না। বেতনও দিতে হল না ছ'মাস। কিন্তু সামান্য বাস ভাড়ার বিনিময়ে কোটি টাকার পণ্য বিকিয়ে গেল! একদল ছেলেমেয়ে না পেরে ছেড়ে দিল এক মাস দু'মাস পর, অন্য একদল এল। বিক্রি অব্যাহত রইল।

হঠাৎই, ছোটবেলায় যেমন ভাইকে আদর করত, তেমনই ইচ্ছে হয়েছিল তার। সে বোঝে, বুঝতে পারে, তার নিজের চেয়ে তার ভাইয়ের দৃষ্টিতে অনেক বেশি স্বচ্ছতা। আর ভাই তখন দু'আঙুলে জ্বলতে জ্বলতে ছাই ওগরানো সিগারেটের শেষাংশ ধরে দু'হাত ছড়িয়ে শুনিয়েছিল ব্যান্ডের গান। সে শোনে না যেসব, সেই ব্যান্ডের গান—

সকালে উঠে দেখি এক মুমূর্ষু গাধা
চোখ দুটো ঢুলঢুলু তার ঠোঁট দুটো সাদা
থেবড়িয়ে পড়ে যায় ল্যাজে গিঁট বাঁধা
গাধার অবস্থা কী করেছেন কী করেছেন দাদা
গাধাটাকে জল দাও...

সে, হাস্যবিরল মানুষ হয়ে যেতে থাকা, সে-ও শুনে হেসে উঠেছিল শব্দ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাসির কিছু ছিল না। বিদেশ পাড়ি দেওয়া গাধারা তবু অর্থমূল্য পেয়ে যায়। যে-গাধারা দেশি থেকে গেল তাদের ভাঁড়ার শূন্য।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে বিশ্বদীপ পারছে কী করে? কী করে পারল তিন মাস!

পারল স্বপ্নের দিকে ধাবিত থেকে। সাধ্যাতিরিক্ত করে। সাধ্যাতিরিক্ত করে সাধ্যাতীতকে সে আয়ত্ত করেছে।

সে আপত্তি করেছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে হিতে বিপরীত হতে পারে বলেছিল। মা তখন ঝাঁঝিয়ে ওঠে তার ওপর। বলে, উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করাই পুরুষমানুষের কর্তব্য। এবং এই বয়সই পরিশ্রমের উপযুক্ত!

পরিশ্রমের উপযুক্ত বয়সে পরিশ্রম করছে অতএব বিশ্বদীপ। সকাল সাতটায় বেরিয়ে যায় কারণ ঘরে ঘরে বাবু ও বিবিরা তখন উপস্থিত থাকেন। তাকে গ্রহণ করা বা বিতাড়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হয়। সেইভাবে দেখতে গেলে জনগণ অত্যন্ত দয়ালু। তাঁদের দেখার বা শোনার সময় নেই। তবু কয়েকজন সময়ের থেকে সময় রাহাজানি করে তাকে সুযোগ দিয়েছেন। অন্তত বলার সুযোগ। দশটা বাড়ি ঘুরলে একটা বাড়িতে বিক্রি। বাকি সব বাড়িতে সকালে সময় নেই কারণ আপিস যাবার তাড়া। দুপুরে সময় নেই দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত। বিকেলে সময় নেই ইস্কুল-ফেরত আপিস-ফেরতদের জন্য খাবার-দাবারের ব্যস্ততা। সন্ধের পর থেকে তো হরেক কাজ।

পৃথিবীতে মানুষের কাজের কোনও শেষ নেই। তারও নেই প্রচেষ্টার শেষ। সপ্তাহে তিনদিন বিশ্বদীপ সকাল সাতটায় বেরিয়ে সন্ধে সাতটায় ফিরে আসে। তারপর পড়াতে যায়। বাকি চারদিন সে বেরোয় একই সময়, কিন্তু ফিরে আসে রাত দশটায়। ওই চারদিন টিউশন নেই বলে সেই সময়টুকু সে স্বপ্নের কিনারায় ঢেলে দেয়। লক্ষ্যমাত্রা অভিমুখে সারাদিন ছুটে ছুটে ক্লান্ত। তার কোনও রবিবার নেই।

সেদিক থেকে বরং পাঁচ টাকার হরেক মাল ফিরিওয়ালাদের সুবিধে, পথ দিয়ে বোঝা সঙ্গে করে তারা হেঁকে যায়। তাদের টানা স্বরে পাড়ায় পাড়ায় উদাসী আবহ তৈরি হয়। যার প্রয়োজন, ডেকে নেয় তাকে। দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবার দায় নেই তার। পকেটে কানাকড়ি, এদিকে ঝলমলে পোশাক পরে সংস্থার মান রাখার দায় নেই।

ঝলমলে পোশাক। কাজে যোগ দেবার সময় বিশ্বদীপের এই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। তখন দেবনন্দন সব সমাধান করে দেয়। ছোট শ্যালক হিসেবে বিশ্বদীপকে সে উপহার দেয় দু'প্রস্ত মূল্যবান পোশাক।

দেবনন্দন! দেবনন্দন! তার আশৈশবের বন্ধু। তার বোনের স্বামী। দেবনন্দন। সে দেবনন্দনকে আজ খারাপ পাড়ায় দেখেছে।

খারাপ পাড়া কেন? সে জানে না। ভাবেনি কখনও। লোকে বলে। সেও বলছে। চোর, ছ্যাঁচড়, অসৎ, ভণ্ড, প্রবঞ্চক, মিথ্যেবাদী গিস-গিস করা এই সব ভদ্রপাড়া ভাল পাড়া। আর ও পাড়া হল খারাপ পাড়া। সে আজ খারাপ পাড়ায় দেবনন্দনকে দেখেছে। আর দেখামাত্র, যাতে তাদের চোখাচোখি হয়ে না যায়, সে পালিয়ে এসেছে দ্রুত পায়ে।

কেন গিয়েছিল দেবনন্দন? কখন গিয়েছিল? কবে থেকে যায়? সে তো জানেনি কোনও দিন। শোনেনি তো! আশৈশব বন্ধু তারা, একসঙ্গে দেখতে শুরু করেছিল ন্যাংটো মেয়ের ছবি, আজ কত দূরে চলে গিয়েছে পরস্পর?

কেন গিয়েছিল দেবনন্দন? কেন?

সে মরে গেলেও এ কথা শুচুকে বলতে পারবে না। জানতে চাইতে পারবে না, শুচু, নীলচে রোগী শুচু, যৌনতায় অপারঙ্গম কি না। সে এ কথা বলতে পারবে না এমনকী বিশ্বদীপকেও। তা হলে কাকে বলবে? কার সঙ্গে আলোচনা করবে এর ভয়াবহতা নিয়ে? কাকে বলতে পারত?

চন্দ্রাবলীর মুখ তার মনে পড়ে। চন্দ্রাবলীকে সব বলা যেত। সব।

সে ছটফট করে। এপাশ ওপাশ করে। ঘুম কামনা করে কিন্তু ঘুম আসে না। চন্দ্রাবলী, শুচু, দেবনন্দন, সমাধিক্ষেত্র, পাপ, পুণ্য, জীবন-মৃত্যু তাকে ঘিরে ঘুরপাক খায়। মা, বিশ্বদীপ, মহুলি, মালবিকা, চম্পা একসঙ্গে হাত পা নেড়ে কথা বলে। সে পরিষ্কার দেখতে পায় সেই কুয়ো, যার মধ্যে মৃতদেহ শুয়ে আছে। সেই জন লোকটাকে দেখতে পায় যে সমাধিক্ষেত্র পাহারা দেয়, সারাদিন সমস্ত জায়গাটা ঘুরে

বেড়ানো ছাড়া যার কাজ শুধু কুকুরকে খাওয়ানো। তার পাশে নির্বিকার এসে দাঁড়ায় মেয়েদের মতো ছেলেটা। আর পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যায় যিশু যিশু বলতে বলতে আলোকবর্তিকা হাতে পুরুষ। আর আসে একটি সাপ। বিশাল কালো সাপ। মুহূর্তে সে সাদা হয়ে যায়। মুহূর্তে কালো। আর এক চতুর্দশীকে ঘিরে পাক খায়। পাক খেতে থাকে। আর সে, অবাক হয়ে দেখে সেই চতুর্দশী শুচু। শুচু চিৎকার করে। শুভদীপ বলে চিৎকার করে। অতঃপর শুভদীপ শুভ হয়ে যায়। বিশ্ব হয়ে যায়। শুভ শুভ বিশ্ব বিশ্ব...

সে ধড়ফড় করে উঠে বসে। মা ডাকছে। তাড়াতাড়ি যেতে বলছে তাদের। বাবা কেমন যেন করছে। কীরকম করছে? কীরকম? সে ভাইকে ঠেলছে। ভাই উঠছে না। উঠতেই চাইছে না। সমস্ত শরীর জুড়ে এক মহাসমুদ্র ঘুম তাকে জড়িয়ে আছে। সে তখন ঝাঁকানি দেয় ভাইকে আর ভাই ঘোর ভেঙে, ঘুম তাড়িয়ে আরক্ত চোখে উঠে বসে। ভাইকে বাবার অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে পাশের ঘরে যায় সে।

দৃষ্টিহীন চোখে শুয়ে আছে বাবা। মুখের ডান পাশ বাঁকা লাগছে, স্থির, নিস্পন্দ। কিন্তু বুক উঠছে-নামছে। সে বাবার পায়ে হাত দেয়। বরফশীতল পা। বিশ্বদীপও এসে দাঁড়ায় তখন। সে ডাক্তার ডাকতে যাবার জন্য তৈরি হয়। বিশ্বদীপও সঙ্গে সঙ্গে আসে। দু'জনে মিলে ছুটতে থাকে ডাক্তারের বাড়ি। দরজায় ঘণ্টি বাজায় একযোগে, একযোগে কড়া নাড়ে। একযোগে ডাক্তারের নাম ধরে চিৎকার করে। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট— পাঁচ মিনিটের মাথায় ডাক্তারের তিনতলার জানালা খুলে যায়। তারা একসঙ্গে ওপরের দিকে মুখ তোলে। পরিবেশন করে বাবার অসুস্থতার সংবাদ। পাড়ার চেনাশোনা সদাসম্বল ডাক্তার লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে নেমে আসেন নীচে। তারা তাঁকে বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করে। তিনি আরও তিন মিনিট ব্যয় করে গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবি চাপিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসেন। বিশ্বদীপ তাঁর হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে নেয়। এবং বাবাকে পরীক্ষা করেই তিনি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। একটুও সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতাল।

ডাক্তারের পাওনা চুকিয়ে দেয় মা। বিশ্বদীপ ব্যাগ হাতে করে ডাক্তারকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। দু'জনে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। বিশ্বদীপ ট্যাক্সির খোঁজে বেরোবার জন্য পা বাড়ায়। আর তখন মা দেবনন্দনকে খবর দেবার কথা বলে। দেবনন্দনের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নেবার কথা বলে। শুভদীপ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। টের পায় দেবনন্দনের নামে তার মধ্যে ঘৃণার উদ্‌গিরণ। এবং, উপলব্ধি করে তাদের দুই ভাইয়ের তৎপরতা সত্ত্বেও মা দেবনন্দনের পরামর্শ চাইছে। আসলে মা দেবনন্দনকে গোড়া থেকে পাশে চাইছে। কেন চাইছে? কেন? তার টাকা আছে বলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে সংকল্প করে, বাবার চিকিৎসার জন্য একটি পয়সাও দেবনন্দনের কাছ থেকে নেবে না।

১৯

অবস্থা ভাল নয়। মস্তিষ্কে রোগাক্রমণ ঘটেছে বাবার। ডান পাশ অসাড় হয়ে গেছে। হেঁটে-চলে অন্তত প্রাতঃকৃত্য করতে যেত, সেটুকুও পারবে না আর। মা কাঁদছে। রোজই কাঁদছে গিনগিন করে। শুচু নিরন্তর মায়ের সঙ্গে আছে। অভয় দিচ্ছে। আর শুভদীপ আজও পর্যন্ত শুচুর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। তারা যেমন, সেই চোখে-চোখে কথা বলে বুঝে নিত সব, নিজস্ব ভাষায়, সেই ভাষাকেই শুভদীপ এড়িয়ে যাচ্ছে প্রাণপণে।

দেবনন্দনের সঙ্গে সে স্বাভাবিক আছে। যদিও সে জানে, এই স্বাভাবিকতা আগের মতো নয়। হবেও না কখনও। কিন্তু এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে তার গাম্ভীর্য আলাদা করে কারও চোখে পড়ছে না।

জরুরি বিভাগের সাধারণ শয্যায় আছে তাদের বাবা। চারদিন জ্ঞান ছিল না। এখন মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। চিনতে পারছে না কারওকেই। চোখ দুটি ঘোর-ঘোর। দু'সপ্তাহ সম্পূর্ণ কেটে গেলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে, মনে করছেন ডাক্তার।

চব্বিশ ঘণ্টা কারওকে নয় কারওকে মোতায়েন থাকতে হচ্ছে। থাকতে হবে পুরো চোদ্দো দিন। আজ চতুর্থ দিন সবে।

পরপর তিন দিন সারাদিন সারারাত্রি সে এই হাসপাতালেই ছিল। বিশ্বদীপ রাত্রে যোগ দিয়েছিল তার সঙ্গে। অসুবিধা হচ্ছে তার। তবু সে বিশ্বদীপকে কাজে বেরোতে দিয়েছে। তাদের ছোট সংস্থা। এ রকম দরকারে ছুটি আটকায় না। মাইনে কেটে নেয় অবশ্য।

দিনের সময়টায় দেবনন্দনও তার সঙ্গে ছিল। মাকে আর শুচুকেও সে-ই নিয়ে এসেছে। ফেরত নিয়ে গেছে। দেখতে যাবার সে রকম কড়াকড়ি নেই। নির্ধারিত সময় আছে একটা। কিন্তু প্রহরীকে দিনে একবার পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে রাখলে সারা দিনে যতক্ষণ খুশি, যতবার খুশি যাওয়া যায়।

প্রতিদিন আসা শুচুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নয়। কিন্তু শুনছে না সে। কাল থেকে সে-ও অল্প-স্বল্প কাজে বেরোবে ঠিক করেছে। মাইনেটা বাঁচবে অন্তত। চার-পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে সোজা হাসপাতালে চলে আসবে।

আজ রাত্রে হাসপাতালে সে একা। কাল থেকে সে আর বিশ্বদীপ একদিন অন্তর করে থাকবে। সকাল থেকে দেবনন্দন। দুপুর নাগাদ সে এসে থেকে যাবে রাত এগারোটা পর্যন্ত। তার থাকার পালা থাকলে আর ফিরে যাবে না।

কাজ নেই তেমন কিছু। শুধু সারাক্ষণ সতর্ক থাকা। যদি কোনও প্রয়োজন হয়। আর মাঝে মধ্যেই ওষুধ কিনতে যাওয়া। আর ওষুধ কিনতেই তাদের মাস খরচের টাকা দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। সঙ্গে সি টি স্ক্যান ইত্যাদি পরীক্ষার খরচ আছে। প্রাথমিক ভাবে সেভিংস অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিয়েছিল তারা। কিন্তু এখন আরও প্রয়োজন। আজ দেবনন্দনকে হাসপাতালে রেখে সে এসেছে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। দশ হাজার ও বিশ হাজার টাকার দুটি বিনিয়োগপত্র আছে তাদের। শেষ সম্বল। সে ভাবছে, দশ হাজার টাকার পত্রটি ভাঙিয়ে নেবে আপাতত।

কিন্তু তার প্রস্তাব শুনেই নাকচ করে দেয় মা। তাকে অন্য ভাবে

জোগাড় করার চেষ্টা দেখতে বলে।

মায়ের ইশারা বুঝতে পারে সে। এবং বুঝেই, ঋণ নেবার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়। ঋণ নিলে শুধতে হবে। কীভাবে শুধবে তারা? অতএব সে ঘোষণা করে— যতক্ষণ নিজেদের একটিও টাকা আছে, ততক্ষণ ঋণ নেবে না কোথাও।

মা তখন, শুচুর সামনেই, দেবনন্দনের প্রস্তাব দেয়। দেবনন্দন ঘরের ছেলে— এ ভাবেই উপস্থাপিত করে মা। তার কাছ থেকে ঋণ নিলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আস্তে আস্তে শোধ দিলেই চলবে।

শুচু মুখ নিচু করে থাকে। হ্যাঁ বা না বলতে পারে না। মাকে সমর্থন করতে পারে না, নাকচও করতে পারে না। দেবনন্দনের ওপর ওর পূর্ণ অধিকার। কিন্তু দেবনন্দনের অর্থের ওপর ও কোনও অধিকার ফলিয়ে নেবার চেষ্টা করে না। খাঁচায় বসে সুবল ডানা ঝাপটায়। দু'একবার শুচুকে ছোলা দিতে, লংকা দিতে অনুরোধ করে। এবং চুপ করে যায়। শুচুকে দেখলে, তার পাত্র পরিপূর্ণ থাকলেও সে বার বার ছোলা ও লংকা দাবি করে। একবার কোনও ক্রমে খাঁচার দরজা খুলে যায়। তখন সে উড়ে গিয়েছিল। দু'একবার আকাশে ঘুরে ফিরে সে প্রত্যাবর্তন করে আবার। সেদিন ছাদে বসে সে এই কথাগুলোই বলেছিল। শুচু, ছোলা দে, লংকা দে। শুচু ছোলা দে, লংকা দে।

শুভদীপ শুচুকে দেখে। মাকেও দেখে। তারপর থেমে-থেমে কেটে-কেটে কঠিন কণ্ঠে বলে, বাবার উপার্জন করা অর্থ বাবার চিকিৎসায় ব্যয়িত হবে। তাদের কারও অধিকার নেই ওই অর্থ অন্য ভাবে খরচ করার।

শুচুর কৃতজ্ঞ চোখ সে দেখতে পায়। আর মা তখন আলমারি খুলে দশ হাজার টাকার বিনিয়োগপত্র বার করে ছুড়ে দেয় তার দিকে। সে মায়ের এই ক্রোধকে শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারে। পারে শুধু শুচুর কৃতজ্ঞ চোখ দুটির জন্য।

২০

বড় ডাক্তার দিনে দু'বার রোগী দেখতে আসেন। সকালে আর সন্ধ্যায়। রাত্রে যেদিন থাকে সে, সকালে বড় ডাক্তারের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। নয়তো দেবনন্দন থাকে। সন্ধ্যাবেলায়ও সে-ই ডাক্তারের আগমনকালে উপস্থিত থাকে।

বড় ডাক্তার শুধু নির্দেশ দিয়ে যান। আর কর্তব্যরত শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা সারাদিনের ভরসা। বড় ডাক্তারের নির্দেশমতো তাঁরা কাজ করেন। সঙ্কটাপন্ন রোগীও তাঁরা সামলান। শুভদীপ একদিন দেখেছিল বাবার পাশের শয্যায় এক বৃদ্ধকে অক্সিজেনের নল পরাতে গিয়ে নাকাল হয়ে যাচ্ছেন এক শিক্ষানবিশ ডাক্তার। কফ, থুতু, মল, মূত্র, রক্ত ও রোগের এক বিচিত্র গন্ধ এই ঘরে। প্রায় গোটা হাসপাতাল জুড়ে।

বড় ডাক্তার রোগী দেখতে এলে হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে যায় রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে। সে-ও সেই ঠেলাঠেলিতে শামিল হয়। নিজেকে তখন খুব ছোট, খুব অসহায় লাগে তার। বড় ডাক্তারবাবুর গাড়ি ঢুকছে দেখলেই তারা প্রত্যেকে সন্ত্রস্ত। নিরাপদ দূরত্ব রেখে গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকের মুখ প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ কিন্তু আশঙ্কায় করুণ। যেন দেবতা নেমে আসছেন সহস্রার হতে। বর দেবেন। একটুকরো করে প্রাণ ভিক্ষা দেবেন প্রত্যেককেই।

বড় ডাক্তার এই সমস্ত উপেক্ষা করে হেঁটে যান। মূল্যবান পরিপাটি পোশাক পরে হেঁটে যান। এই নোংরা, আবর্জনাময়, দুর্গন্ধে পূর্ণ হাসপাতালে ডাক্তারের মূল্যবান পোশাক। তাঁকে দেখায় কেমন জ্যোতিঃপূর্ণ। তাঁর সবসময়ই তাড়া। তিনি সবসময়ই ব্যস্ত। রোগীকে স্পর্শ করতে না করতে রোগসমূহ তিনি নির্ণয় করে ফেলেন। রোগীর বিলাপ শুনবেন— সে সময় নেই। রোগীর আত্মজনের উদ্বেগ প্রশমিত করবেন— নেই তারও সময়। তিনি হেঁটে যান আর লোকজন সরে-সরে পথ করে দেয়। ডাক্তারবাবুর দুই মুঠোয় হাজার রোগীর নিরাময়।

এবং কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আগের মতোই জনগণ উপেক্ষা করে গাড়ি চেপে চলে যান। তখন শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা হাতে কাগজপত্র নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। সার সার বেঞ্চ পাতা একটি ফাঁকা ঘর। অল্প আলো। আর রোগীর আত্মীয়রা ছুটোছুটি করে ওইসব ছোট ডাক্তারদের ঘিরে ফেলে। এ ওকে ঠেলে এগিয়ে যেতে চায়। ডাক্তাররা রোগীর নাম ধরে চিৎকার করেন। বাড়ির লোক এগিয়ে গেলে কী কী ওষুধ কিনতে হবে, কী কী পরীক্ষা করা হবে, তার জন্য কিছু করতে হবে কিনা বুঝিয়ে দেন। আর তখন রোগীর আত্মীয়দের চারপাশে ভিড় করে থাকে বিভিন্ন রোগনির্ণয় কেন্দ্র, সেবাকেন্দ্র ও ডাক্তারের দালালরা। কম খরচে চমৎকার চিকিৎসা এবং নিশ্চিত নিরাময় পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে বহু রোগী তারা হস্তগত করে।

বারো দিন পার হয়ে গেল তাদের। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে বাবা এখন। খাবার নল খুলে দেওয়া হয়েছে। চামচে করে গলা-গলা খাবার খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছে শুচু আর মা। শুয়ে শুয়ে শয্যাক্ষত হয়ে গিয়েছে বাবার। মা দেবনন্দনের সাহায্যে প্রতিদিন বাবাকে কাত করে ধরে, আর শুচু ওষুধ লাগিয়ে দেয়। আর দু'-চার দিন কেটে গেলেই তারা বাবাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

আজ রাত্রে শুভদীপের থাকার কথা ছিল না। বিশ্বদীপ সুস্থ নেই বলে সে এসেছে। খুব কাশছে বিশ্বদীপ। সঙ্গে জ্বর। কফের সঙ্গে হালকা লাল ছিটে। বেশি ঠান্ডা লাগলে হয় এমন, সে জানে। গলায় ক্ষত হয়ে যায় যেন। এইসব জ্বর নিয়ে, ক্ষত নিয়ে খোলা আকাশের নীচে রাত্রিবাস স্বাস্থ্যকর নয় বিশ্বদীপের পক্ষে। সে-ই চলে এসেছে একেবারে তাই। জরুরি বিভাগের সামনের চাতালে এখন চাদর বিছিয়ে শোবার পালা চলছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজন সব। কারও ভাই, কারও বন্ধু, কারও বাবা, স্ত্রী, বোন। সম্পর্কের অমোঘ টানে ভূমিশয্যায় শুয়ে রাতের পর রাত কাটাচ্ছে তারা। শুচু একটা ফোলানো বালিশ দিয়েছে। সে বালিশে ফুঁ দিচ্ছে যখন, দেখল, রোজকার মতো টিফিন বাক্স খুলে ভাত খাচ্ছে ছেলেটা। বাচ্চু। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। আলাপ হয়েছিল একদিন। বাবার দুটো শয্যা পরে বাচ্চুর বাবা আছে।

কী হয়েছে ভদ্রলোকের সে জানে না। বাচ্চু রোজ দু'বেলা আসে। রাতে আসে সকালে চলে যায়। দুপুরে আসে বিকেলে চলে যায়। আর প্রত্যেক দিন, বাবাকে খাওয়ানোর পর উদ্বৃত্ত ভাত নিজে খায় বসে বসে।

গোটা ব্যাপারটা ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে তার। বাচ্চু কি বাড়ি থেকে খেয়ে আসে না? আসে। সে জিজ্ঞেস করেছিল। তারপরেও সে এই ভাত খায়।

বাচ্চু হাসে তাকে দেখে। সেও হাসে। মুখের ভাত গলাধঃকরণ করে তার বাবা কেমন আছে জানতে চায়। সে মাথা নাড়ে। ভাল। আর সে না জিজ্ঞেস করতেই পরবর্তী গ্রাস মুখে তোলার আগে সে জানিয়ে দেয়— তার বাবাও আছে। ভাল।

সে তখন বালিশের নীচে ব্যাগ বিছিয়ে নেয় এবং অন্য অনেকের সঙ্গে গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। আর শোবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় ফোনবুথের আলো। এস টি ডি, আই এস ডি, পি সি ও তার চোখের সামনে দুলতে থাকে। একটি দুর্দম ইচ্ছে তাকে অধিকার করে নেয়। সে ব্যাগ থেকে বার করে নেয় কার্ড। কত বার এই ইচ্ছে হয়েছে তার। কত বার। আর সে এরকম ভাবেই এই কার্ড বার করেছে। হাতে নিয়ে নিয়ে ময়লা হয়ে গেছে চারপাশ। রাগে কার্ডসমেত মুঠো পাকিয়েছে বলে ফাটল ধরে গেছে। এবং মুখস্থ হয়ে গেছে। তবুও সে আবার দেখছে। নাম দেখছে। কৃতিত্ব দেখছে। এবং ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে শেষ সাক্ষাৎ। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। এবং শেষ ভ্রমণ। আর কখনও তারা একসঙ্গে কোথাও যাবে না। তাদের যৌথ পরিক্রমা শেষ হয়ে গেছে। কেন গেছে? কার জন্য? চন্দ্রাবলীর জন্য। চন্দ্রাবলী ঠগ। চন্দ্রাবলী প্রবঞ্চক। মিথ্যুক। কদাকার এবং কদাচারী। সে চন্দ্রাবলীকে ঘৃণা করে। তীব্র ভাবে ঘৃণা করে। সে ঘৃণা করে মালবিকাদিকে। ঘৃণা করে মহুলিকে। সে যে ঘোষণা করেছিল মহুলিকে ভালবাসে— সে ছিল বিভ্রম। সে যে মহুলির ছবি রাখত সঙ্গে— সে ছিল মোহ। এখন মোহ কেটে গেছে তার। বিভ্রম ঘুচে গেছে। সে একটিই মাত্র নারীকে জানে। একমাত্র সৎ নারী। একমাত্র

নিরপেক্ষ আশ্রয়। তার ক্রোড়ে কোনও পক্ষাবলম্বন থাকে না, থাকে না কোনও প্রতারণা। সে হাসপাতালের বিচিত্র জনমণ্ডলীর মধ্যে শুয়ে, বিচিত্র গন্ধ ও শব্দসমূহের মধ্যে, নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে শুয়ে সেই নারীকে কল্পনা করার প্রয়াস নেয়, তার কাছে পৌঁছনোর উপায় ভাবতে থাকে কিন্তু মন লাগে না। অতি আকাঙ্ক্ষিত, অতি প্রিয় মৃত্যুতেও মন লাগে না। সমস্ত বাধা ঠেলে, বিরুদ্ধতা ঠেলে টেলিফোন যন্ত্রের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে। দূরভাষে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে আহ্বান। দূরে, দূরান্তরে। কত দূর সে জায়গা? সে উঠে বসে। ব্যাগ থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খায়। নিঝুম হয়ে আসছে হাসপাতাল। যদিও শ্মশানের মতো এখানেও ঘুম নামে না সর্বত্র, আলো নেবে না।

শুতে ইচ্ছা করে না তার। বসতেও ইচ্ছা করে না। সে তখন দু'পা ভাঁজ করে জানুতে চিবুক রাখে। আর তার মনে পড়ে যায়। সে এ ভাবে বসলে চন্দ্রাবলী বলত দুঃখী লাগে। দেখতে দুঃখী লাগে। গালে হাত দিলে বলত দুঃখী লাগে। কপালে বাহু রেখে শুলে বলত দুঃখী লাগে। চন্দ্রাবলী তাকে দুঃখী দেখতে পারত না। দুঃখী সহ্য করতে পারত না। সে সংসারের কথা বলতে বলতে বিষণ্ণ হয়ে গেলে তার চোখ জলে উপচে উঠত। ভরসা দিত। তারা দু'জনে থাকবে যখন, সম্মিলিত চেষ্টায় সংসারের অবস্থা ফিরে আসবে। শেষবার যখন বেড়াতে গিয়েছিল তারা, তিন দিনের জন্য, কী হাসিখুশি ছিল সে প্রথম দু'দিন। কোণার্কের সূর্যমন্দিরে গিয়ে মৈথুনের বহু প্রকাশ দেখেছিল অপলক।

কোণার্ক। পুজোর সময় চন্দ্রাবলীই বেশি করে যেতে চেয়েছিল। গানের ইস্কুলের ছুটি চলছিল। টিউশনও ছিল না। আগে থেকে প্রস্তুত ছিল না বলে মনোমতো কোথাও যেতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত একমাত্র কোণার্কতেই তারা থাকার জায়গা পেয়ে যায়।

দুর্গাপূজা চলছিল তখন। ঢাকঢোল বাজছিল। চমৎকার সাজানো-গোছানো অতিথিনিবাসে উঠেছিল তারা। অষ্টমীর সকালে পৌঁছেই স্নান সেরে নেয় চন্দ্রাবলী। তার হাতে নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি ধরিয়ে

দেয়। আর সে স্নান সেরে এসে দেখে জানালার কাছে বসে আছে চন্দ্রাবলী। ভেজা চুল খুলে ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠময়। আকাশি রঙের কালো পাড় তাঁতের শাড়ি পরেছে। ঘন নীল শরতের আকাশে চোখ রেখে গান গাইছে গুন গুন। ক্রিম পাউডার ক্লিপ সে ফিটিপিন— সমস্ত সাজিয়েছে ড্রেসিং টেবিলে। ব্যাগপত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে দেওয়াল আলমারিতে। ঘরে মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে। সে তখন চুল আঁচড়ে, চশমা পরে, চন্দ্রাবলীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে টান-টান। উঁচু মনে হয়নি কোল। ঘাড় টনটন করেনি। শুতে-শুতে কবে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সে তখন চন্দ্রাবলীর হাতে হাত রাখে, আকাশের দিকে তাকায়। গাঢ় নীল আকাশ দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। সে চন্দ্রাবলীকে দেখে। চন্দ্রাবলীর ভারী স্তন আলগোছে তার কপাল স্পর্শ করে যায়। তার শরীরে শিহরন লাগে। বাড়ির কথা তার মনে পড়ে না, সে যে মিথ্যে বলে এসেছে মাকে, মনে পড়ে না। বিত্তহীনতা মনে পড়ে না। প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করতে হবে ভুলে যায় সে কথাও। সে চন্দ্রাবলীকে গান গাইতে বলে। চন্দ্রাবলী তার চশমা খুলে নেয়। তার কপাল চুম্বন করে। এবং গায়।

সুতল রহলু ম্যায় নিদ ভরি হো পিয়া দহলৈঁ জগায়।
চরণ কঁবলকে অঞ্জন হো নৈনা লে লুঁ লগায়।
আসোঁ নিঁদিয়া ন আবৈ হো নহি তন অলসায়।
পিয়াকে বচন প্রেম-সাগর হো চলুঁ চলি হো নহায়।

— ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়ে ছিলাম। প্রিয় আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার চোখে লাগিয়ে নিয়েছি তাঁর চরণ-কমলের অঞ্জন। শরীরে আর আলস্য লাগবে না। ঘুম আসবে না আর। প্রিয়তমর কথা, সে যে প্রেমের সমুদ্র, আমি তারই মধ্যে অবগাহন করি।

জনম জনমকে পাপবা ছিনমেঁ ডারব ধোবায়।

যহি তনকে জগ দীপ কিয়ৌ প্রীত বতিয়া লগায় ॥
পাঁচ তত্ত্বকে তেল চুয়ায়ে ব্রহ্ম অগিনি জগায়।
প্রেম-পিয়ালা পিয়াইকে হো গিয়া পিয়া বৌরায় ॥

—জন্ম-জন্মান্তরের পাপ এক মুহূর্তে ধুয়ে ফেলব আমি। এ দেহকে করব জগতের দীপ। তাতে দেব প্রীতির সলতে। পঞ্চতত্ত্বের তেল দিয়ে ব্রহ্মাগ্নিতে জ্বালিয়ে নেব। আমাকে পেয়ালা ভরে প্রেমসুধা দিলেন প্রিয়তম এবং নিজেও মত্ত হয়ে পান করলেন।

বিরহ-অগিনি তন তলফৈ হো জিয় কছু ন সোহায় ॥
উচ অটারিয়া চঢ়ি বৈঠ লুঁ হো জহঁ কাল ন জায়।
কহৈ কবীর চিচারিকে হো জম দেখ ডরায় ॥

—বিরহের আগুনে দেহ জ্বলে-পুড়ে গেল। আর কিছুই ভাল লাগে না। এমন উঁচু অট্টালিকার ওপর চড়ে বসেছি আমি, যেখানে কালের গতিও নেই। কবীর বলে, সেখানে আমার কাছে আসতে যমও সাহস পাচ্ছে না।

আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে। কখন সে চন্দ্রাবলীর মাথা নামিয়ে আনে নীচে আর ওষ্ঠে রাখে মুখ, কখন তার হাত চলে যায় স্তনে আর কালো পাড় আকাশি রঙের শাড়ি মাটিতে খসে পড়ে, কখন সে শয়ন করে শায়িত চন্দ্রাবলীর শরীরে এবং প্রবেশ করে যোনিতে সে জানে না। সে জানে না, সেদিন ওই সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত তারা সফল সঙ্গম করেছিল সাতবার কেমন করে সে জানে না। গোটা একটি দিন তারা কাটিয়ে দিয়েছিল আহারে, নিদ্রায় আর মৈথুনে। খুব খুশি ছিল চন্দ্রাবলী। খুব আনন্দিত।

পরদিন সকালে প্রসন্ন ঝকঝকে ভোরে সে টের পায় তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে চন্দ্রাবলী। একমুঠো শিউলি ফুল হাতে। সে

হঠাৎ চাপ বোধ করে। মনে হয় চন্দ্রাবলীর মাথা একটি হাতির মাথার মতো ভারী। সে চন্দ্রাবলীকে বুক থেকে সরে যেতে বলে। চন্দ্রাবলী শোনে না। বরং হাসে। বরং নিবিড় হয় আরও। হাতের শিউলিফুল সে বিছানায় ছড়িয়ে দেয়। বলে ফুলশয্যা তাদের। বলে সারা শয্যাময় বিছানো শরৎ।

এই কাব্যিকতাকে তার বাহুল্য মনে হয়। আধিক্যতা মনে হয়। সে ঠেলে সরিয়ে দেয় চন্দ্রাবলীকে আর চন্দ্রাবলীর মাথা সজোরে খসে পড়ে। সে তখন তাকে অতিরিক্ত আদিখ্যেতা দেখাতে বারণ করে দেয়।

চন্দ্রাবলী চুপচাপ শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কথা বলে না। একটি দীর্ঘ নীরবতা তাদের মধ্যে বিরাজমান থাকে প্রায় সমস্ত দিন। প্রয়োজনীয় কথার বাইরে কথা হয় না। একবারও গুনগুন করে না চন্দ্রাবলী। শুধু পরিকল্পনা মতো তারা কোণার্কের সূর্যমন্দির দেখতে যায়। আর দেখতে দেখতে দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বহু জনসমাগমে আবিল কোণার্ক সূর্যমন্দিরের স্থির বৃহৎ রথের চাকার সামনে সে যখন চন্দ্রাবলীকে আবিষ্কার করে তখন সে একমনে দেখে যাচ্ছিল মিথুন-মূর্তি। তার চোখের পলক পড়ছিল না। মৈথুনের বহু বিচিত্র ভঙ্গির সামনে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তার কানে যায়নি যুবকেরা কটু মন্তব্য করছে। দু'চারজন মধ্যবয়স্ক লোক এসে দাঁড়াচ্ছে তার গা ঘেঁষে। সে তখন চন্দ্রাবলীর হাত ধরে টানে এবং মন্দিরপর্ব শেষ করে শহরের উপান্তে নির্জন পথে চলে যায়। চন্দ্রাবলী তখন অদ্ভুত প্রশ্ন করে। জানতে চায়, সে মরে গেলে শুভদীপ খুশি হবে কিনা।

এ প্রশ্নে শুভদীপের বুকের মধ্যে টনটন করেছিল কষ্টে। হঠাৎই তার চন্দ্রাবলীকে বড় করুণ লেগেছিল। মহুলিকে সে যা বলেছিল, কোনও সচেতন উপলব্ধি থেকে নয়। কিন্তু কোণার্কের সেই নির্জনতায়, ছোট ছোট ঝোপ ঠেলা পথে যেতে যেতে সে চন্দ্রাবলীর অসহায়তাকে প্রত্যক্ষ করেছিল সর্বাংশে। সে করুণা করেছিল। সম্পূর্ণ করুণা করেছিল এবং অতিথিনিবাসে ফিরে সে যৌনতার তাগিদে নগ্ন করেছিল চন্দ্রাবলীকে। মন্দিরের মৈথুন দৃশ্য সেও দেখেছিল আড়চোখে এবং মনে মনে উত্তেজিত ছিল।

উত্তেজনার অবসান হলে তারা নীরবে জানালার কাছে বসে এবং দেখতে পায় আকাশে হাজার তারার ঢাকাই বুটি। চন্দ্রাবলী আলো নিবিয়ে দেয়। এবং তার গা ঘেঁষে বসে। মৈথুন তার বিষণ্ণতা হরণ করেছে। সে তখন গুনগুন সুর সাধে আর হঠাৎ আকাশ থেকে খসে পড়া নক্ষত্র দেখতে পেয়ে প্রার্থনা করে। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করে। এবং চোখ খুলে প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে দেয়। শুভদীপের কাঁধে গাল চেপে আদুরে গলায় জানায়— ঝরে-পড়া নক্ষত্রের আছে মনস্কামনা পূরণের শক্তি। যা চাওয়া যায় তার কাছে, তাই পাওয়া যায়।

শুভদীপ বলতে উদ্যত হয়েছিল যে পতনশীল নক্ষত্র আসলে হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জড়বস্তু ছাড়া কিছু নয়— কিন্তু, তার বলার আগেই আকাশে এক আশ্চর্য আলোর ফুলঝুরি ওঠে। এবং একের পর এক উঠতেই থাকে। নানা আকারের, নানা বর্ণের ফুলঝুরি। আতসবাজির ফুলঝুরিতে আকাশ ছেয়ে যায়। আর তারা দু'জন, গায়ে গা লাগিয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সেই আশ্চর্য সুন্দরের দিকে।

২১

চমকে উঠল সে। তার পাঁজরে খোঁচা মেরেছে পাশের লোকটি। বিড়ি খাবে। তার দেশলাই চাই। দেশলাই রাখে না শুভদীপ, তার ধূমপানের অভ্যাস নেই।

সে পাশ ফিরে শোয় এবং চোখ বন্ধ করে। আর মানসে ভেসে ওঠে সমুদ্র। সুনীল সুবিস্তৃত সমুদ্র। দশমীর সকালে কোণার্কের সমুদ্রপারে গিয়েছিল তারা। কোণার্ক শহর থেকে অনেকটা পথ। তারা রিকশা নিয়েছিল। আর মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বসেছিল পাশাপাশি সমুদ্রের বালুচরে।

কোণার্কের বেলাভূমি স্নানের উপযুক্ত নয়। তাই ভিড় কম। ছোট ছোট দোকান। মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি তুলছে শঙ্খের ফিরিওয়ালা। আর তারা জলের দিকে চেয়ে বসে আছে। কী অসামান্য সমুদ্র! কী গভীর! কী নীল! বড় বড় ঢেউ উঠছে না, কিন্তু সমুদ্র নিজেই শুধু জলের

অপার্থিব সৌন্দর্যে তাদের বিমূঢ় করে দিল। তার মনে হল, এ সৌন্দর্য অনুপম।

যত দূর চোখ যায় গাঢ় নীল জলরাশি। ফুঁসে উঠছে না। যেন চিরশান্ত। চিরতৃপ্ত। অতুলনীয় প্রসন্নতায় পৃথিবীর গভীরতমকে স্পর্শ করেছে। সংযত লহর তুলে দিগন্তে সুনীল আকাশকে ভালবেসে করেছে আলিঙ্গন।

কথার প্রয়োজন নেই, তারা স্তব্ধ হয়ে আছে। আর বহুক্ষণ পর চন্দ্রাবলী বলছে, এমন এই নীল যেন ঈশ্বর তাঁর বিপুল মসিপাত্র উপুড় করে ঢেলেছেন। এক সমুদ্র নীলে তিনি লিখে চলেছেন চিরকালের মহাকাব্য। এই লিখন ফুরোবার নয়। সমুদ্র থেকে যাবে। শুধু বদলে যাবে মানুষেরা। একদল যাবে। আসবে আরেক দল। আর বার বার লিখিত হবে মানুষ।

সারাদিন সমুদ্রপারে থেকে বিকেলে ফিরেছিল তারা। বনপথ ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরেছিল। শহরে ফিরে দেখেছিল বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলেছে। কিছুক্ষণ শোভাযাত্রা দেখে তারা অতিথিনিবাসে ফিরে আসে। আর চন্দ্রাবলী তার মুখোমুখি হয়। প্রশ্ন করে, এবার কি তারা বিয়ে করতে পারে না? এ ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, এই লোকভয়, এই মিথ্যাচার আর কত দিন?

সে তখন অন্যান্য বারের মতোই ধমকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল চন্দ্রাবলীকে। কিন্তু চন্দ্রাবলী থামেনি। সে তখন যুক্তির পর যুক্তির পর যুক্তি সাজাতে থাকে। সে বিচ্ছেদ পেয়ে গিয়েছে বলে, তার সংগীত বিদ্যালয়ে আয় বাড়িয়েছে বলে, এত দিন এত ঘনিষ্ঠতার কথা, তার মা হওয়ার গভীর ইচ্ছার কথা বলে আর বিবাহকে অনিবার্য করে তুলতে চায়।

শুভদীপ তাদের গৃহে স্থান অকুলানের কথা বলে তখন। আর চন্দ্রাবলী বলে সে সানন্দে অপেক্ষা করবে সুসময়ের জন্য, শুধু তাদের বিবাহ নিবন্ধীকৃত হোক।

তখন শুভদীপ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে সংযম। এত দিন যে-কথা সে বলতে পারেনি, বলতে পারেনি যে মোটা, বেঁটে, কালো,

গোল, কদাকার মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে পারে না— তা-ই বলে ফেলে জোর গলায়। বলে ফেলে এবং একটি বিপুল ক্রন্দনের জন্য অপেক্ষমাণ হয়ে যায়।

কিন্তু চন্দ্রাবলী ক্রন্দনে আশ্রয় নেয় না। মৃত মৎস্যের মতো স্তব্ধ, অপলক চেয়ে থাকে তার দিকে। তারপর শুকনো গলায়, ভাবলেশহীন, এক অরুণেশের কথা বলে। অরুণেশ তার সহপাঠী। ভালবেসেছিল তাকে। প্রেম নয়। মাঠে-ঘাটে ঘোরাফেরা নয়। সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল যখন সে স্নাতকপাঠ শেষ করে ঘরে বসে, আর অরুণেশ স্নাতকোত্তর পর্ব ছাড়িয়ে গবেষণা শুরু করেছে। আপত্তির ছিল না কিছুই। শুধু অরুণেশ নমঃশূদ্র ছিল। বাবা রাজি হননি বিয়ে দিতে।

চাকরি নিয়ে রিয়াধে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে অরুণেশ। বিয়ে করেনি। কারণ তার সংকল্প ছিল অন্য কারওকে বিয়ে না করার।

সে তো অপেক্ষা করেই আছে এত কাল, তবু দ্বাদশীর সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে বলে এসেছে চন্দ্রাবলী। এবার অরুণেশকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে আর কোনও বারণ রইল না। রইল না পিছুটান কোনও।

নির্ভার হয়ে ছিল শুভদীপ। হালকা। ফুরফুরে। মনে মনে হেসেছিল সে। এ জগতে প্রত্যেকেরই ভালবাসার মানুষ জুটে যায়। মা মাঝে মাঝে বলে, কোনও বেমানান নারী-পুরুষ দেখলেই বলে, যার যেথা মজে মন, কি-বা হাড়ি কি-বা ডোম।

তারা অতএব একটুও স্পর্শ না করে শুয়ে ছিল সারা রাত।

অব্যক্ত চিরবিচ্ছেদ লিখিত হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। সেই রাত্রেই। হাওড়া ইস্টিশানে নেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মুহূর্তে চন্দ্রাবলী তাকে বলে, অরুণেশ— তার চোখ দুটি সুন্দর— জানিয়েছে। মেদ নয়, মাংস নয়, ত্বক নয়— ওই চোখে ডুবে, সুরেলা কণ্ঠে চেপে কান, একটি সহজ মনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে মন, জীবন কাটিয়ে দেবে অরুণেশ।

আর সেই রাত্রি থেকে তার অসহ্য কষ্ট শুরু হয়। অসহ্য যন্ত্রণা। কেউ যেন তার কোনও দেহাংশ কেটে নিয়ে গেছে। চন্দ্রাবলী আসবে না আর। চন্দ্রাবলী ডাকবে না আর। গান শোনাবে না। বলবে না স্বপ্নের কথা।

শুনবে না শুভদীপ যত কথা বলে। তার কষ্টে সান্ত্বনা হবে না। হতাশায় জ্বালবে না আশার প্রদীপ। সে তখন কুঁকড়ে যায়। দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে নেয় ত্বক। নিজেকে দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে। সে টের পায় সুতীব্র আবেগ। সুতীব্র ভালবাসা। টের পায় এ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব। পারবে না। পারবে না সে। চন্দ্রাবলীকে দেওয়া সমস্ত আঘাত তার বুকে ফিরে ফিরে লাগে, আর সে, একা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একা একা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়।

সে চেষ্টা করেছিল। সংযত হতে চেষ্টা করেছিল। এক দিন, দু' দিন, তিন দিন। চতুর্থ দিন সে ভোরবেলা ছুটে যায়। চন্দ্রাবলীর বাসস্থানে ছুটে যায় আলুথালু, অবিন্যস্ত, আরক্ত চোখ। আর চন্দ্রাবলীকে দেখামাত্র সে প্রবল কান্নায় পড়ে। পারবে না সে। চন্দ্রাবলীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না জানায়।

এবং চন্দ্রাবলী ফিরিয়ে দেয় তাকে। অসম্ভব পাথুরে নির্মোহে ফিরিয়ে দেয়। এত নিরাবেগ, এত নিস্পৃহ সে কখনও ছিল না আগে।

সে যখন পাগলের মতো, কিংবা মাতালের মতো, কিংবা কঠিন রোগাক্রান্ত মানুষের মতো টলতে টলতে চলেছে তখন, কী মনে করে চন্দ্রাবলী ফিরে ডেকেছিল তাকে। বড় আশা নিয়ে সে ফিরে তাকিয়েছিল। চন্দ্রাবলী তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরে ফিরে যায়। এবং বেরিয়ে আসে কার্ড হাতে। অরুণেশের কার্ড। ঠিকানা ব্যাঙ্গালোর।

সেই থেকে ক্রুদ্ধ সে। সেই থেকে চন্দ্রাবলী ঠগ ও প্রবঞ্চক। প্রতারক ও মিথ্যেবাদী। সেই থেকে সে তাকে তীব্র ঘৃণা করে। এখন, সেই মেয়েটিকে তার বড় প্রয়োজন, সেই চন্দ্রাবলীকে বড় প্রয়োজন। মেদ নয়, মাংস নয়, ত্বক নয়, এমনকী সুরেলা কণ্ঠ ও সুন্দর চোখজোড়াও নয়। তার দরকার একটি সহজ মন। তার মনের সঙ্গে মিশিয়ে নেবার জন্য একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখা মন।

কিন্তু সে ঘৃণা করে। সে ঘৃণা করে তাকে। যে বলেছিল তাকে ছাড়া বাঁচবে না এবং অনায়াসে বাঁচবার পথ করেছে ভিন্ন—তাকে ঘৃণা করে। সেইদিন থেকে ঘৃণা করে। এবং নিজের একাকী অস্তিত্বের মৃত্যু অপেক্ষা করে নিরন্তর।

২২

রবিবার বলে আজ সে বেশি সময় থেকে গিয়েছিল হাসপাতালে। কাল ছেড়ে দেওয়া হবে বাবাকে। বাড়ি ফিরে সে অবাক হল। বিশ্বদীপ কাজে বেরোয়নি। শুয়ে আছে বিছানায়।

জ্বর নেই। এমনিই শুয়ে আছে কাজে না গিয়ে। অভিযোগ করল মা। সে বিশ্বদীপের পাশে বসে কপালে হাত রাখে। জ্বর নেই সত্যি। কিছুক্ষণ আগেই ছেড়ে গেছে জ্বরটা। জানায় বিশ্বদীপ। এখনও সে তৈরি হয়ে বেরোতে পারত। কিন্তু বড় অবসন্ন বোধ করছে সে। প্রায় সাতদিন হল এইভাবে রাত্রে জ্বর এসে সকালে ছেড়ে যাচ্ছে। আর ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে তাকে। বলতে বলতে সে কাশে। কাশির দমকে চোখমুখ লাল হয়ে যায়, চোখ ভরে ওঠে জলে।

স্নান করে খেয়ে নেয় শুভদীপ। তারপর বিশ্বদীপকে নিয়ে সদা ভরসা ডাক্তারের কাছে যায়। আর তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কত দিন কাশি, কত দিন জ্বর ইত্যাদি বাঁধাধরা প্রশ্ন করে তিনি থুতু ও রক্তের পরীক্ষা লিখে দেন। সঙ্গে বুকের এক্স-রে।

ভয়ে শুভদীপের মেরুদণ্ডে শিরশিরানি লাগে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। ডাক্তারের বাড়ি থেকে সে সরাসরি রোগনির্ণয় কেন্দ্রে যাবার সংকল্প নেয়। দশ হাজার টাকার পুরোটা খরচ হয়নি। সে নিশ্চিন্ত বোধ করে। একটি রিকশায় উঠতে যাবার মুখে বিশ্বদীপের কাশির দমক লাগে আবার। কাশতে কাশতে পেট চেপে উবু হয়ে বসে পড়ে সে রাস্তায়। গলা থেকে একদলা থুতু ছিটকে আসে। আর বিশ্বদীপকে জড়িয়ে থাকতে থাকতে শুভদীপ দেখতে পায় থুতুর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে রক্ত। ছিটে ছিটে নয়, লালের আভা নয়। রক্ত। রক্তের দলা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়। প্রশ্ন করে কত দিন থেকে হয়েছে এমন। দু'দিন হল। বলে বিশ্বদীপ। বাবাকে নিয়ে এত ব্যস্ত সবাই, তাই সে কিছুই বলেনি। জ্বর কমাবার ওষুধ খেয়েছে। কাশতে কাশতে তার গলা চিরে রক্ত বেরোচ্ছে—এমনই বিশ্বাস করে সে। আর শুভদীপ সেই বিশ্বাসকে

আঁকড়ে ধরতে চায়। প্রাণপণে চায় সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল হোক শূন্য। হোক নেতিবাচক।

বাড়িতে কিছুই বলে না তারা। রক্ত পরীক্ষা বা বুকের এক্স-রে করানোর কথাও বলে না। সারাক্ষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে বিশ্বদীপ। সন্ধের পর শুভদীপ আবার বেরিয়ে পড়ে হাসপাতালের দিকে। আজ রাতে তার না থাকলেও চলত। তবু সে ঝুঁকি নেয় না। চাদর নিয়ে, বাবার খাবার নিয়ে রওনা দেয়। বড় চাপ তার ভিতরে। বড় যন্ত্রণা। কারওকে যদি বলতে পারত একটু। একটু ভাগ করে নিত সব। দেবনন্দনকে আগে বলত অনেক কিছু। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আর পারছে না। চন্দ্রাবলীর অনুপস্থিতি বড় বেশি করে বাজছে তার।

দেবনন্দন কেন গিয়েছিল ওখানে? কেন?

সে নিজে কেন গিয়েছিল? মালবিকার কাছে? চম্পাকলির কাছে? একদিনই মাত্র। তবু মালবিকার কাছে যাবার জন্য বড় অনুশোচনা হয়েছিল তার। আর চম্পাকলিকে বড় বেশি করে চন্দ্রাবলীর মতো দেখতে। সে কী রকম টানে পড়ে গিয়েছিল! কোনও ব্যাখ্যা নেই এসবের। সে জানে। যদি অন্য কেউ এরকম করত, তবে সে ধিক্কার দিত নিশ্চয়ই।

কিন্তু চম্পাকলির কাছে যাবার জন্য তার কোনও অনুশোচনা নেই। সে জীবনের এক অতুলনীয় যন্ত্রণা বুঝতেই পারত না যদি না যেত সেদিন। গত কয়েক মাসে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এত যন্ত্রণা দেখছে চারপাশে, তবু নিজের যন্ত্রণাকেই তার মনে হয় সবার চেয়ে বেশি। আর এইসব ভাবতে ভাবতে সে বাবার কাছে পৌঁছে যায়।

তাকে দেখে হাসে বাবা। ডান দিক অসাড় হয়ে গেছে। বেঁকে গেছে মুখের ডান পাশ। তবু হাসছে বাবা। হাসছে বেঁচে গেছে বলে। আবার বাড়ি ফিরবে বলে। জীবনের কী আশ্চর্য অমোঘ টান।

চারপাশ লক্ষ করে সে। অভ্যাস হয়ে গেছে তার। কোন শয্যার রোগী কেমন আছে, বেঁচে আছে কিনা দেখে সে। আর চোখে পড়ে হাতে টিফিনের বাক্স নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চু। আর

আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢেকে শুয়ে আছে তার বাবা। বাবার জন্য আনা ভাত আর খাওয়ানো হয়নি। মৃত্যু এসে গিয়েছিল আগেই।

মন খারাপ হয়ে যায় তার। বাবাকে চামচে করে খাওয়াতে খাওয়াতে সে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বাবার মুখ বেয়ে গলা ভাত গড়িয়ে পড়ে। বাচ্চুর কথা ভাবে সে। এবং একসময় বাচ্চু উধাও হয়ে যায়। চলে আসে বিশ্বদ্বীপ। আবার বিশ্বদ্বীপের জায়গা নিয়ে নেয় চন্দ্রাবলী। তার ভাবনার মধ্যেই বাবার খাওয়া হয়ে যায়। কৌটো ব্যাগে পুরে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। জরুরি বিভাগের উল্টোদিকের চাতালে, তার শোবার জায়গায় এসে দাঁড়ায়। এবং সবিস্ময়ে দেখে—টিফিনের কৌটো খুলে গ্রাসে গ্রাসে ভাত মুখে পুরছে বাচ্চু।

এক ছুটে নর্দমার পারে গিয়ে হড়হড় করে বমি করে ফেলে শুভদীপ।

২৩

যক্ষ্মা। ঘোষণা করেন ডাক্তার। যক্ষ্মা।

শুভদীপ জানত। বিশ্বদীপ জানত না। সে বিশ্বদীপের মুখের দিকে তাকায় এবং কোনও কিছু ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনে। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নেয় সে। আর দেখতে পায় স্বপ্নের অসংখ্য ভাঙা টুকরো ছড়ানো মেঝেময়। বিশ্বদীপের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্লান হেসে বিশ্বদীপ বলে, সাধ্যাতিরিক্ত দিয়েও সাধ্যাতীতকে জয় করা যায় না শেষ পর্যন্ত। সাধ্যাতীত ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে চিরকাল।

সে বিশ্বদীপের হাতে চাপ দেয়। ভেঙে পড়ার মতো কোনও ব্যাপার নয় বলে। আজ বাবা বাড়িতে ফিরে এসেছে বলে খুশি থাকতে অনুরোধ করে। বিশ্বদীপ একটু সময় চায় তখন। বাড়িতে ঢোকার আগে একটু সামলে নিতে চায় নিজেকে। দু'ভাই পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার দিকে যায়। একটি চায়ের দোকানে বসে। স্থির করে, কিছুই জানাবে না আর কারওকে এখন। বলবে ভাইরাসঘটিত জ্বর। সারতে

সময় লাগবে। প্রয়োজন না হলে কোনও দিন জানাবে না।

বিশ্বদীপ চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরায়। হাত চেপে ধরে শুভদীপ। অনুরোধ করে না খাবার জন্য। সিগারেট ফেলে দেয় বিশ্বদীপ। নিভে যাওয়া গলায় বলে, এইবার মিঠু তাকে ছেড়ে চলে যাবে।

কষ্টে বুকে চিড় ধরে যায় শুভদীপের। তার হাত কাঁপে। এ প্রসঙ্গে কোনও সান্ত্বনার ভাষা তার মুখে আসে না। সে চুপ করে থাকে। বিশ্বদীপ হাসে তখন। নিষ্প্রাণ হাসি। প্রলাপের মতো বলে, সে ব্যর্থ হল। শুভদীপের পাশে দাঁড়াতে পারল না। উল্টে রোগ বাঁধিয়ে বোঝা হয়ে গেল। ঘেরা স্নানঘরও আর বানানো হল না তার।

শুভদীপ তাকে বোঝায়। যক্ষ্মা এখন আর কোনও সমস্যাই নয়, বোঝায়। আর বোঝাতে বোঝাতে দু'জনে বাড়ি ফেরে।

বাবার কাছে বসে আছে শুচু। বিশ্বদীপ নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুভদীপ বসে থাকে পাশে। বিশ্বদীপের কী হয়েছে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে না মা। বরং চা বানাতে বানাতে একটি সুসংবাদ পেশ করে হাসিমুখে। জানায়, শুভদীপ-বিশ্বদীপ মামা হতে চলেছে।

সব ভুলে লাফিয়ে ওঠে বিশ্বদীপ। লাফিয়ে ওঠে শুভদীপও। যতখানি আনন্দে তার চেয়ে অনেক বেশি—বিস্ময়ে। শুচু তা হলে...শুচু তা হলে...তখন সে স্তব্ধ হয়ে যায় আর ঘৃণা এসে ঠুকরে দেয় বুক। কেন যায় দেবনন্দন? তবে কেন যায়? সে স্থির করে দেবনন্দনকে প্রশ্ন করবে এর মধ্যেই।

তখন চা নিয়ে পাশের ঘরে যায় মা আর শুচু হাতে চায়ের কাপ নিয়ে তাদের মধ্যে বসে। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে খুশির সঙ্গে জানায় বাবার শয্যাক্ষত ছোট হতে হতে প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর চোখ-মুখ খুশিতে উপচানো দেখায়। শুভদীপের বড় মায়া হয় ওর জন্য। খাঁচার মধ্যে থেকে সুবল চিৎকার করে—শুচু, ছোলা দে। লংকা দে। শুচু কল-কল করে কথা বলে। নদামাসির কথা বলে। দেবনন্দনের কথা বলে। কত দিন মহীনের ঘোড়াগুলি শোনা হয়নি বলে আর বলতে বলতে হঠাৎ বাক্য অসমাপ্ত রেখে থেমে যায়।

চোখের পলক পড়ে না। মুখের হাসি মাঝপথে আটকে যায়। কয়েক সেকেন্ড হাতের কাপ হাতে—তারপর খসে পড়ে মেঝেয়। টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শুভদীপ-বিশ্বদীপ কোনও কিছু বোঝার আগেই শুচু এলিয়ে পড়ে। চলে যায়। পরিবার, পরিজন, স্বামী, সংসার, সম্ভাব্য সন্তান—সবাইকে ছেড়ে মহাপৃথিবীর পথে পাড়ি দেয় শুচু। কিছুক্ষণ জগৎ-সংসার স্তব্ধ হয়ে থাকে।

শুধু সুবল একটানা বলে যায়—শুচু, ছোলা দে লংকা দে। শুচু, ছোলা দে লংকা দে।

২৪

পারছে না সে আর। পারছে না। জীবন চুকিয়ে দিয়েছে পরিপূর্ণ হিসেব। তাই সে আজ মহাসমুদ্রের পারে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় ঢেউ কালীয়নাগের মতো আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। আনন্দের ধারাস্নানে মেতে উঠছে মানুষ। সে-ই কেবল দাঁড়িয়ে আছে একা। নিরানন্দ। তার সব হিসেব চুকে গিয়েছে। স্বর্গদ্বার থেকে ভেসে আসছে গন্ধ। তীব্রও নয়, কটুও নয়। ভালও নয়, মন্দও নয়। এক নির্মোহ গন্ধ।এই গন্ধের রূপ সে চেনে এখন। অবয়ব চেনে। মাত্র কয়েকদিন আগেই এই গন্ধকে প্রত্যক্ষ করেছে সে।

সমস্ত সম্পর্ক ভেঙে মুচড়ে ঠুকরে রক্তাক্ত করে, লাল রক্তের সঙ্গে নীল রক্ত মিশিয়ে অদ্ভুত বেগুনি অন্ধকার ঠেলে অগ্নিময় হয়ে গেল, লেলিহান হয়ে গেল তার কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে আসা এই গন্ধবোধ। অতএব সে চেনে, জানে। শুধু স্পর্শ করেনি এখনও। শুধু তার হাত ছাড়িয়ে ছুটতে লাগল শুচু একা, আর বিপদের কথা ভাবল না, সুখ-সন্তাপের কথা ভাবল না, যে আসবে তার কথা— যারা আছে তাদের কথা ভাবল না, ভাবলই না, কেবল ছুটে ছুটে চলে গেল আর স্পর্শ করল সেই গন্ধের উৎস, আর শুয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে, শুয়ে পড়ল আর খুলল না চোখ যতক্ষণ না আগুন তার গলা অবধি, তার চিবুক অবধি,

তার ঠোঁট নাক চোখ ভ্রূ কপাল ও কেশাগ্র অবধি গ্রাস করে নেয়।

তারপর? তারপর? ও কি চোখ খুলেছিল? হেসেছিল কি? এক অনির্বাণ চিতার ওপর, আগুনের গর্ভে শুয়ে শুয়ে হেসেছিল কি ও? শুচু? দেখেছিল কি, সে, কত একাগ্র দৃষ্টিপাতে ধরে রেখেছে এক নরকরোটি, শিশুকরোটি! শ্মশানের পাশে মন্দিরের ভাঙা দেওয়ালে, গূঢ় কুলুঙ্গিতে রাখা ওই শিশুকরোটি। তার তলায় রাখা ছিল জ্বলন্ত প্রদীপ। হাওয়ায় তার শিখা কাঁপছিল। আর সে, দেখছিল, জ্বলে যেতে থাকা শুচুকে না দেখে দেখছিল— দেখছিল সেই কাঁপন, আলো-ছায়ার কাঁপন, আর-আর এ-ও দেখছিল যে করোটির অক্ষিকোটরে, মুখবিবরে, নাসিকা গহ্বরে চাপ চাপ অন্ধকার, অবিমিশ্র অন্ধকার, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত অপরিশোধিত অন্ধকার— প্রদীপের ওই একরত্তি শিখা বড় দুর্বল ওই অন্ধকারের কাছে।

তখন নদীতে শব্দ উঠেছিল ছপাৎ-ছলাৎ, ছপাৎ-ছলাৎ। আর সকলের অগোচরে ছাই উড়ছিল। সে জানে না— এই ছিল কিনা ভুবন ছাড়িয়ে ভূমায় মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়া। জানে না সে। জানত না। জানে না আজও। যেমন জানে না, শ্মশানে, ক্রন্দনমান ছিল যে দেবনন্দন— সে গিয়েছিল কেন মধ্যরাত্রের নির্বাচিত পাড়ায়? মানুষীভোজনে গিয়েছিল কেন সে?

জানে না সে। জানতে চায় না আর। সব মিটে গেছে। ফুরিয়েছে সব।

চন্দ্রাবলী গাইত মাঝে মাঝে।

দেহ ধরে কা দণ্ড হৈ সব কাহুকো হোয়।
জ্ঞানী ভুগতৈ জ্ঞান করি মূরখ ভুগতৈ রোয় ॥

—শরীর ধারণ করা মানেই কষ্ট। জ্ঞানী এ কষ্ট ভোগ করে জ্ঞানে। মূর্খ ভোগ করে রোদনে।

সে কি জ্ঞানী? সে কি মূর্খ? সে জানে না। সে পায়ে পায়ে নেমে যেতে থাকে মৃত্যুর দিকে। জল হাঁটু ছাড়িয়ে, বুক ছাড়িয়ে গলা অবধি পৌঁছে যায়। এবং একটি বিপুল ঢেউ সবলে তাকে জলের গভীরে টেনে নেয়।

সন্তরণ জানে না সে। তার দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। বুকে অসম্ভব চাপ। জলের উথালপাথালে সে একবার ভাসে, ডুবে যায় আবার। আর তার ভয় করে। মৃত্যুকে ভয়। সৌন্দর্য হারিয়ে মৃত্যু সহসা হয়ে ওঠে করাল ও নির্মম। জীবনের চেয়ে অনেক বেশি নির্মম। সে তখন প্রাণপণে হাত তোলে। ডুবতে ডুবতে টের পায় দুটি শক্ত হাতের টান। সে জ্ঞান হারায়।

২৫

জ্ঞান হতেই প্রথম চন্দ্রাবলীর মুখ তার মনে পড়ে। আর কান্না পায়। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যবর্তী অবস্থায় আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে সে। এবং ক্রন্দনের মধ্যেই সে লাভ করে পূর্ণ জ্ঞান।

তাকে ঘিরে ছিল ভিড়। ভিড়ে সে দেখতে পায় শ্যামলিম ও দেবনন্দনকে। যে-নুলিয়ারা তাকে বাঁচিয়েছিল তাদের সঙ্গে দরাদরি করছিল প্রণয়। চার হাজার টাকা হেঁকেছিল তারা। শেষ পর্যন্ত দেড়শো টাকায় রফা হয়।

দেড়শো টাকা। মাত্র দেড়শো টাকা তার জীবনের দাম। যদি কানাকড়িও না হত, সে কষ্ট পেত না। জীবনের তুল্যমূল্য একমাত্র জীবন—আজ মাত্র কিছুক্ষণ আগেই উপলব্ধি করেছে সে।

একটু সুস্থ বোধ করতেই বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে অতিথিশালায় চলে যায় সে। শুয়ে থাকে সারা দুপুর। ঘুমোয়। জাগে। ঘুমোয়। ভাবে না কিছুই। ক্লান্তি। বড় ক্লান্তি তার শরীর জুড়ে। সন্ধেবেলা বন্ধুরা বেরিয়ে যায়। সে বসে থাকে একা। একসময় সে-ও বেরিয়ে পড়ে। অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে একটি ফোন বুথে যায়। একটি মুখস্থ নম্বর ডায়াল করে। ওপারে শব্দ হয়। সে শ্রবণযন্ত্র কানে চেপে ধরে। বুক ধক ধক করে। মুহূর্তে মনস্থির করে সে। যদি অন্য কেউ ধরে—ছেড়ে দেবে। তখন অন্য প্রান্ত কথা বলে ওঠে। তার চেনা, তার প্রিয়, তার অত্যন্ত আপনার কণ্ঠটি কথা বলে ওঠে। সে তখন ধীরে ধীরে তার ডুবে যাওয়া ও ভেসে

ওঠার কাহিনী শোনায়। আর দু'একটি কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে ও প্রান্ত। সে যন্ত্র নামিয়ে রাখে। কথা বলার মূল্য চুকিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। পায়ে পায়ে সমুদ্রের কাছে দাঁড়ায়। ঢেউয়ের থেকে জল ছিটকে ভিজিয়ে দেয় তাকে। সে সমুদ্রের দিকে তাকায়। আদিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার। তারই মধ্যে কালো মেয়ের হাসির মতো ফুটে উঠছে ঢেউয়ের ফেণা। এই সমুদ্রে সে জীবন দিতে চেয়েছিল। সমুদ্র নেয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছে। আর তার কিছু চাইবার নেই। সে দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, অনুভব করতে পারছে মহাজগৎ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাণী। অমোঘ এক উচ্চারণ। তার প্রিয় কণ্ঠে—

"আমার জন্য বাঁচো শুভদীপ। অন্তত আমার জন্য বেঁচে থাকো তুমি।"